সঙ্গীত ও কাহিনী

(উপন্যাস)

শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

গ্রন্থকার কর্তৃক
২৫।ই, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪
হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রক
পাথেয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫এ, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা-৬।

৺মহালয়া
২৮শে আশ্বিন,
১৩৬২।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

উৎসর্গ

যিনি আমার সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী, এবং যাঁর
কাছে আমার অতি ক্ষুদ্র সামর্থ্যটুকুও এনে দেয়
আনন্দ, তৃপ্তি—সেই আমার সহধর্ম্মিনী
শ্রীমতী গৌরী দেবীর হস্তে
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি
অর্পণ করলাম।

ইতি—
শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

দু'চার কথা

আমার এই গ্রন্থখানির 'সঙ্গীত ও কাহিনী' নাম এই অর্থে দিয়েছি যে, এতে যেমন সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থা, রীতি, নীতি, তথ্য ও বহু বিষয়ের আলোচনা আছে, তেমনি আছে সমাজের বহুবিধ বিষয় ও চরিত্রের সমাবেশ। তাই ঐরূপ নামকরণ করতে হয়েছে।

সঙ্গীত ও সমাজের যে রঙ্‌বেরঙ্‌এর ফুল দিয়ে এই মালা গাঁথতে প্রয়াস পেয়েছি তার বেশীর ভাগই ফুটেছে আমার অভিজ্ঞতালব্ধ বাগানে এবং এর গাঁথার সূত্র হয়েছে আমার কামনা বাসনা ও প্রেরণা— এই তিনের একত্রে পাক দিয়ে তৈরি।

গ্রন্থের ছাপার বিষয়-সম্বন্ধে সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, বহু যত্ন ও লক্ষ্য দিয়ে প্রুফ্‌ দেখা সত্বেও স্থানে স্থানে ভুল ত্রুটি থেকে গেছে। এজন্যে পাঠকপাঠিকাগণের উপর সংশোধন করে নেবার অনুরোধ জানিয়ে ত্রুটি স্বীকার করে রাখছি।

প্রচ্ছদপটের চিত্রটি শিল্পী শ্রীমান মনোজ কুমার সেনগুপ্ত অঙ্কন করে' আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি আমার শুভ কামনা রইল।

ইতি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত ও কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

অদূরের পর্ব্বত মালার তলদেশ হইতে সম্মুখের স্বল্প প্রশস্ত শীর্ণ স্রোতা নদীর তীরভূমি পর্য্যন্ত বহুদূর বিস্তৃতাঞ্চল শ্যামলবর্ণ তৃণে আবৃত হইয়া মনোরম শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানে স্থানে কোথাও আম্র বৃক্ষের এবং কোথাও বা মহুয়া বৃক্ষের গোষ্ঠী, আবার কোথাও পলাশ কুঞ্জের সমাবেশ।

অসমতল ক্ষেত্রের উচ্চ উচ্চ স্থানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে তাল, খর্জ্জুর, শিমূল ও বটাদি বৃক্ষের স্থিতিমান দৃশ্য প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য দান করিতেছে।

স্থানটি মানভূম জেলার উত্তর-পূর্ব্ব সীমার সন্নিকট।

পর্ব্বতপাদ সন্নিহিত কয়েকটি স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহগুলি দৃষ্টি গোচর হয়। কুটির গুলির আকৃতি ও পরিচ্ছন্ন স্বভাব-সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্বাধীন জীবন যাপনের মন ভুলান আকর্ষণ আনয়ন করে।

গৃহবাসীদের হৃষ্ট পুষ্ট সবৎস কয়েকটি গাভী, কতকগুলি ছাগ, মেষ, ও কুক্কুটকে দিবাভাগে ইতস্তত: ভাবে খাদ্যান্বেষণে বিচরণ করিতে দেখা যায়। তাহাদিগকে রক্ষক হিসাবে কয়েকটি বালক ও কিশোর কিশোরী বৃক্ষতলে বসিয়া আনন্দে খেলা ধূলা করিতে থাকে। তন্মধ্যে কেহ

আপন মনে বাঁশী বাজায়, কেহবা স্বল্প দূরে বসিয়া নিজেদের গ্রাম্য সুরে ঝুমুর ইত্যাদি গান গায়। সেই স্বল্প পরিমিত সুরের পুনঃ পুনঃ রূপ শ্রবণ মাত্র মনে কেমন এক উদাস মধুর ভাব আনয়ন করে। তখন সব ভুলিয়া ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া থাকিবার জন্য কেমন যেন মনে এক উদ্বেলিত ভাব আসিতে থাকে।

ওই সকল অরণ্যবাসী নর-নারী, কিশোর-কিশোরীদের সুদৃঢ় গঠন সৌন্দর্য্য, চলন, ধরণ প্রভৃতি সমস্তই মনে হয় কেমন সুন্দর। চাহনির মধ্যে কি সরলতা, ব্যবহারে কি চমৎকার অনাবিলতা, যেন মনে হয় ইহাদের মধ্যে কৃত্রিম বলিয়া কিছু নাই।

শিক্ষা, সভ্যতা, সমাজ ও নবনব আলোকের সন্ধান বর্জ্জিত এই সকল জংলী নামধারী অসভ্য মানুষদের কাছ থেকে আমরা অনেক দূরে থাকি বলিয়া তাহাদের পরিবেশ ও সান্নিধ্যসুখ অনুভব করিতে পারি নাই।

তাই মনে হয়, প্রকৃত দরদীর কাছে, ভাবুকের কাছে, অন্তরের আবেগের কাছে প্রকৃতির এই দুলালদের বাসস্থান, পরিবেশ, ইহাদের কর্ম্মে উৎফুল্লতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, মনের মধ্যে স্বল্পে তৃপ্ততা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মধ্যে অন্তরে আনিয়া দেয় এক বিমল আনন্দ, সুচিন্তা, নির্লোভ ও বিত্তে অনাশক্তির প্রেরণা, নাম ডাকে মোহ শূন্যতা, তৃপ্তিতে বিভোরতা, ঈশ্বরে নির্ভরতা, এবং দীন দরিদ্রে আপন জ্ঞান ও ভালবাসা।

এই প্রকার পরিবেশের মধ্যে তটিনীতট নিকটস্থ শেফালী, টগর, গুলঞ্চ ও অশোক বৃক্ষ সমূহের মধ্য স্থলে স্বল্প পরিমিত ভূমির উপর একটি ক্ষুদ্র পর্ণ কুটির। কুটিরের অঙ্গন পার্শ্বদ্বয়ে দুই একটি তুলসী, সন্ধ্যামনি, জবা, ও কুন্দপুষ্পের বৃক্ষ শোভাদান করিতেছে। কুটিরের দাওয়ায় মৃগচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া গৃহ স্বামী সাধক অতি প্রত্যুষে তম্বুরা যন্ত্র লইয়া সঙ্গীত সাধনা করিতেছেন। তখনও তপনদেব সুপ্রকাশিত

হন নাই। পূর্ব্বদিকে দিবাকরের জবাকুসুম বর্ণ সবে মাত্র বিকশিত হইতেছে। সাধকের সুরের সহিত বৃক্ষোপরি পক্ষিকুল কুলায় বসিয়া নানান ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক ভরিয়া দিয়াছে।

সাধক একাগ্রমনে যোগীর মত প্রায় প্রহর কাল সঙ্গীত সাধনা করিয়া চলিতেছেন; এমন সময় উপস্থিত হইলেন সুদূরবর্ত্তী মঠের এক সন্ন্যাসী। সাধক সঙ্গীত বন্ধ করিয়া সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা সহকারে বসিতে আসন প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—কয়েকদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনি, কারণ আমি এ স্থানে ছিলেম না; আপনার শারীরিক কুশল ত?

সাধক বলিলেন,—ভগবৎ কৃপায় ও আপনাদের স্নেহের স্পর্শে বেশ ভালই আছি। মঠের সমস্ত ব্যক্তির ও আপনার কুশল জানতে বাসনা করি।

সন্ন্যাসী সহাস্তে বলিলেন,—তাঁর কৃপায় আমরা সকলেই উপস্থিত কুশলে আছি। আমি অনেকক্ষণ যাবৎ অলক্ষ্যে কুটির পার্শ্ব হতে আপনার কণ্ঠের সঙ্গীত সুধা পান করছিলেম। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য মনে করে এবং আমারও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার সময়াভাব বলে অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনার সাধনার ধ্যান ভঙ্গ করতে হ'ল। এজন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন।

সাধক স্মিত হাস্তে কহিলেন,—না-না আপনার কোনই ত্রুটী হয়নি, আমার উপস্থিত সাধনা সমাপ্ত হয়ে এসেছিল। তাছাড়া আপনার দর্শন আমার সাধনার পক্ষে মহা সম্বল ও সহায়ক বলে মনে করি।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—সত্যই আপনার সবিনয় ব্যবহার আমার অন্তরকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তাই আমার বহু কর্ম্মের মধ্যে অবসর পাওয়া মাত্র

আপনার কাছে ছুটে আসতে মন আকুল হয়।

আজ আপনার সঙ্গীত শ্রবণ কালে মনে হচ্ছিল যে, প্রকৃত সঙ্গীত সাধকদের গীত শ্রবণ করতে হ'লে অলক্ষ্যে থেকেই যথার্থ সুর ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় এবং সেই উপলব্ধিতে নিজেরও অনেকখানি পথ এগিয়ে যাবার শক্তি ও সৌভাগ্য লাভ হয়। অবশ্য সান্নিধ্যে এসে শুনবার জন্যে মনের মধ্যে আকর্ষণ আসে বটে কিন্তু তাতে আমার মনে হয়, তখন মানুষে মানুষে গাওয়া ও শোনার সম্পর্ক এসে গিয়ে সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, এবং সুরকার যাঁকে বুঝবার ও পাবার জন্যে সঙ্গীত প্রকাশ করছিলেন সেই পরম বস্তুর চিন্তার স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষকে মুগ্ধ করবার ও কৃতিত্ব দেখাবার জন্য সাধনার পরিচয় দিতে বাধ্য হন, এবং তখন আর সুরব্রহ্মের রূপ মনে অঙ্কিত হতে পায় না। কলা বৈচিত্র্যের রূপই ধ্যানের মধ্যে এসে উদিত হয় এবং শ্রোতার প্রশংসায় লোভের সৃষ্টি করে' খ্যাতি, মান ও মর্য্যাদার দীপ্তি ছটায় চতুর্দ্দিকে তাঁর পরিচয় উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হ'ক এই আকাঙ্ক্ষাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হতে হতে সঙ্গীত সাধককে সঙ্গীত শিল্পীতে পরিণত করে। বলুন আমার এ কথা ঠিক কি না?

সাধক বলিলেন,—আপনি প্রকৃত কথাই বলেছেন। আমার গুরুদেবও ওই কথা বলে উদাহরণ দেন তানসেনগুরু হরিদাস স্বামীজী, ও তানসেনের নাম উল্লেখ করে'।

আমার গুরুদেব সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থার বহু কথার মধ্যে অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে বলেন, "আমি জীবনে জ্ঞানের প্রারম্ভ হতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেম তা আমার অদৃষ্টে সফলতা লাভ করল না এবং যথার্থ ভাবে সঙ্গীতের সম্মানও রাখতে পারলেম না। সঙ্গীতের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে ব্যভিচারকের মত সঙ্গীত বিক্রয়

করে জীবন কাটালেম। শুধু তাই নয়—তার উপর মর্ম্মে কশাঘাত করে যাচ্ছে, বর্ত্তমান যুগের অবস্থায় পড়ে' সুর ব্রহ্মকে পণ্য বস্তুর মত দ্বারে দ্বারে গিয়ে অর্থের পীড়নে বিক্রয় করে আসতে হচ্ছে বলে'।

প্রকৃত সঙ্গীত সাধকদের ত এ ব্যবসার সামগ্রী নয়; তাঁরা পূর্ব্বের সেই আদর্শ সাধকদের মত গৃহে বা আশ্রমে বসে রাজ প্রদত্ত বিত্তের সাহায্যে উপযুক্ত শিষ্যদিগকে শিক্ষাদান করে যাবেন এবং নিজে সাধনা দ্বারা আজীবন সুরব্রহ্মের তপস্যা করবেন সেই সুরের পরম বস্তুকে পাবার জন্যে………।”

গুরুদেব শিক্ষার মাধ্যমে বহু উপদেশ মূলক বাক্য বলে শিষ্যদিগকে যথার্থ পথের নির্দ্দেশ দেন ও উৎসাহিত করেন। ওই প্রকার বহুবিধ আদর্শের ও রীতিনীতির কথা শ্রবণ করতে করতে আমার মনের মধ্যে তখন এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য ও ব্যাকুলতা আসতে থাকে। পরম উৎসাহে সাধনায় রত থেকে কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি আমাকে বহু প্রকার রাগের তালিম ধ্রুপদ সহযোগে দিলেন। ঐ শিক্ষা তিনি পুত্রাধিক স্নেহে অকাতরে দান করেছিলেন। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারের আমি হয়তো কণামাত্র লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। যাই হ'ক একদিন তাঁর চরণে আমার মনের উদ্দেশ্য ও বাসনা নিবেদন করলেম।

আমার কথা সমস্ত শুনে তিনি বাষ্পাকুল নয়নে আমার মস্তকে পরম স্নেহে ও আকুল ভাবে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করতে করতে বল্লেন,—“বৎস! কি আর বল্‌ব—তোমার মধ্য দিয়ে যেন সেই সুরব্রহ্মময় পরব্রহ্ম আমার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা পূরণ করেন। তোমার নিষ্ঠা অটল রেখে তাঁর কৃপা লাভ কর এই প্রার্থনা তাঁর চরণে জানাই।”

তাঁর অনুমতি লাভ করে' একদিন শুভক্ষণে তম্বুরাটিকে সঙ্গী করে' জননী ও গুরুদেবের চরণধূলি মস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক বেরিয়ে পড়লেম।

মনোমত স্থান নির্ব্বাচনের জন্য সঙ্গীতস্রষ্টা দেবাদিদেবের চরণে প্রার্থনা জানাতে ৺বৈদ্যনাথ ধামে যাই। সেখানে তাঁর চরণে আমার অতি সামান্য ক্ষুদ্র গীতাঞ্জলি প্রদান করে আমার মনোবাসনা জানাতে থাকি। এই ভাবে দুই একদিন গত হবার পর ভগবান মহেশ্বর আপনার সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিলেন। বলুন সন্ন্যাসীজী আমি কি সুরের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হব?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—চরম উপলব্ধি সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান ও ধারণা নেই, তবে আজ এইমাত্র আপনার একাগ্রচিত্তে সঙ্গীতের যে অপূর্ব্ব সাধনা শ্রবণ করলেম তাতে করে' আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, আপনি সুরব্রহ্মের স্বরূপসন্ধানালোক লাভ করেছেন এবং আমার দৃঢ় ধারণা, যদি আপনার এইরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা অটুট থাকে তাহলে আপনি সিদ্ধিলাভ করবেনই।

সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—সন্ন্যাসীজী আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন কণা মাত্রও সুরের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। সঙ্গীতের যে বিরাট শক্তি, তার কতটুকু মানুষ লাভ করতে পারে! একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশীতেই সুরের মাহাত্ম্য ও স্বরূপ ধরা পড়েছিল। তাই তাঁর সেই মোহন বেণুর সুরে ত্রিলোককে মোহিত করে রেখেছে। তাঁর লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে বাঁশীর সেই সুরে যমুনা উজান বইত, পবনের গতিবেগ বন্ধ হয়ে যেত, পক্ষিকুল স্তব্ধ হ'য়ে সেই সুরের আকর্ষণে তন্ময় হয়ে থাকত, গোবৎস মাতৃস্তন্য পান করতে ভুলে যেত, গোপবধূরা কুল, মান, লজ্জা প্রভৃতি সমস্ত বিস্মৃত হয়ে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধীর আগ্রহে ছুটে আসত সেই সুরকারের কাছে। তাদের নিজস্ব সত্তা বলে কিছুই থাকত না। তাই বলি সুরের যথার্থ শক্তি লাভ মানুষের পক্ষে কতটুকু সম্ভবপর? আমার গুরুদেব বলেন

সুরব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম একই বস্তু।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—আপনার গুরু যথার্থ কথাই বলেছেন। তিনি সত্যই মর্ম্মগ্রাহী। তাঁর সম্বন্ধে আপনার কথাবর্ত্তায় বুঝেছি যে, তিনি সংসারী হলেও সাধনার উচ্চ স্তরে পৌঁছেচেন। প্রত্যেক বস্তুর মর্ম্ম কথা এক মাত্র উপলব্ধির দ্বারাই প্রকাশ পায়। সাধনার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যখন ব্যাকুলতা আসে এবং সেই বস্তু পাবার জন্যে মন আকুল হয়, তখন স্থান ও কালের বাধা থাকে না। কাম্য বস্তুকে লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়। পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পেতে হলে কেবল মাত্র নির্জ্জন স্থানে সাধনাই যে তার প্রকৃষ্ট ও একমাত্র পথ একথা আমি সম্পূর্ণভাবে মনে করিনা। নিষ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক সাধনা যদি থাকে তাহলে সকল স্থানেই সেই কাম্য বস্তুকে লাভ করতে পারা যায়। তবে সাংসারিক জীবনে সেটা খুবই শক্ত। দু একজন মহা ভাগ্যবানের পক্ষেই তা সম্ভবপর হয়। এ জন্যে নির্জ্জন ও প্রকৃতির শান্ত পরিবেশের মধ্যেই ভজন-সাধন করবার জন্যে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। কারণ লোভ প্রভৃতি ষড়রিপুর প্রভাব হতে অব্যাহতি পেতে হলে উক্ত স্থানই তার পক্ষে প্রশস্ত ও সহজ, বিশেষতঃ সঙ্গীতের মত আধ্যাত্মিক বিদ্যার পক্ষে। শুধু তাই নয়, সন্ন্যাস জীবন পালনের দ্বারা সঙ্গীত সাধনায় নিজের মধ্যে সমস্ত শক্তি সঞ্চিত হয় এবং মন আত্মবলে বলীয়ান হয়।

সাধক কহিলেন,—আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুলি যেন আমার পরম সহায়ক হয়। অনেক আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনার মূল্য স্বরূপ সঙ্গীত স্রষ্টা ভগবান মহেশ্বর আপনার মত উপযুক্ত সাধু ব্যক্তির সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছেন। তাই আজ আমি এইরূপ মনোরম স্থানে ও আপনাদের সান্নিধ্যে ভজন সাধন করবার সৌভাগ্য লাভ করতে

পেরেছি। যদি আমি সঙ্গীতের স্বরূপ কিছু মাত্র লাভ করতে পারি তাহলে বুঝব আপনার সর্ব্ববিধ সাহায্যে ও আনুকুল্যেই তা লাভ করেছি।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—ও কথা বলে লজ্জা দিবেন না। কোন কিছু করবার ক্ষমতা মানুষের কি আছে তাঁর কৃপা ব্যতিরেকে। তিনিই সব,—তাঁর নিয়ম, রীতি, কর্ত্তব্যের আদেশ ও নির্দ্দেশ সব কিছুই পালন করবার জন্যে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁর ওই সমস্ত নিয়ম, নীতি ও কর্ত্তব্য পালনের জন্তে আজ্ঞাবহ দাস মাত্র।

এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই দিনের মত বিদায় চাহিলেন। সাধক ভক্তিভরে নমস্কার জানাইয়া সঙ্গে কতকদূর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া উভয়ে বিদায় লইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধক কুটিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আদরী দাওয়ার নিম্নে সিঁড়িতে দুগ্ধের পাত্র লইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,—আদরিণি, কতক্ষণ এসেছিসরে ?

আদরীকে সাধক ঐ বলিয়া ডাকেন। মেয়েটির স্বভাব ও সৌন্দর্য্যের গুণে তাহার ক্ষুদ্র পল্লীর সমস্ত নরনারী তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসে ও আদরী বলিয়া ডাকে।

আদরীর মা প্রত্যহ সাধকের গৃহকর্ম্ম করিয়া দিয়া যায় এবং তৎসঙ্গে মধ্যাহ্নের অন্ন তৈয়ারীর জন্য যাবতীয় জোগাড় করিয়া রাখিয়া যায়।

সাধক নিজে আতপতণ্ডুল কিছু সিদ্ধ করিয়া লহেন এবং আদরীর মা যৎসামান্য ব্যঞ্জন যাহা রাখিয়া যায় তাহাও ঐ অন্নের সঙ্গে সিদ্ধ করিতে দিয়া পরে কিছু ঘৃত যুক্ত করিয়া মধ্যাহ্নে আহার করেন। রাত্রিকালে কেবল ওই দুগ্ধটুকু ও কিছু গুড় মাত্র আহার করিয়া থাকেন।

আদরী প্রত্যহ সময় সময় আসে এবং সাধনার সময়ে প্রায়ই অদূরে থাকিয়া সাধকের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করে। দৈবাৎ যদি তাহার প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়িয়া গিয়াছে মনে করে তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্যে সরিয়া যায়। সে তাহার স্বভাব-গত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝে যে, বাবুজীর এখানে আসা কেবল মাত্র সঙ্গীত সাধনার নিমিত্ত। তাই সে তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত মনে করে না।

বিদ্যাহীন এই অজ্ঞ জাতিরা তাহাদের স্বভাবগত বুদ্ধিতে ন্যায় ও অন্যায়টা শীঘ্র বুঝিয়া লইতে পারে। নিজদিগকে সভ্য জগতের কাছে সম্পর্ক শূন্য মনে করে বলিয়াই বোধ হয়, তাহারা ভয় ও লজ্জা

পায়, যে কোন কার্য্যে অনিষ্ট করিতে ও দুঃখ দিতে, বিশেষতঃ ভদ্র-সমাজের লোকদের উপর। কারণ তাহারা চিরকাল বুঝিয়া আসিতেছে যে, তাহাদিগকে কেবল মাত্র ভাল ও নিরীহ হইয়া থাকিবার জন্য ভগবান্ পাঠাইয়াছেন। যাহাই হউক মোটের উপর, আদরী যখন জানে এই সময় সাধক কোন কার্য্য করেন না তখন আসিয়া তাঁহার কাছটিতে বসে এবং কথাবার্ত্তা বলে তাহাদের সরল মনের অভিব্যক্তির দ্বারা।

সাধকও সেই অবসর সময়টি আদরীর জন্য অপেক্ষা করেন আগ্রহ সহকারে। একক জীবনে আদরীই তাঁহার একমাত্র সঙ্গিনী।

এই কিশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণ প্রাপ্তা মেয়েটির শ্যামল সুগোল সুদৃঢ় দেহখানি ও মিষ্টি মুখখানি দেখিলে সকলেরই স্নেহাদর করিতে ইচ্ছা হয়। রূপটির বর্ণনায় বলা যায়, তাহার কেশগুচ্ছ অতি দীর্ঘ না হইলেও ঘন ও সর্পিল, ললাটটি স্বল্প পরিসর ও চিক্কণ, ভ্রু দুইটি সরু ও মানান সহি, চক্ষু দুইটি পদ্মপলাশের মত না হইলেও সুপরিসর, উজ্জ্বল, চঞ্চল ও স্নিগ্ধ। নাসিকাটি মুখাবয়বের উপযোগী ও সুশোভন; দন্ত পঙক্তি দ্বয় ক্ষুদ্র ও সমস্তরে সাজান, হাস্য কালে কেবল অগ্রভাগগুলিই দৃষ্টি গোচর হয়। ওষ্ঠ দুইটির মধ্যস্থলের দুই পার্শ্বের সুন্দর গঠন দেখিয়া মনে হয় যেন অতি সূক্ষ্ম ধারাল ক্ষুদ্র তরবারির শেষ প্রান্তের মত। দুইটি নিটোল রসাল কপোল ক্রমশঃ গড়ান ভাবে সরু হইয়া আসিয়া মুখখানির সৌন্দর্য্য অধিকতর বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহার শিশু সুলভ হাসিটি আরও সুন্দর। চলনের ভঙ্গীটি যেন বন হরিণীর মত নৃত্যের ছন্দ সৃষ্টি করিয়া যায়। বয়সের অনুপাতে তাহার মনে শিশুভাবের প্রাচুর্য্যই বেশী বলিয়া তাহাকে আরও বেশী ভাল লাগে।

আদরী নিজে আনন্দের মধ্যেই সর্ব্বদা থাকে। নাচিয়া গাহিয়া

মায়ের ফাইফর্‌মাস্‌ তামিল করিয়া দিন কাটায়। তাহার মায়ের একমাত্র সন্তান বলিয়া ও বেশী বয়সে জন্মগ্রহণ করায় সে পিতা-মাতার অতি আদরের বস্তু। তাহাকে কোন বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় না বটে কিন্তু অতি অল্প কারণেই অভিমান করিতে দেখা যায়। সেটা তার অনেক সময় ইচ্ছাকৃতও হয়, এবং সে সংখ্যাটা বাড়ে সাধকের কাছেই বেশী। কারণ কোন কিছুতে অভিমান করিলে সাধক তৎক্ষণাৎ তাহাকে আদর করিয়া স্নেহভরে মস্তকের কেশ ও কুন্তলগুলি অঙ্গুলিদ্বারা সরাইতে সরাইতে মিষ্ট কথায় শান্ত করেন। আদরী তখন তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করে। এই রকম ভাবে উভয়ের ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়া সাধকের সঙ্গীত সাধনার ভিতর এক জাগ্রত শক্তির প্রেরণা প্রদান করিতে থাকে।

একদিন সাধক নদীতে স্নান করিতে যাইতে ছিলেন, সেই সময় গন্তব্য পথের কিয়ৎদূরে একটি মহুয়া বৃক্ষের তলে বসিয়া বিপরীত দিকে মুখ করিয়া আদরী একখানি ঝুমুর গান গাইতেছিল। গানের কথাগুলি এইরূপ—

* "চুইকী চুইকী নিদ টুটলী
সখী শ্যাম না আঁওলী।
হল্য আঁসার আশে নিশি ভোর্‌
না আওল পিহা মোর পিহা মোর
রগড়ি চন্দন চুহা শুখলী
সখি শ্যাম না আওলী।
গাঁথ্যে ছিল্লাম বহু ফুল মাল্‌হা
শুখাল্য মোর হাত্যে হাত্যে না আওল কালা
মুঁকাচ জড়াঁন বেণী মোর সাথে পড়িল খঁসলী।

তাহার কণ্ঠস্বর এবং গানের সুরের মধ্যে শ্রুতির প্রকাশ ভঙ্গীগুলি শুনিয়া সাধক মোহিত হইয়া গেলেন। আদরী যে এমন ভাব প্রকাশ করিয়া গাহিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। যতক্ষণ গান চলিল ততক্ষণ সাধক তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই দিকে দৃষ্টি পড়ায় আদরী গান বন্ধ করিয়া মিষ্টি মুখখানিতে হাসির সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। সেইদিন হইতে সাধকের মনে একটি সঙ্কল্প অঙ্কুরিত হইয়া রহিল।

* [মানভূম জেলার অধিবাসীদের মাতৃভাষা বাংলা হইলেও বেশ একটু সাঁওতালী টান আছে। চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার কথার মধ্যে খুব বেশী এবং অনেক কথা "য" ফলা দিয়ে বেঁকিয়ে বলা হয়। শুনতে কিন্তু আমাদের কাছে খারাপ লাগে না।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রমশঃ আদরী সাধকের পরিচর্য্যার ভার কিছু কিছু নিজ হস্তে গ্রহণ করিল। ইহার জন্য তাহার মায়ের আর বেশী আসিবার প্রয়োজন হয় নাই। এক একদিন আদরী বনমধ্য হইতে তৎস্থানে সময়োপযোগী যে সকল ফল মূলাদি জন্মায় তাহা অন্বেষণ করিয়া আহরণ করে এবং পরম আগ্রহভরে নিজ অঞ্চলে করিয়া আনিয়া সাধকের চরণ তলে রক্ষা পূর্ব্বক ত্বরিতপদে চলিয়া যায়, সাধককে কোন কিছু বলিবার অবসর দেয় না।

সাধকের প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে তাহার সেবাচর্য্যার ভিতর বেশ নিষ্কাম ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়, কেবলমাত্র ঐ আদরটুকু ছাড়া; কিন্তু সেইটুকুতেও আজকাল সর্ব্বদা সে সতর্ক থাকে যেন সাধকের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত তাহার দ্বারা কোন প্রকারে কিছুমাত্র না হয়।

একদিন সাধক আদরীকে বলিলেন,—আদরিণি! তুই আমার কাছে লেখা-পড়া শিখ্‌বি? লেখা-পড়া শিখলে কি হয় জানিস? নিজের জীবনে খুব উপকার হয়। লোকে আরও বেশী করে ভালবাসে, শ্রদ্ধাকরে, ভক্তিকরে।

আদরী হাসিয়া বলিল,—ঐ শেষের দুটো আমার নিজের জন্য ভাল লাগে না। যদি আমায় সকলে ভালবাসে এবং আমার উপকার হয় তা'হলে আমি নিশ্চয়ই লেখাপড়া শিখব, কিন্তু আমারত বই নাই।

সাধক বলিলেন,—সে ব্যবস্থা আমি ক'রে রেখেছি। এই দেখ্‌ তোর জন্যে অনেকগুলো বই এবং শ্লেট পেন্সিল সব আনিয়ে রেখেছি।

আজ বৃহস্পতিবার আছে এবং তুই চানও করেছিস্—আয় আজই তোকে পড়াতে আরম্ভ করি।

আদরী অত্যন্ত খুসী হইয়া সাধককে প্রণাম করিয়া পড়িতে বসিল। আদরীর আকুল আগ্রহ ও নিষ্ঠার গুণে অতি অল্প দিনের মধ্যে কয়েক-খানি পুস্তক সমাধা করিল। তখন সাধক তাহাকে ক্রমিক ভাবে কয়েকটি শিক্ষা ও ভক্তিমূলক গ্রন্থ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। আদরীর সেই সমস্ত গ্রন্থ পাঠের দ্বারা ক্রমশঃই বেশ জ্ঞান ও বুদ্ধির সঞ্চার হইতে লাগিল।

এইরকম ভাবে সাধকের সংস্পর্শে আসিয়া দিন দিন তাহার স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে অলক্ষ্যে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিতে আরম্ভ হইল। তাহার মধ্যে পূর্ব্বের সেই চাঞ্চল্য ও শিশু সুলভ ভাব আর দেখা যায় না; তৎস্থলে সংযম ও গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছে। কেবল চলনের মধ্যে এখনও মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারে নৃত্যের ছন্দ সৃষ্ট হয়। দ্রুত ছন্দের অভ্যাসকে সামলান শীঘ্র যায় না। আদরীর প্রত্যেক কাজ কর্ম্মের মধ্যে এখন বেশ নিষ্ঠা প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে বালক বালিকাদের সঙ্গে গো-চারণ মাঠে যেমন ভাবে খেলা-ধূলা নাচ-গান করিত, এখন আর সেইরূপ করিতে তাহার লজ্জা আসে। তাই দেখা যায়, সে তাহাদের নিকট হইতে অদূরে বৃক্ষতলে বসিয়া আপন মনে পাঠাভ্যাস করে ও কখন কখনও সাধকের গানের কোন কোনটির খানিক খানিক অংশ অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে।

আদরী আর অহেতুক সাধককে গল্প বলিতে অনুরোধ করে না, বিদ্যাচর্চ্চার কথাই তাহার এখন শুনিতে ভাল লাগে।

সাধক মধ্যে মধ্যে আদরীদের পল্লীতে যাইয়া পল্লীবাসীদের খোঁজ খবর লহেন ও কুশলাদি জানিয়া আসেন। তিনি তাহাদিগকে যেমনি

অন্তর দিয়া ভালবাসেন কুটিরবাসীরাও তেমনি তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মান্য করে।

একদিন সাধক সায়াহ্নে কুটিরবাসীদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন। সেইদিন শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চাঁদ তখন পশ্চিমাকাশের কিয়ৎউর্দ্ধে উঠিয়াছে।

সে সময় শরৎকালের শেষ বলিয়া খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘগুলি শশিকলার উপর দৌড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে থাকায় যেন মনে হইতেছে নীলসাগরে একটি ধবলাকার ক্ষুদ্রতরী পালে আচ্ছাদিত হইয়া কোন অপূর্ব্ব গন্তব্য স্থানে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর দূরান্তের তারকাগুলি যেন উজ্জ্বল নয়নে একদৃষ্টে তাহার গমন-শোভা সন্দর্শন করিতেছে। ভাবুক সাধকের তদ্দর্শনে কণ্ঠে শ্রীরাগের একটি ভজন গান আবৃত্তি হইতে লাগিল। ভাবাবেশ গাহিতে লাগিলেন—"কঁহা আও অপরূপ চন্দ্রঙ্গী মেরে বতাও কৃপা করে·········।" সাধকের কণ্ঠে স্বর সমূহের নানা বিন্যাসের মধ্যে কোমল ধৈবত ও ঋষবের মীড়যুক্ত সম্পর্ক এত মধুর ভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল, যেন মনে হইল সেই সুমধুর স্বরবিস্তারে প্রকৃতির সমস্ত চলমান বস্তু স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া গেল।

সাধক গাহিতে গাহিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন আদরী একটি শুসঞ্চবৃক্ষে হেলান দিয়া সুনিপুণ ভাস্কর খোদিত প্রস্তরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মানা আছে। অতি নিকটে গিয়া সাধক দেখিলেন তাহার চক্ষু দিয়া ভাবাবেশে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। তদ্দর্শনে সাধক ত্রস্তপদে স্নেহভরে মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া কহিলেন,—একি! আদরিনী তুমি এ সময় এখানে একা দাঁড়িয়ে যে? চোখে তোমার জলই বা কেন! স্মিত হাস্যে আদরী দক্ষিণ দিকে হস্ত উত্তোলন করিয়া সেইদিকে সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সাধক

স্বল্প জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলেন, কুটীরবাসী আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলে পল্লীপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে দর্শন করিতেছে।

সাধক কহিলেন,—ব্যাপার কি বলত আদরিণি? আদরী তখন ভাবে গদগদ হইয়া বলিল,—ব্যাপারতো স্বচক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছেন; বাবুজী! আপনার সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে আজ আমাদের মত জংলীদেরও গৃহছাড়া ক'রে টেনে এনে ভাবে বিহ্বল করে দিয়েছে। বাবুজী! এবার বোধ হয় আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, নয়?

শেষের কথা কয়টি অতি কষ্টে আদরী উচ্চারণ করিতে পারিল। তাহার তখন দরদর ধারায় অশ্রু গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছে।

সাধক তৎক্ষণাৎ আদরীর অশ্রু নিজের উত্তরীয় দ্বারা মুছাইয়া দিয়া মধুর আশ্বাসে কহিলেন,—আদরিণি! তুমি আজ এত অধীরা হ'লে কেন বলত? কোনদিনত এরূপ দেখিনি! আমি চলে যাব এ কথা কে বলেছে?

আদরী করজোড়ে বলিল,—কেউ বলেনি, আমার মন বলছে। আপনি সঙ্গীত সাধনা করতে এসেছেন, সেই সাধনার কি আর কিছু বাকী আছে! যে গান শুনে মানুষ সব ভুলে যায়, শিশুরা পর্য্যন্ত আহার ত্যাগ ক'রে অধীর হয়ে ছুটে আসে, যে সুরের ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক ভরিয়ে দেয়; সেই সুরকারকে আর কেউ কি ধরে রাখতে পারে? তিনি যে মানুষের দেশ হ'তে সুরের দেশে চলে গেছেন। আজ আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি এবার আমরা বোধ হয় সব আনন্দই হারাব। এই বলিয়া আদরী করজোড়ে আনত চক্ষে দণ্ডায়মানা রহিল।

আদরীর কথা শুনিয়া ক্ষণিকের জন্য সাধক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; ভাবিলেন, একি! এই বনভূমিতে ভগবান কাহাকে পাঠাইয়াছেন!

এত সাধারণ কথা নয়! কি করিয়া ইহার ভিতর সঙ্গীতের জাগ্রত বোধশক্তি প্রবাহিত হইল! তবে কি আমার সাধনার লক্ষ্য স্বরূপ মহাশক্তিরূপিনী মহামায়া ইহার মধ্যে দিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? এই কথা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সেই ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া অতিশয় হাস্য সহকারে কহিলেন,—আদরিণি! তুই কি পাগল হয়েছিস? আমার সঙ্গীত সাধনার এখন কিছুই হয় নি। সঙ্গীতের মহাশক্তির যে স্বরূপ তার কৃপা কণামাত্রও আমার লাভ হয়েছে কিনা সন্দেহ। তুই বল্লি, আমি সুরের দেশে চলে গেছি; তাই যদি হয় তাহলেত তোরাও সেখানে চলে গেছিস। কারণ যাওয়ার খবর বুঝতে পারার মানেই ত সেখানে তারও যাওয়া হয়ে গেছে। তাহলে বুঝ্ আমিও যেখানে তোরাও সেখানে। কাজেই কেউ কাউকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া তোদের মধ্যে আমি মানুষ দেখি, মানবত্তা দেখি, প্রকৃতির যথার্থ সৃষ্টি দেখি, সাধনার উৎস দেখি। আমার গানের সুরে তোরা যেমন সহজে ধরা দিয়েছিস্, তন্ময় হচ্চিস্ তেমনি কি অন্ত সমাজে পাওয়া যায় রে! তারা তোদের মত অত সহজ নয়, ধরা দিতে চায় না এবং পারেও না বলে সুরকারেরাও সেখানে সঙ্গীতের যথার্থ ভাবে ধরা ছোঁয়া পাবার অবকাশ পান না। জনগণের রুচি ও মনস্তুষ্টির উপরই বেশীর ভাগ নির্ভর করে চলতে বাধ্য হন। সেখানে কেবল নাম ও অর্থ কাঙ্গালের মত কুড়িয়ে বেড়াতে হয়। যাক্ এসব বড় বড় সমাজের কথা তুই এখন বুঝবি না, পরে বুঝবি। এই বলিয়া আদরীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া তাহাদের কুটিরাভিমুখে রওনা হইলেন।

সমস্ত রাস্তাটুকু "পরে বুঝবি" কথাটি আদরীর মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। উহার ভাবার্থটুকু কল্পনায় আসিবামাত্র আশা ও আনন্দ তাহার অন্তরে শিহরণ জাগাইয়া মনকে পুলকে আপ্লুত

করিয়া দিতে লাগিল। সাধক তাহার এইরূপ উদ্দীপনাময় ভাব লক্ষ্য করিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিলেন। আদরীদের কুটির সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া সাধক কহিলেন,—আদরিণি! আজ আর আমি তোমাদের ওখানে যাব না। রাত হয়ে আসছে, আমার সাধনার সময় উপস্থিত হয়ে এ'ল। আমি আজ যাই, অন্য একদিন এসে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাব, কেমন? আদরী বিনীত ভাবে সম্মতি জানাইল। সাধক কুটিরাভিমুখে দ্রুতপদে রওনা হইলেন। যতক্ষণ দৃষ্টি গোচর হইল ততক্ষণ পর্য্যন্ত আদরী একদৃষ্টে সাধকের প্রতি ভক্তি বিগলিত ভাবে চাহিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছু দিন পরে সাধক শুনিলেন, আগামী কল্য আদরীদের বাৎসরিক পূজা পার্ব্বনের দিন, এবং ইহাও শুনিলেন যে, পল্লীবাসীরা আসিয়া তাহাদের পর্ব্বানুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আসিবে। তাহাই সত্য হইল; পরদিন সাধকের সঙ্গীত সাধনার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া উক্ত অধিবাসীদের কয়েকজন মাতব্বর ও শিশুর সহিত আদরী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সকলে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহাদের পল্লীতে সেইদিন মধ্যাহ্নে আগমন নিমিত্ত সবিনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিল।

সাধক, বয়স্কদিগের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া এবং শিশুদের প্রতি স্নেহাশীষ পূর্ণ আদর জানাইয়া সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উভয় পক্ষে দুই চারিটি কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আগন্তুকরা পুনশ্চ সাধককে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

মধ্যাহ্নে সাধনা সমাপন করিয়া সাধক অধিবাসীদের কুটির উদ্দেশে বহির্গত হইলেন সারং রাগের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইবা মাত্র তাঁহার কর্ণে সঙ্গীতের সুমিষ্ট স্বর আসিয়া প্রবেশ করিল। সাধক আশ্চর্য্যান্বিত ও উৎকর্ণ হইয়া অনুধাবন করিতে লাগিলেন, কোথা হইতে ভৈরবী রাগের এক খণ্ড অংশ ভাসিয়া আসিল! মনে মনে করিতে লাগিলেন, আমি ছাড়া সুরের পূজারী এখানে আর কেহ নাই! এইরূপ বিস্ময় ও চিন্তাপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে সেই সুর শুনিতে শুনিতে সামান্য দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি বটবৃক্ষের তলে তাঁহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া আদরী বসিয়া আছে। সাধক অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এই

বন্য মেয়েটির অনুকরণ শক্তি দেখিয়া। তিনি অতি সন্তর্পণে তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া একটি বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক আদরীর কণ্ঠের ভাবোন্মত্ত ভৈরবী রাগের আংশিক রূপ শুনিতে লাগিলেন। আদরী সাধকের উপস্থিতির বিষয় কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না, অথচ তাহার উপাস্য দেবতা নিকটেই দণ্ডায়মান। সে আবার একটি সুর ধরিল, তাহা ঠিক ভৈরব রাগের মত। এই রকম ভাবে দুই তিনটি রাগের টুক্‌রা টুক্‌রা সুর আদরীর সুমধুর কণ্ঠে শ্রবণ করিয়া সাধক অতিশয় আনন্দিত ও পুলকিত হইলেন। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সাধক আদরীর তন্ময়তা ভঙ্গ না করিয়া তাহার অলক্ষ্যে সরিয়া পড়িলেন এবং তাহাদের কুটিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পল্লীর সকলে উল্লসিত হইল। সাধক সকলের সঙ্গে সহাস্যে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আদরীর মা মাতৃসমা স্নেহে সাধকের মস্তকে ও গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। সাধককে তাহার দেবকুমার বলিয়া মনে হয়। নিজ সন্তানের মত ভাবিতে চাহিলেও ভয় পায় নিজদিগকে জগতের সমস্ত কিছু সুন্দর হইতে চিরবিচ্ছিন্ন মনে করিয়া। তাই ইহাদের সব কিছু অনুভূতিই ফল্গুনদীর মত অন্তস্তলেই প্রবাহিত হইতে থাকে। প্রকাশ করিবার অধিকার ও দাবী তাহাদের নাই, এই কথাই তাহারা চিরকাল স্বীকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু উপরস্তরের মানুষেরা যদি তাহাদের অন্তরের সহিত নিজেদের অন্তর মিশাইয়া স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসার স্পর্শ দিতে পারেন তাহা হইলে আমার মনে হয় সমস্ত কিছু অনুভূতির প্রবল প্রস্রবণ তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। ইহাদের সান্নিধ্যে বাস করিয়া সাধক উহা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়া ইহাদের মানবত্তা শ্রদ্ধাভরে চিনিয়া লইয়াছেন। আদরীর মাকে তিনি জননী রূপে শ্রদ্ধা করেন।

সাধক একটু প্রচ্ছন্ন কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আদরীর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আদরী কোথায়? প্রৌঢ়া জননী বলিলেন,—অনেকক্ষণ আগে আমাকে বল্‌ল "আমি গাছতলায় পড়তে যাচ্ছি, তিনি এ'লে পর তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব," তাইত কি হ'ল! আমার এতক্ষণ খেয়াল ছিল না তোমার আসার আনন্দের মাঝখানে। কোথায় গেল পাগ্‌লী! কি আর বল্‌ব বাবা! আদরী এখন আর রাত্রি ছাড়া এবং খাওয়া দাওয়ার সময়টি ছাড়া ঘরে মোটেই বাস করে না। আগে পল্লীর প্রত্যেক ঘরে তার দেখাশুনা ও খেলাধূলা ছিল। এখন আর সে কারও বাড়ী যায় না। কেবল তোমার কাছে মাঝে মাঝে যাওয়া ছাড়া বাকি সমস্ত দিন গাছতলায় বসে বিড়্ বিড়্ করে পড়ে. লেখে আর মাঝে মাঝে কি সব আ-আ করে গান করে। এই দেখনা আজ আমোদ প্রমোদের দিন, কিন্তু এখন আর তার এসব ভাল লাগে না। আগে কি মাতামাতিটাই না করত; সেইই যেন পরবের প্রাণ ছিল। জানিনা বাবা, আমাদের মত জাতের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখে কি লাভ হবে! তবে আমরা তোমাকে দেবতার মত মনে করি, তাই এই ভেবে আমরা স্থির করেছি যে, দেবতা যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। তোমার গুণের উপর আমাদের এ বিশ্বাস আছে যে, তোমার আদেশ মান্‌লে ওর সব দিক দিয়ে ভালই হবে। আর, ও মেয়েটাও তোমাকে যেন দেবতার অধিক ভক্তি করে। মেয়েটা বড় জেদী। আমাদের কিইবা কাজ, তবু ছোট থেকে ও যে কাজে হাত দিবে সে কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ওর শান্তি থাকে না। এক একদিন ঘুম ভাঙ্গলে দেখি আদরী স্বপ্নের ঘোরে বিড়্ বিড়্ করে পড়া মুখস্ত ক'রছে। কোন দিন আবার হিন্দী কথায় গান গেয়ে উঠে। একদিন নড়িয়ে উঠাতে গেছলাম ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো—"আমাকে কেন জাগালে?

বেশত স্বপ্নের মধ্যে আনন্দে ছিলাম, এক এক সময় বাবুজীর গান শুনতে পাচ্ছিলাম," তাই বলি বাবা ও যেন এখন পড়া ও গানে পাগল হয়ে গেছে।

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে আদরী সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সাধককে সম্বোধন করিয়া বলিল,—আপনি কতক্ষণ এসেছেন বাবুজী? আমি মনে করেছিলাম কতক দূর হ'তে আপনাকে সঙ্গে করে আনব, এ জন্যে অনেকক্ষণ ধরে গাছের তলায় বই পড়তে পড়তে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম।

সাধক সকৌতুক হাস্যে কহিলেন, পাঠাভ্যাসে আজকাল খুব মনযোগ দিয়েছ দেখ্‌লাম, আমার গানের সুরকে ভেঙ্গানর দ্বারা।

এই কথা শুনিয়া আদরীর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল, এবং নিজেকে অত্যন্ত অপরাধিনী মনে করিয়া করজোড়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিল।

এবম্প্রকার আদরীর চেহারা দেখিয়া, পরিহাসের দ্বারা মানুষের যে এই রকম অবস্থা হয় তাহার সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় অত্যন্ত বেদনাহত হইয়া সাধক আদরীর মস্তকে সাদরে হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন,—আমার কথায় এত ভয় পেয়ে গেলে কেন বলত আদরিণি? আমি কেবল মিথ্যার দ্বারা পরিহাসছলে ওই কথা বলেছি মাত্র। এইমাত্র আসবার সময় তোমার পশ্চাৎ দিক হতে অতি সন্তর্পণে তোমার নিষ্ঠা ও ভাব গদগদ সঙ্গীত শুনে আমি পরম পরিতোষ লাভ করে এসেছি। সঙ্গীতের মধ্যে ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বস্তু, এবং উহাই সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ। যে সঙ্গীত শ্রবণে ও প্রকাশে মানুষের মনে ভাবের সঞ্চার হয় না, সে সঙ্গীতে বুঝতে হবে প্রাণবস্তুর অভাব আছে এবং সে সঙ্গীতে যত কিছুই না পরিশ্রমের দ্বারা তানালঙ্কারে ভূষিত

হয়ে থাকুক, তাকে কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তির উপর মূল্যবান অলঙ্কার ও সাজ সজ্জায় ভূষিত করার মতই মনে হবে। তাই বলছি, তুমি সেইভাব অর্থাৎ প্রাণবস্তুকে অনেকখানি আয়ত্তে এনেছ। ইহা তুমি হয়ত পূর্ব্ব জন্মের সাধনার ফলে কিম্বা হয়ত যে উপাদানে সৃষ্ট হয়েছ সেটা ভগবানের কৃপা প্রেরিত বস্তুর দ্বারা লাভ করেছ। যাই হোক তোমার স্বভাবজাত প্রতিভা দেখে ঐ দুটোকেও মেনে নিতে হবে। এরূপ আধার যাদের থাকে তাদের পক্ষেই সঙ্গীতের মত বিরাট বস্তুকে যথার্থভাবে সাধনার মাধ্যমে ধরে রাখতে পারা সম্ভবপর হয়। আমার আজ মনে হচ্ছে, হীরা জহরতের মত মানুষের মধ্যেও কত অমূল্য সম্পদযুক্ত ব্যক্তি লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে লয় পেয়ে যাচ্ছে। আমার খুব ভাগ্য ভাল যে, জ্ঞান লাভ করতে পারলাম এই অভিজ্ঞতা পেয়ে যে, প্রতিভা সকল জাতির সকল স্তরের মধ্যেই আছে। উপরন্তু আমার মনে হয়, ভাব ও নিষ্ঠাবস্তুটি তোমাদের মত শ্রেণীর মধ্যেই বেশী।

আদরী বুঝিল, সাধক উপদেশছলে ও ভাবাবেশে অনেক শিক্ষণীয় কথা বলিয়া যাইতেছেন। তত্রাচ সেই সমস্ত কথার মধ্যে তাহার প্রশংসা থাকায় সাধককে সবিনয়ে নিরস্ত হইতে বলিয়া অতি লজ্জাযুক্ত ভাবে সরিয়া পড়িতে পড়িতে বলিল,—ঐ দেখুন আপনার জন্যে সকলে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছেন।

সাধক তখন অপ্রস্তুত ভাবে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া কুটিরবাসী পুরুষদের সঙ্গে পর্ব্বানুষ্ঠানে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি বটবৃক্ষের তলদেশে বেদীর উপর ঘট স্থাপনা করা আছে এবং তাহার দুই পার্শ্বে কয়েকটি পোড়ামাটীর বৃহদাকারের হাতী, ঘোড়া এবং মনসার বারি সারি সারি সাজান আছে। ইহাঁরাই

এই সকল জাতিদের মূর্ত্তিময় ও মুর্ত্তিময়ী দেব দেবী। পূজাস্থানে স্তূপীকৃত বিল্বপত্র ও পুষ্প ; পুষ্পের মধ্যে আকন্দ, গুলঞ্চ, করবীই বেশী। এতদ্ অঞ্চলে এই সকল পুষ্পই স্বভাব-জাত ও সুপ্রাপ্য। পূজা মণ্ডপটীকে শালবৃক্ষের শাখায় আচ্ছাদিত করা হইয়াছে। ধূনার গন্ধে স্থানটি সৌরভময় করিয়াছে। বেদীর নিম্নে অনেকগুলি প্রস্তর পাত্রে দধি, দুগ্ধ, চিড়া গুড় ও দেশজ ফলে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। সেখানে কুটির বাসিনীরা শুদ্ধচিত্তে ভক্তিভরে দণ্ডায়মানা।
শিশুরা সারিবদ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া আছে পূজার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া এবং সকলে একাগ্রমনে পুরোহিতের পূজার মন্ত্রপাঠ শুনিতেছে। সাধক শিশুদের কাছে যাইয়া তাদের সঙ্গে ভূমির উপর বসিয়া পূজা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য বসিতে একখানা নূতন চাটাই আনিয়া রাখা হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহাতে বসিলেন না।

পুরোহিতঠাকুরের পূজা সমাপন হইয়া যাইবার পর মাল্‌সার উপর অগ্নি প্রদান করিয়া তাহার উপর ধূনা সঞ্চারণ করিতে করিতে কয়েকটি নারী মস্তকে লইয়া তাহাদের দেবতার উদ্দেশ্যে মানত পালন করিল। এই মানত অনুষ্ঠান বাদ্য সহকারে কিছুক্ষণ চলিবার পর পূজা সমাধা যখন হইল তখন নরনারী সকলে মিলিয়া সানুনয়ে সাধককে বলিল,—বাবুজী! আপনি আমাদের গরীবের ঠাকুরের কাছে যদি একটু গান শুনান তাহলে আমরা কৃতার্থ হ'ব এবং এ বছর আমাদের পূজা সার্থক হ'ল মনে করবো।

সাধক বিব্রত হইয়া দুঃখের সহিত মনে মনে বলিলেন, "তোমাদের ঠাকুর বা দেবতা আমাদের থেকে আলাদা, এই ধারণা তোমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ আমি আজিকার অভিজ্ঞতায় বুঝিলাম, তোমরা পূজা কর নিষ্ঠা, ভক্তি ও অন্তর দিয়া, তাই গাছতলাতে পাথরের নুড়ি

ও হাতী ঘোড়ার মধ্যেও তোমরা ভগবানকে আনিতে পার ; আর আমরা বেশীর ভাগ পূজা করি মূর্ত্তির নামে কলাচাতুর্য্যের, ভগবানের নামে ঐশ্বর্য্যের, গর্ব্বের, অর্থ অপব্যয়ের ও হৈ হল্লার। এবম্প্রকার আমাদের পূজার অনুষ্ঠান দেখিয়া ভগবান বোধ হয় অন্তরীক্ষে নিশ্চয়ই হাসেন। আর তোমাদের এই প্রকার নিষ্ঠা, ভক্তির পূজায় সেই করুণাময় কি না এসে থাকিতে পারেন! তাঁহার করুণা যে তোমাদের উপরই সর্ব্বাধিক। তাইত মহাত্মা গান্ধীজী তোমাদিগকে হরিজন নাম দিয়া যথার্থ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আজ আমি সত্যই ঠিক জায়গায় গান শুনাইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম"। সাধক তাহার পর তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—এ জন্যে তোমাদের এত করে অনুনয় করবার কি আছে! তোমরা যে আমার গান শুনতে ইচ্ছা করেছ এজন্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এবং ভগবানের সামনে গান শুনাতে পেয়ে আমি ধন্য মনে করছি। এই কথা বলিয়া সাধক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গৌড়সারং রাগের একটি ভজন গান সুরু করিলেন। গানের প্রথম ছত্রটি এইরূপ,—

"তুঁহু সবজন ত্রাতা বিশ্ব বিধাতা
সব পর কৃপা করুঁ প্রভুজী"।

সাধকের গানের মূর্চ্ছনায় ও ভাবে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। সকলেরই চক্ষু হইল বাষ্পাকুল এবং শিশুরা হইল জড়পুত্তলীবৎ।

গীত সমাপন হইবা মাত্র সকলে দেখিল ঘটের শিরোদেশ হইতে কয়েকটি ফুল গড়াইয়া পড়িল। তখন সকলে সমস্বরে জয় প্রভু ভগবান কী জয়, জয় গানের রাজাকী জয় শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া আনন্দে নৃত্য শুরু করিয়া দিল। প্রবীণেরা সাধককে ক্রোড়ে তুলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। সাধক তখন মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া

পড়িলেন এবং সকলের ভিতর হইতে এই রকম নির্ম্মল ও ভাবপূর্ণ প্রাণের অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

ক্ষণকালের মধ্যে সকলে সুস্থির হইলে পর পুরোহিত ঠাকুর সেই পুষ্পগুলি সাধকের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—ধন্য আপনার সঙ্গীত সাধনা, যথার্থই আপনি সুর-সাধক। আজ ভগবান আপনার সঙ্গীত শ্রবণ করে চরম পুরস্কার দিয়েছেন, গ্রহন করুণ। সাধক কৃতাঞ্জলীপুটে পরম ভক্তি ভরে নত হইয়া পুষ্পগুলি মস্তকে ঠেকাইয়া বলিলেন,—আমাকে ও রকম ভাবে আপনারা বড় ভাববেন না। আমি অতি সামান্য সাধক মাত্র এবং আপনাদের পাঁচ জনের মতই আমিও একজন। আমি শ্রদ্ধা, ভক্তি চাই না, চাই, সকলের কাছে স্নেহ, ভালবাসা ও মমতা। সেইটুকু পেলেই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সুখী হব এবং তার সঙ্গে যেন আপনাদের মত ভক্তিমান শ্রোতার সঙ্গ সুখ লাভ করতে পারি এইটুকু আশীর্ব্বাদ করুন। এই বলিয়া পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে বেদীতলে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

পুরোহিত ঠাকুর সাধককে বলিলেন বাবুজি! আপনাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিতে পারি কি?

সাধক কহিলেন, 'প্রসাদ দিতে পারি' এ কথা কি বল্‌ছেন! শুনলেও মহা অপরাধ হয়। দিন আমায় প্রসাদ।

তখন সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, হাতে নয়, হাতে নয় ঠাকুর মশায়! ওঁকে আসনে বসিয়ে ভালকরে' প্রসাদ দিন।

সাধক কহিলেন,—আমি ও রকম ভাবে প্রসাদ ভোজন করব না; তোমরা সকলে এসে বোসো, এক সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করা যাবে।

এই কথা শুনিবা মাত্র আনন্দে শিশুরা দৌড়াইয়া সাধকের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল। সাধকের অনুরোধে সকলে একসঙ্গে

বসিয়া শালপত্রাধারে করিয়া দেবতার প্রসাদ দধি, দুগ্ধ, চিড়া, গুড় ও কদলী মিশ্রিত সুখাদ্য ফলাহার পরম তৃপ্তি সহকারে আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আহার করিল। সাধক মনে মনে বলিলেন, খাওয়ার মধ্যে এমন আনন্দ ও তৃপ্তি জীবনে বোধ হয় এই প্রথম পাইলাম।

আহারাদির পর কিশোর কিশোরীদের নৃত্য, গীত, এবং যুবা ও বয়স্কদের গীত, মাদলবাদ্যের তালে তালে আরম্ভ হইল। দেশজ, গ্রাম্য-গীত, ও নৃত্যের মধ্যে যে অনাবিল প্রাণ মাতান ভাব আছে, তাহার আকর্ষণে সাধকের মন অভিভূত হইয়া গেল। তিনিও তখন সেই গীত ও নৃত্যের সুর-ছন্দে মস্তক দোলাইয়া দুই হস্তে তাল দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নৃত্য-গীত সমাধার পর সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। আদরী তাঁহাকে কুটির পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসিল। পথি মধ্যে কথাবার্ত্তায় সাধক কহিলেন,—আমার খুব ইচ্ছে হচ্চে তুমি সঙ্গীত শিক্ষা কর। তুমি যেরূপ সুকণ্ঠী ও অনুকরণ-শালিনী তাতে করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তুমি যথা শীঘ্র সঙ্গীত বিদ্যা আয়ত্তে আন্‌তে পারবে। এ সময় দেবী মাস, সঙ্গীত শিক্ষারম্ভের পক্ষে শুভ সময়। এ জন্যে আমি মনে করছি শুক্লপক্ষের এই সপ্তাহে বিদ্যা-রম্ভের শ্রেষ্ঠদিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে তোমার শিক্ষা আরম্ভ হ'ক। তোমার ঐকান্তিকতা আমি অন্তরে অনুভব করেছি; তত্রাচ জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি তোমার এতে সম্মতি আছে তো ?

আদরীর এই কথা শ্রবণে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই সাধক বুঝিতে পারিলেন। আদরীর দেবতা এতদিনে তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন; ইহার চাইতে তাহার জীবনে আর কি কামনা থাকিতে পারে!

আদরীর অন্তর যেন আনন্দে নাচিতে লাগিল, সে তৎক্ষণাৎ ভূমিষ্ঠ

হইয়া সাধকের চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া সকৃতজ্ঞ ভাবে, সাশ্রুনয়নে সাধকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ নতদৃষ্টে হাত দুইটি জোড় করিয়া রহিল। সাধক সস্নেহে আদরীর মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া কহিলেন,— তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না, আমার জিজ্ঞাসার সব উত্তরই পেয়ে গেছি। এইরূপ কথাবার্ত্তা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধক আসিয়া পৌছিলেন তাঁহার কুটির সমীপে। আদরী সেই দিনকার মত প্রণাম করিয়া বিদায় লইল এবং পরম হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাগমন করিল। সাধক কুটির মধ্যে প্রবেশ করিলে পর তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্যের কথা মনে হইয়া গিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিল। তিনি ভীষণ চিন্তার মধ্যে ভাবিতে লাগিলেন, তাইত গুরুদেবের অনুমতি পূর্ব্বাহ্নে না জানিয়া লইয়া আদরীকে শিক্ষা দিবার কথা বলিয়া ফেলিলাম কেন; ইহাত উচিত মত কার্য্য করিলাম না। এই রকম নানা চিন্তা পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের উদ্দেশ্যে পত্র লিখিতে বসিলেন। উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে সবিস্তৃত বর্ণনা পূর্ব্বক লেখা সমাধা করিয়া তৎপর দিবস উহা ডাকে প্রেরণ করিবার জন্য একটি বালককে দিয়া মঠে পাঠাইলেন এবং সেই সময় হইতে উত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহানগরীর একপ্রান্তে একটি পুরাতন ক্ষুদ্র ভাড়াবাড়ীর নিম্নতলের স্বল্প পরিসর ও পরিচ্ছন্ন নিভৃত বৈঠকখানা গৃহে প্রৌঢ় বয়সী উজ্জ্বলকান্তি, মস্তকে নাতিদীর্ঘ কেশ, শ্মশ্রুগুম্ফযুক্তমুখমণ্ডল, অন্তরভেদী উজ্জ্বল-চক্ষু, সুতীক্ষ্ণ নাসিকা, দীর্ঘাকৃতি ঋষিতুল্য বিশিষ্ট একটি ব্যক্তি মৃগচর্ম্মের উপর পদ্মাসন যুক্ত হইয়া দক্ষিণক্রোড়ে সুবৃহৎ তম্বুরাটি স্থাপন পূর্ব্বক নিমীলিত নয়নে শ্যামা মায়ের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনমূলক ভাবের বাংলা ভাষায় রচিত একখানি গান ভৈরব রাগে ধ্রুপদ অঙ্গের চৌতাল তালে ভাবে বিভোর হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া গাহিতে ছিলেন, এমন সময় জানালা-ভ্যন্তর দিয়া একখানি খামের পত্র পিয়ন নিক্ষেপ করিয়া গেল। তৎশব্দে গীত-সাধকের ধ্যান ভঙ্গ হইলে পর দৃষ্টি পড়িল পত্রখানির উপর। পত্র খানি গায়ক তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইলেন এবং খুলিয়া অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি-পাত মাত্র বুঝিলেন তাঁহার মানসপুত্র, আকাঙ্ক্ষিত কল্পনার রূপদাতা, পরম আদরের প্রিয়তম শিষ্যের দ্বারা উহা লিখিত। অনেকদিন নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত এই শিষ্যটির সংবাদ না পাওয়ার জন্য তিনি ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই আজও মায়ের কাছে গীতারম্ভের পূর্ব্বে বিশেষ আকুলভাবে তাহার কুশল-কামনা জানাইয়াছিলেন। এই জন্য পত্রখানি পাইবা মাত্র মায়ের উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণতি জানাইয়া বলিলেন,—মা গো! তুই মানুষের সত্যকারের বেদনার ডাক শুনিস্ বলেই ত করুণাময়ী জগজ্জননী নাম নিয়েছিস্। এই বলিয়া পুনশ্চ মায়ের চরণোদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পত্রের লেখক প্রথমতঃ গুরুদেব ও গুরুমাতার উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক সভক্তি ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাইয়া এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করিয়া পরে আদরীর কথা সবিস্তারে জানাইয়াছেন এবং পরিশেষে লিখিয়াছেন, "মেয়েটির প্রকৃতির বিষয় দীর্ঘ পত্রে সমস্তই অবগত হইবেন এবং তাহাদের জাতির কথাও উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রকৃতিরূপা মেয়েটিকে আপনি দেখিলে তাহাকে সমস্ত জাতির উর্দ্ধে মনে করিবেন। আমি আপনার মনের ধারা, বিচারের উদারতা ও মহত্ত্ব জানি ও সেইরূপ আপনার কাছে শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া এই মেয়েটিকে আপনার অনুমতি লাভ করিবার পূর্ব্বেই নিজ ইচ্ছায় শিক্ষা দিবার মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু তত্রাচ এখন আমার মনে হইতেছে যে, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত কর্ত্তব্যহীনতার কার্য্য হইয়াছে। আপনি ক্ষমা ও কৃপা পূর্ব্বক এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা যথাসম্ভব শীঘ্র আমাকে জানাইবেন, এই সবিনয়ে প্রার্থনা করি। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি ভালই আছি ও যথা রীতি সাধনা করিতেছি।

শ্রীচরণে নিবেদন

ইতি—

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী চিরানুগত ভৃত্য আপনার শিষ্য—

শ্রীভারতী কুমার"

পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠে পরম পুলকিত হইয়া গুরুদেব তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর লিখিতে বসিলেন। প্রথমতঃ পরম স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ দান করিয়া মন্তব্যে জানাইলেন, "তুমি মেয়েটির সম্বন্ধে সবিস্তারে যাহা লিখিয়াছ তাহাতে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। যেখানে পরম সত্যকে উপলব্ধি করিবে সেখানেই জানিবে ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন এবং সেই সত্যের মধ্যেই সুরব্রহ্মের রণণ সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত হইতেছে। নিষ্ঠা, বিশুদ্ধতা,

একাগ্রতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, ধর্ম্মে মতি ও ভাব, এইগুলির একত্রীভূত শক্তির মধ্যেই নিহিত আছে সত্যের অর্থাৎ পরব্রহ্মের সন্ধান। ঐ বস্তুগুলি প্রত্যক্ষ করা ও পাওয়ার মধ্যে বড়, ছোট, নীচ, দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত বলিয়া কিছু নাই। সকলের মানবত্তা সেখানে এক।

জাতির প্রয়োজনেই জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, উহা ভগবানের সৃষ্টি নহে। উপরোক্ত বস্তুগুলিই মানুষের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ পরিচয়। কাম্য বস্তুকে পাইবার জন্য উহাদের অপেক্ষা বড় আর কোন কিছু আছে কিনা আমার জানা নাই। প্রথমোক্ত বস্তুগুলির মধ্যে যদি যে কোন একটিরও অভাব ঘটে তাহা হইলে কাম্য বস্তুকে লাভ ও উপলব্ধি করা কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না এই আমার বিশ্বাস। শিক্ষার ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই বাণী বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

এই সমস্ত যুক্তিমূলক বাক্য তুমি বিশেষভাবেই জ্ঞাত আছ। সুতরাং বেশী কিছু তোমায় জানান বাহুল্য। তোমার শক্তিরূপিণী ভাবী শিষ্যাকে নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা নিয়মে দীক্ষা দিবে। আমিও সেইদিন সুর-ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে তাহার সাফল্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা জানাইব। মধ্যে মধ্যে পত্র দিতে বিরত থাকিও না। বিলম্বে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়ি। তোমার গুরুমাতার স্নেহাশীষ জানিবে। তিনি তোমার জন্য বড়ই উদ্বিগ্না হইয়া থাকেন। আজ হইতে দুইটি মানুষের কুশল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিব। মঠের সন্ন্যাসী মহারাজদের এবং স্থানীয় প্রিয় অধিবাসীদের কুশল জানিতে বাসনা করি।

ইতি—

পরম শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশ্যামাচরণ দেবশর্ম্মা।”

যথাযথ ঠিকানা লিখিয়া পত্রখানি নিকটস্থ ডাক বাক্সে ফেলিয়া

আসিয়া পুনর্ব্বার গীত সাধনায় বসিলেন এবং ভৈরবী রাগে ও চৌতাল তালের "ভস্ম অঙ্গ গৌরী সঙ্গ জটা মে বিরাজ গঙ্গা চন্দ্রমা ললাটধর অধিক সোহা দেত হৈ............।" এই বিখ্যাত গানটি গাহিতে সুরু করিলেন।

তিনি যখন সুরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া গাহিতে ছিলেন সেই সময় গৃহিণী আসিয়া প্রথমতঃ খুব আস্তে আস্তে বলিলেন, "চাল বাড়ন্ত"। আবার খানিক পরে ঐ কথা বলিলেন ; এই রকমভাবে তিন চারিবার বলাতেও যখন সুরকার শুনিতে পাইলেন না তখন স্বল্লোচ্চস্বরে ঐ কথা পুনশ্চ বলিলেন। তখন সেই শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া গানের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিল। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও বেদনাহত চিত্তে তম্বুরাটি মস্তকে ঠেকাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রজ্জুতে টাঙ্গাইয়া গৃহিণীকে বলিলেন,—সঙ্গীত সাধনার মাঝখানে সারাজীবন যে এত ব্যাঘাত পেতে হবে তা আগে জানতাম না। গানের ধ্যান ভঙ্গ হলে কি রকম কষ্ট হয় জান গিন্নী ? খুব ক্ষুধার্ত্ত শিশু যখন মাতৃস্তন্য পান করে তখন তাকে যদি কেহ জোর করে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যায়, তখন তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি হয় আমার। মনে হয় শিশুর মত চেঁচিয়ে কেঁদে বলি, ওগো আমায় মুক্ত কর আমাকে সেখানে থাকতে দাও যেখানে আমি রসামৃত পান করছিলেম। কি বলব গিন্নি ! প্রথম জীবনে ভেবেছিলেম এর চর্চ্চায় যে আত্মবিশ্বাস, ধর্ম্মভাব ও বলিষ্ঠ আত্মনির্ভরতা লাভ হয়, তাতে করে সঙ্গীতের যথার্থ মান মর্য্যাদা রক্ষা করে যেতে পারবো এবং সংসারী হয়েও তা অসম্ভব হবে না, কিন্তু তখন জগৎটাকে ঠিক চিনতেম না। সংসারের মধ্যে এসে ক্রমশই বুঝ্‌তে পারলেম যে একমাত্র অর্থই এখানে সর্ব্বস্ব। মান, মর্য্যাদা, জ্ঞান, বিদ্যা, সাধনা, গুণ এ সকল তার ভৃত্য। অর্থহীন ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা এগুলির মর্য্যাদা

যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে যাবেন তাঁদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করতেই হবে। তাঁদের পরিচয় ও নামের ডঙ্কা বাজবে না, আর তা না বাজলে অর্থও আসবে না। যাক্‌গে,—দাও থলেটা, এ বেলার মত চাল এনেদি, তারপর ওবেলা একটি ছাত্রীর কাছে গান শেখানর মজুরি পাবার আশা আছে, যদি ভগবান কৃপা করেন তাহলে বেশী করে এনে দেবো।

বিদুষী গৃহিনী বলিলেন,—কি করব বল ? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ছিলেম, শেষে দেখলেম ক্রমশঃ বেলা বেড়েই চলেছে। তোমার গানের ধ্যান এখনও ভাঙ্গবে না, তখন বাধ্য হয়ে তোমার মনে আমাকে আঘাত দিতে হ'ল। এতে কি আমারই কম কষ্ট হয় মনে কর ? তাহার পর বলিলেন,—কি করবে বল! আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন প্রকৃত গুণী ব্যক্তিকে চিনে নিয়ে তার যথার্থ সমাদর ও সম্মান দান করবার মত জ্ঞান ও বিচার-শক্তি সঞ্চয় করতে জাতির পক্ষে এখনও ঢের দেরি আছে। কাজেই দুঃখ করে কোন লাভ নেই। খ্যাতি, মান, অর্থ, যশ এগুলো ভাগ্যের জিনিষ। শিক্ষা, সাধনালব্ধজ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার এ আলাদা জিনিষ। এদের লাভ করার উপর দাবি ও নির্ভরতা নেই প্রথমগুলিকে পাওয়া হবেই ব'লে। খ্যাতি, মান, ইত্যাদি পাবার জন্যে সাংসারিক জীবনে মনের মধ্যে খুবই দাবি ও অভিমান আসে দেশের ও জাতির কাছে এবং তা' খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু ঐ যে বললেম, ওটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর সতীন সম্পর্ক বলে ইনি ওঁকে দেখতে পারেন না, অদৃষ্টের বিড়ম্বনার সেও একটা কারণ। লক্ষ্মীর যদি কৃপা থাকে তাহ'লে মানুষের খ্যাতি, মান, মর্য্যাদা সহজ লভ্য হয়। তখন যশোভাগ্য লক্ষ্মীর ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। যতদিন প্রত্যেক উচ্চ বস্তুর প্রতি মানুষের যথার্থ জ্ঞান ও বিচার শক্তি না

আসবে এবং হিংসা, দ্বেষ, ও মনের অপ্রসারতা দূর না হবে ততদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলবে। অবশ্য একথা বিশেষ করে' আমি সঙ্গীত সম্বন্ধেই বল্‌লেম। কাজেই কি করবে বল ? তুমিত বল "এ বেশ আছি ; কোন রকমে দুমুটো অন্ন এবং মোটা কাপড় ভগবানের দয়ার দানে জুটে গেলেই যথেষ্ট" তবে আবার কেন ঐ সব মনঃপীড়ার কথা তুলছ ?

গুরুদেব বলিলেন—গিন্নি, ! আমি কি ধন ও সুখ ভোগের জন্যে ওসব কথা বলি ? তা নয় ; সঙ্গীতের মত ব্রহ্মবিদ্যার যে আমি যথার্থ মর্য্যাদা রাখতে পারলেম না সেইটাই আমার অন্তরে অহরহ পীড়া দিতে থাকে।

গৃহিনী বলিলেন,—সেটা তোমার ইচ্ছাকৃত দোষ নয়। বর্ত্তমানের আবহাওয়াকে রোধ করবে তুমি কি করে ! তাছাড়া যথার্থ মর্য্যাদা তুমি গৃহী হয়ে একক ভাবে রাখবার আশা কি করে করতে পার বল ? সঙ্গীতের যথার্থ মর্য্যাদার পদ সেই দিন থেকে নামিয়ে এনেছে, যেদিন থেকে সাধকপদ ত্যাগ করে সঙ্গীতজ্ঞরা সঙ্গীতশিল্পীরূপে গড়ে উঠে রাজ দরবারে খ্যাতি, মান ও অর্থ পাবার আশায় পালকপ্রভুদের মনস্তুষ্টির জন্যে নতজানু হয়ে সেলাম ঠুকে ঠুকে সুরব্রহ্মকে বিক্রয় করে এসেছে এবং তাঁদের হুকুম তামিল করে' এসেছে। কাজেই এতদিনের নেমে যাওয়ার পদকে আবার যথাস্থানে রক্ষা করা বহু সময়সাপেক্ষ এবং তার মত মনের ক্ষেত্র তৈরি হতে এখনও ঢের দেরী আছে। তবে আশার কথা, বর্ত্তমানে দেশশাসকেরা এর প্রতি একটু সদয় দৃষ্টি দিয়েছেন। যাই হ'ক কিন্তু আমি একথা আনন্দের সহিত বলতে পারি যে, সঙ্গীতজ্ঞরা রাজদরবারে ও জমীদারদের কাছে হুকুম তামিল করা, সেলাম ঠুকা ও নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে অর্থাৎ ভগবানের কৃপায় তাঁদেব সখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কল্যাণে আজ যাঁরা সত্য

সাধারণ সমাজে শিক্ষকতায় ব্রতী হয়ে আছেন তাঁরা অনেক সুখে ও মান্যের সহিত আছেন। সুরের সাধনা করে 'ওস্তাদ্‌কো বোলাও' মাত্র ছুটে এসে সেলাম ঠুকে ঠুকে এগিয়ে যেতে, পেছিয়ে আসতেও আর হয় না। তাহলে বল সেটা কি কম লাভ ও কল্যাণ হয়েছে? আর একটা কথা, তুমি নিজে সাধনার ফল লাভ করে গানকালীন যে রসের তৃপ্তিতে মজে আছ তার কাছে আর বড় বস্তু কি আছে?

গুরুদেব বলিলেন,—বাস্তবিক, তুমি সবই সত্য কথা বলেছ; গিন্নী! আমি মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ি। ভুলে যাই তোমার মত শক্তি-ময়ী, বুদ্ধিতে ও বিচারে পারদর্শিনী, শান্তিময়ী সহধর্ম্মিনী যে লাভ করেছে তার কিসের দৈন্য, সে যে মহাভাগ্যবান।

গুরুদেবপত্নী বলিলেন,—এই নাও, তোমার যত কিছু এবার অনাছিষ্টি অবাস্তর স্তুতি আরম্ভ হল। অনেক বেলা হয়ে গেল, ওগো! কখন তোমাকে দুটো খেতে দেবো? ধরা গলায় এই কথা কয়টি বলিয়া থলেটি বাড়াইয়া দিলেন।

গুরুদেব, পত্নীর সজল মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার মস্তকটি বক্ষের কাছে টানিয়া লইলেন এবং অতি তৃপ্তির সহিত পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া দিলেন। পরে হাসি মুখে থলেটি হাতে লইয়া দুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে বহির্গত হইলেন।

গৃহিনী তাঁহার উদার, সঙ্গীত-প্রেমিক, ঋষিতুল্য পতি দেবতাটির গমন পথ অবলোকন করিতে করিতে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রত্যহ বৈকালে সাধক কিছুক্ষণ নদীতীরে পদচারণা করেন। তাহার পর একটি অশোক বৃক্ষের তলে বেদীর উপর তম্বুরা লইয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত রাগ-সাধনা করেন। এই বেদীটি তিনি সাধনার ক্ষেত্ররূপে নিজ হস্তে মৃত্তিকার দ্বারা তৈয়ার করিয়া লইয়াছেন। প্রকৃতির বাধা না আসিলে সেখানে অতি প্রত্যূষে, বৈকালে এবং রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে বহুক্ষণ ধরিয়া সাধনা করেন। স্থানীয় কোন লোকজন সেই সময় তাঁহার সাধনার কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাইতে আসে না। কেবল মাত্র আদরী অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রায়ই শুনিতে আসে। রাত্রিতেও সে বাধা মানে না এবং গতায়াতের ভয়ের লেশ মাত্র রাখে না। সে নিজেও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, কেন এত করিয়া সঙ্গীতের আকর্ষণে তাহাকে আকৃষ্ট ও সম্মোহিত করে।

পূর্ব্বদিন সাধক আদরীর শিক্ষা সম্বন্ধে গুরুদেবের অনুমোদন পত্রখানি পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ভাবনা মুক্ত যে আনন্দ তাহার মত তৃপ্তি কিছুতেই নাই। প্রফুল্ল চিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বৈকালিক রাগ, পূরবীর সুর আলাপ করিতেছিলেন সেই বেদীর উপর বসিয়া তম্বুরা সহযোগে। সেই সময় সেই সন্ন্যাসীঠাকুর মঠ হইতে বহির্গত হইলেন সাধকের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত।

এই পবিত্রচেতা সন্ন্যাসীটি গণদেবতার সেবাকেই জীবনের পরম ব্রত-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কোথায় কে অভাবগ্রস্ত, কোন্ ব্যক্তি রোগ পরিচর্য্যার অভাবে ভীষণ কষ্ট পাইতেছে, কাহার সন্তান অর্থাভাবে পড়াশুনা করিতে পাইতেছে না, কোথায় বিবাহ যোগ্যা কন্যার পিতা

অর্থাভাবে সুপাত্র সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না, ইত্যাদি সংবাদ লইয়াই তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন এবং প্রয়োজনানুসারে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য যথোচিত সুব্যবস্থা করেন। তাঁহার মত একাগ্র চিত্ত সেবাপরায়ণ ব্যক্তি বর্ত্তমান জগতে খুবই দুর্লভ। ইনি অর্থ সাহায্য ও অন্য নানাবিধ কর্ম্মের জন্য যেখানে যাঁহার কাছে যান, সেখানে তাঁহাকে সকলেই সসম্মানে অবস্থামত সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করেন। তাঁহার মহত্ত্ব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রতি সকলেরই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি আছে।

এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিটির বিস্তার পরিচয়ও আদর্শ স্থানীয়। ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দী এই তিনটি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত। কাব্য ও সাহিত্যেরও বিশেষ মর্ম্মগ্রাহী। সঙ্গীতে তিনি নিজে যদিও সাধনার দ্বারা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার প্রতি তাহার আগ্রহ সর্ব্বাধিক। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তিনি একজন বিশেষ ভক্ত ও বিশিষ্ট শ্রোতা। এই জন্য তিনি এই সঙ্গীত সাধকটিকে মনে প্রাণে ভালবাসেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ, সাহায্য ও সম্মান দেন। ইঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক থাকেন জীবনের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে মুহূর্ত্ত সময়টুকু পাইলেই।

এইদিন সন্ন্যাসীঠাকুর যখন সাধকের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন তখন দেখিলেন সম্মুখস্থ গর্ত্ত হইতে একটি বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহার মনে হইল সে যেন একমনে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে। হঠাৎ সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া যাওয়ায় সর্পটি গর্ত্তের মধ্যে লুক্কাইত হইয়া পড়িল। ইহা দৃষ্টে সন্ন্যাসীজীর মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। অনেকক্ষণ যাবৎ তিনি পরমতৃপ্তি সহকারে সাধকের সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন।

তাহার পর সাধক যখন দৃষ্টি উন্মীলিত করিলেন তখন দেখিলেন

সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহা দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সসম্ভ্রমে ও সাদরে তাঁহাকে বেদীর উপর বসাইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন,—কতক্ষণ এসেছেন মহারাজজি ?

উত্তরে সন্ন্যাসীঠাকুর কুশল জানাইয়া ও জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—এই কিছুক্ষণ হ'ল এসেছি। আপনার পূরবী রাগের আলাপ যে কি চমৎকার লাগছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একেই বলে রাগের উপর সুরের যথার্থ রূপদান। সর্পের কথা তিনি প্রকাশ না করিয়া কহিলেন,—যে সঙ্গীতে জীব মাত্রকেই আকৃষ্ট করে দেয় সেই সঙ্গীত আপনার কণ্ঠে মূর্ত্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রধান ধৈবত হতে মীড়যুক্ত হয়ে কড়ি মধ্যম, পঞ্চম, গান্ধার প্রধান মধ্যম ও কোমল ঋষভে নেমে এসে গান্ধারে দাঁড়ানর প্রকাশভঙ্গীটি অতীব সুমধুর ভাবে রাগের প্রকৃত ভাবরূপ প্রকাশ কচ্ছিল। বহুকালের সাধনা না হ'লে সুরকারের কাছে এইরূপ সুরের অমৃত রসাস্বাদ পাওয়া যায় না। আজ আপনার কণ্ঠে সেই রস পাওয়া গেল। সঙ্গীত সাধনার মধ্যে ধ্যানের আসনে সুরব্রহ্মকে স্থাপন না করলে এরূপ সুরের মাহাত্ম্য ও ভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর হতে পারে না। তাই আজ বিশেষ করে মনে হচ্ছে, নির্জ্জনে সাধকের মত সাধনা না করলে বোধ হয় সঙ্গীতের যথার্থ মর্ম্মগ্রাহী হওয়া যায় না।

বেশী আর কিছু বল্‌লে আপনি হয়তো বিচলিত হবেন এবং তার লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি, তাই ও প্রসঙ্গ এখন থাক। এইরূপ অলক্ষ্যে থেকে আর কোন দিন যদি আপনার কণ্ঠে ত্রিবেণী রাগের আলাপ শোনবার সৌভাগ্য ঘটে যায় তাহলে অনেক দিনের একটি বাসনা পূর্ণ হবে। ঐ রাগটি এখন আর তেমন শোনা যায় না। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর একত্র মিলনে যেমন ত্রিবেণীর পূতপবিত্র ধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং মানবগণ সেই সঙ্গমস্থলে অবগাহন করে' ধন্য

হয়, মুক্ত হয়, তেমনি সঙ্গীতের এই রাগটির রূপ-মাহাত্ম্য পূতপবিত্র ঐ সঙ্গম ধারার মত, এবং ইহা শুনিলে সেইরূপ পরিতৃপ্তি লাভ হয়। পূরবী, পুরিয়া ও শ্রী এই তিনটি রাগের একত্র মিলনে 'ত্রিবেণী' নাম হয়েছে, নয় কি ?

সাধক কহিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক তাই। ভবিষ্যতের জন্যে অলক্ষ্যে শোনবার আশা করে আপনাকে কেন থাকতে হবে ? আজই এক্ষুণি শোনাচ্ছি। আপনার সামনে গান করতে আমার ধ্যানের কোন ব্যাঘাত হবে না। পুরুষ প্রকৃতির মিলনে যেমন সৃষ্টির বিকাশ, শ্রোতা ও সুরকারের একাত্ম মিলনের মধ্যেও তেমনি সঙ্গীতের প্রকাশ ও জীবন্ত রূপ। যদি বলেন, তাহলে একক সাধনা কি ব্যর্থ ?—না তা নয় ;—সাধনা কখনও একক হয় না, সম্মুখে আদর্শ শ্রোতার মূর্ত্তি স্থাপনা করে সাধনা না করলে সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না। এ কথা আমার গুরুদেবের কাছে শিক্ষা। আপনাদের মত শুদ্ধচিত্ত, ভক্ত প্রেমিক, নিষ্ঠাপরায়ণ ও সুরজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেও সেই পরম আদর্শ শ্রোতা এসে সঙ্গীত শ্রবণ করেন। শ্রোতা ও সুরকার একাগ্রচিত্ত, ভগবৎ প্রেমিক হওয়া চাই, নচেৎ পরমানন্দ লাভ হয় না। আপনাকে এসকল কথা বলাই বাহুল্য।

উত্তরে সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন,—আপনার মুখে আজ অতি সারগর্ভ কথা শুনে বড়ই খুসি হলেম। বাস্তবিকই বর্ত্তমানে এখন যথার্থ আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন শ্রোতা ও সঙ্গীতজ্ঞের ভীষণ অভাব ঘটেছে বলে, সঙ্গীতের মধ্যে ব্রহ্মের আসন শূন্যে লীন হয়ে যাচ্ছে। তৎস্থলে এখন কেবল সুরের কসরত্ ও শ্রোতাদের হাততালি ও কলরব স্থান পেয়ে বসেছে। তা না হলে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠবস্তু ধ্রুপদের আজ এত অনাদর হয় ! যাক্, এখন আপনি দয়া করে আরম্ভ করুন একটু ঐ রাগের আলাপ।

সাধক তম্বুরা লইয়া সুরের ধ্যান আরম্ভ করিলেন। সুরকার ও শ্রোতা প্রায় ঘণ্টাবধি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া সুরের সাগরে ডুবিয়া রহিলেন। সাধকের কণ্ঠস্বর নিবৃত্তির পরও যেন সেই ত্রিরাগের একত্র সমাবেশের প্রতিমা মূর্ত্তিখানি অনেকক্ষণ যাবৎ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আদরীও অলক্ষ্যে থাকিয়া সমস্তই উপভোগ করিল এবং গীত সমাপনান্তে সুরের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আপনহারার মত ধীরগতিতে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সঙ্গীতের কিছুক্ষণ পরে সাধক ও সন্ন্যাসী সমাধি ভঙ্গের মত সঙ্গীতের ঘোর ভাব কাটাইয়া উভয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া দেখিলেন তদবস্থায় দণ্ডায়মান সেই সর্পটিকে। তাহার বোধ হয় তখনও সুরের ঘোর কাটে নাই। সন্ন্যাসীঠাকুর বুঝিলেন সর্পটি তাহাকে সাধকের মত আপনজন মনে করিয়া পরম নির্ভয়ে সঙ্গীতের সুর উপভোগ করিয়াছে এবং এখনও তাহার ধারণা বোধ হয় আবার এক্ষুণি সঙ্গীত হইবে।

সন্ন্যাসীঠাকুর সাধকের সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সাধক বলিলেন,—ও আমার ভক্ত-শ্রোতা, মাঝে মাঝে আবার দু এক জনকে সঙ্গে করে এনে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। যাই বলুন ওরা কিন্তু বড় বুদ্ধিমান ও সমঝ্‌দার শ্রোতা। গানের মাঝখানে ফোঁস ফোঁসও করে না, নড়েও না, চলেও যায় না। অর্থাৎ কোনরূপ ধ্যানের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

সন্ন্যাসীঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তাহলে এরা আমাদের চেয়েও ভাল শ্রোতা বলুন ?

সাধক বলিলেন,—সে বিচার ত আপনাদেরই উপর।

সন্ন্যাসীঠাকুর অত্যন্ত ভাবযুক্ত হইয়া বলিলেন,—সত্যই আপনার

মত সুর-সাধক ভারতে আরও অনেক জন্মগ্রহণ করুণ এবং তাঁদের দ্বারা সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় সঙ্গীতের এইরূপ আধ্যাত্মিক রূপ শক্তি, প্রভাব ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়ে মানুষকে যথার্থভাবে সঙ্গীতের মহিমায় মুগ্ধ করুক, ধন্য করুক এই প্রার্থনাই আজ ভগবৎ চরণে জানাই। আজকে আমার আসার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল, একটির সাধ আজকার মত পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়টির বিষয় জানবার জন্যে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। সেটি হচ্চে এই, মঠের এক সাধুর কাছে জানতে পারলেম যে, কাল তাঁকে দিয়ে সহর থেকে একটি ছোট তম্বুরা আনিয়েছেন। কার জন্যে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছু বলতে পারলেন না। মনে মনে আমি কোনও হদিস্ খুজে পেলেম না, হঠাৎ এস্থলে কার প্রয়োজনে তম্বুরা আসতে পারে! তাই আপনার কাছে জানতে আমার মনের মধ্যে একটু ঔৎসুক্য এসে গেছে। ব্যাপারটা বলতে কোন আপত্তি আছে কি?

সাধক কহিলেন,—না, না কিছু মাত্র নেই, আমি এক্ষুনি আপনাকে সমস্ত কথা বলতেম। এই বলিয়া সাধক আদরীর বিষয় সমস্ত যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—শক্তিরূপার প্রভাবে আপনার মহাশক্তি লাভ হ'ক এই কামনা করি। যে বস্তু জয় করলে তবে সঙ্গীতে সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে ভগবান আপনার নিকট এই পরম বস্তু প্রেরণ করেছেন। আপনার উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করুক এবং আপনি জয়ী হ'ন পুনর্ব্বার তাঁর চরণে এই প্রার্থনা জানাই।

সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—আপনার আশীর্ব্বাদ যেন আমার পরম সম্বল হয়। সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন,—রাত্রি হয়ে এ'ল, আজকার মত উঠি, এর পর যেদিন আসব, সেদিন আপনার

সাধিকার সহিত পরিচিত হ'ব এবং তার কণ্ঠের গীত শ্রবণ ক'রব। এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাধকের স্কন্ধে পরম প্রীতি ভরে হস্তরক্ষা করিলেন।

সন্ন্যাসীঠাকুর গমনোদ্যত হইলে, সাধক তম্বুরাটি যত্নপূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপনান্তর তাঁহার সঙ্গে নদী অতিক্রম করিয়া আরও কিছু পথ পৌছাইয়া দিয়া বিদায় সম্ভাষণ গ্রহণ করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সাধকজী সাধনার পীঠস্থান হইতে তম্বুরাটি মস্তকে ঠেকাইয়া দুই হস্তে ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কুটিরাভিমুখে গমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন দুইটি অদৃশ্য হস্ত তুলসীবৃক্ষের তলদেশে ক্ষুদ্র তৈল প্রদীপটি এবং কাঁচ ঘেরা তৈলের বৃহৎ প্রদীপটি জ্বালাইয়া কুটিরের দাওয়ায় রাখিয়া গিয়াছে।

সাধক নির্দ্দিষ্ট স্থানে তম্বুরাটি রাখিয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক কল্যাণ রাগে সন্ধ্যা বন্দনা "ওঁ সন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ…" ইত্যাদি বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তিনি নিয়মিত ভাবে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সন্ধ্যা ও গায়ত্রী সময়োপযোগী রাগে পাঠ করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দীক্ষারম্ভের পূর্ব্ব রাত্রিটি আদরীর ভাল নিদ্রা হইল না। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে এবং প্রভাত হইলে সঙ্গীতে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, এই আগ্রহ ও আনন্দ তাহার মনকে অস্থির করিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে বাহির হইয়া আকাশের উপর শুক্রতারকার উদয়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতে লাগিল। রাত্রি যে এত দীর্ঘ হয়, তাহা তাহার জীবনে ধারণা ছিল না। আজ তাহার কাছে রাত্রি যেন কাটিতে চাহে না। এইরূপ অস্থিরতার মধ্যে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকের আকাশে শুভ্রালোকের আভাস দৃষ্টি গোচর হইল। তখন সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া একখানি ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া সেইদিকে উপবেশন পূর্ব্বক জোড় হস্ত বক্ষের উপর রাখিয়া মনে মনে সর্ব্বপাপঘ্ন শ্রীসূর্য্য দেবের ও ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও প্রণতি জানাইয়া এই রকম ভাবে কিছুক্ষণ সজল নয়নে প্রার্থনায় আকুলভাবে বলিতে লাগিল হে ভগবান! তোমরা আজ আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমি যে পরমাকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান লাভের জন্য গুরুর কৃপা পাব তা যেন আমার জীবনে সফলতা দান করে এবং নিষ্ঠা, গুরু ভক্তি ও সাধনায় একাগ্রতা যেন তোমাদের আশীর্ব্বাদে অমর ও অটুট থাকে। এইরূপ পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাইয়া যখন সে দণ্ডায়মান হইল তখন সূর্য্য দেবের রক্তিম কিরণচ্ছটায় ধরা অলক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া পরম শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সময় তাহার পিতা-মাতা বাহিরে আসিবামাত্র আদরী তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে লইল। তাহারা পূর্ব্বাহ্নে সমস্তই জানিয়া রাখিয়াছিল। আদরীকে ক্রোড়ে টানিয়া মস্তকে মুখরক্ষা

করিয়া পরম স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল,—মা তুমি যে সাক্ষাৎ দেবতার কৃপা পেয়েছ তাতে তোমার সঙ্গে আমারও মহা ভাগ্যবান। এই দেবতুল্য গুরুকে পরম গুরুরূপে মনে সর্ব্বদা ধ্যান রাখবে, তাঁর আদেশ প্রাণপণে নিষ্ঠাপূর্ব্বক পালন করবে, ভক্তি অচলা রাখবে ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ দেবদেবীর কাছে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আদরীর মনের মধ্যে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় হইল। সানন্দে পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নানান্তে সূর্য্যদেবের স্তব এবং সমস্ত দেব-দেবীকে প্রণাম জানাইয়া নানান্ স্থান হইতে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে যখন সে বুঝিল তাহার দীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে তখন সে পল্লীর বয়ঃজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করিয়া আসিয়া একটি প্রস্তর পাত্রে কয়েকটি সুপক্ক আতা ফল, এক ছড়া কদলী, একটি হরীতকী ও একটি যজ্ঞোপবীত রক্ষা করিয়া উহাকে বাম হস্তে স্কন্ধোপরি স্থাপন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে পুষ্পসম্ভারযুক্ত সাজিটিকে লইয়া সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। যাত্রাকালীন গৈরিক বসন পরিহিতা সুন্দর মূর্ত্তি খানি দেখিয়া মনে হইল যেন ঋষিকন্যা দেবতার পূজায় যাইতেছেন। এমনি এক অপূর্ব্ব ভক্তি যুক্ত ভাব ও মুগ্ধকর শোভার সৃষ্টি করিয়া আদরী সাধকের কুটিরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

সাধকও ঠিক সময়ে স্নানান্তে প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী তাঁহার সঙ্গীত গুরুর প্রতিকৃতিতে পূজা ও একখানি ধ্রুপদগানের অঞ্জলি প্রদান করিয়া এবং আদরীর জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া বাহিরের দাওয়ায় সবে মাত্র বসিয়াছিলেন, এমন সময় কুটিরসম্মুখে আদরীর তদবস্থার অপরূপ নিষ্ঠাময় মূর্ত্তিখানি দেখিয়া ভাবে ও শ্রদ্ধায় সাধকের মন রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আদরীকে স্নেহসম্ভাষণে

সহাস্তে আহ্বান করিলেন। সচরাচর দীক্ষায় যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তাহার প্রায় সবগুলি আদরীকে আনিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—আদরিণি! আমি ত তোমাকে দীক্ষার প্রয়োজনে কোন দ্রব্যাদি আনতে বলিনি; দীক্ষায় যে এ সকল জিনিষের প্রয়োজন হয় একথা তোমাকে কে বল্ল? আমি জানি যে, তোমার জন্তে দীক্ষায় কোন দ্রব্যাদিরই প্রয়োজন হ'বে না। সমস্ত প্রয়োজনই তোমার অন্তরের মধ্যে সমাধা হয়ে গেছে; কেবল সাধনার সন্ধানগুলি আমাকে দিয়ে বাত্‌লে দেবার জন্যেই বোধ হয় ভগবান এই স্থানটি আমার জন্য নির্ব্বাচিত করে রেখেছিলেন। যাই হ'ক, এসব জিনিষ যে দীক্ষায় প্রয়োজনীয়, এ উপদেশ তোমাকে কে দিল?

আদরী উত্তরে সবিনয়ে বলিল,—প্রভু! আমাকে কেউ বলে দেয়নি, অন্তর আমাকে বলে দিয়েছে। আমি যেন শুনতে পেলাম, আমার অন্ত-রাত্মা বল্লেন, যেভাবে দেবতার মূর্ত্তি পূজায় যৎসামান্য ফুল ফলাদির প্রয়োজন হয় সেইরূপ সেই দ্রব্যগুলি তা যতই সামান্য হ'ক স্থুরব্রহ্মের পূজায় গুরুর উদ্দেশ্যে তাঁর চরণে প্রদান করতে হয়। কিন্তু প্রভু! আমাদের কিইবা আছে! আমরা অতি দীন, মূর্খ ও জ্ঞানহীন জংলী জাতি। পূজার মত সামগ্রী এত কিছুই নয়! আপনার মহত্ত্বগুণে এই অতি দীনার অকিঞ্চিৎকর শ্রদ্ধার্ঘ্য আপনি গ্রহণ করবেন এই ভরসায় এগুলি আনতে সাহস করেছি। এই বলিয়া আদরী ভক্তি গদ গদ চিত্তে সাধকের সন্নিকটে পুষ্প ও ফলের পাত্র দুইটি রাখিয়া প্রণাম করিল।

আদরীর এবম্প্রকার নিষ্ঠা, ভক্তির ও জ্ঞানের কথা শুনিয়া সাধক অতিশয় চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বহুবিধ জ্ঞান ও ভক্তিমূলক গ্রন্থ পাঠের ফল যথার্থই ফলিয়াছে। অতি আনন্দের সহিত সহাস্তে সাধক কহিলেন,—আদরিণি! আজ তোমার কর্ত্তব্যসূচক

বাক্যগুলি আমাকে অতিশয় মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট করেছে। এস এইবার এই আসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন কর, আমি তোমার তম্বুরাটি আনয়ন করি। এই বলিয়া সাধক তম্বুরাটি আনয়ন করিতে উঠিলেন। আদরী আসনের একপ্রান্তে জোড় হস্তে উপবেশন করিয়া রহিল। সাধক তম্বুরাটি আনয়নপূর্ব্বক আদরীর সম্মুখে রক্ষা করিলেন। পরে নিজে উত্তর মুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং প্রথমে আচমন মন্ত্র পাঠ করিয়া, আসন শুদ্ধি, ভূত শুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি সমাধা করিয়া তম্বুরার উপর গণেশাদিপঞ্চদেবতার পূজা এবং সপ্তস্বরের, রাগাদির, শ্রুতিসমূহের, তালাদিবাদ্যের, বীণাদিযন্ত্রের, সপ্তস্বরের অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবিগণের যথা ষড়জের—অগ্নি, ঋষভের—ব্রহ্মা, গান্ধারের—সরস্বতী, মধ্যমের—মহাদেব, পঞ্চমের—বিষ্ণু, ধৈবতের—গণেশ এবং নিষাদের—সূর্য্য, এই সমস্ত দেবতাদের এবং সঙ্গীত সৃষ্টিকর্ত্তা মহাদেবের পঞ্চশিষ্য যথা—ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু, ও তম্বুর মুনিদের ও গন্ধর্ব্বাদি দেবতাদের পূজা করিয়া নিজ গুরুর পূজা সমাপন করিলেন।

তৎপরে আদরীর হস্তে জল প্রদান করিয়া আচমন মন্ত্র পাঠ করাইয়া প্রথমতঃ গুরুর উদ্দেশ্যে তম্বুরার উপর পূজা সমাপনপূর্ব্বক শেষে অনুরূপভাবে সমস্ত দেব-দেবী ইত্যাদির পূজা করাইলেন। ইহার পর তম্বুরার উপর পুষ্প সকল সরাইয়া দিয়া আদরীকে বলিলেন,—সুর ব্রহ্মঝঙ্কৃত এই পরম দেবযন্ত্রটিকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রহণ কর, আমি তোমাকে উহার উপর অঙ্গুলি সঞ্চালনের নিয়ম দেখিয়ে দিলে পর আমার কণ্ঠের প্রত্যেকটি স্বরোৎপাদনের নিয়মে তুমি তোমার কণ্ঠে সেই স্বর উচ্চারণ করবে। প্রথমতঃ আমি ষড়জ স্বর উৎপন্ন কচ্চি, তুমি উচ্চারণের পূর্ব্বে অগ্নির মূর্ত্তি ধ্যান করবে। এ রকম ভাবে সা, রে, গা, মা, পা,

ধা, নি এই সাতটি সুরের প্রত্যেকটির অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবি-গণের নাম করব, তুমি সেই সেই মূর্ত্তি ধ্যান করে স্বর উচ্চারণ করবে। আদরী সেইরূপ ভাবে আদেশ পালন করিল। সাধক বলিলেন,—এরপর তুমি নিজ কণ্ঠে এককভাবে ঐগুলি যথাযথ উচ্চারণ কর।

আদরী অতি সুমধুরভাবে স্বরগুলি প্রকাশ করিল। তাহার পর সাধক, ঐ সমস্ত দেবতা মুনি ও যন্ত্রাদি এবং গুরুকে প্রণাম করাইয়া বলিলেন, তোমার প্রদত্ত দ্রব্যাদি আমার হস্তে প্রদান কর। আদরী ভক্তিভরে তাহা পালন করিয়া অঞ্চল প্রান্তের গ্রন্থিটি খুলিয়া একটী বহুকালের রৌপ্য মুদ্রা সাধকগুরুর চরণ তলে প্রদানপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ঐ মুদ্রাটী আদরী জন্মাইবার পর, মুখে অন্ন প্রদানের দিনে তাহার পিতামহী তাহাকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। এতদিন ধরিয়া পরম যত্ন সহকারে পিতামহীর নিদর্শন স্বরূপ রক্ষিত সেই মুদ্রা লক্ষীটী আজ আদরীকে সার্থকতা প্রদান করিল। সাধক উহা পুলকিত চিত্তে গ্রহণ করিয়া পরম স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—তোমার ভক্তি প্রদত্ত এই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণাটী আজ আমার জীবনে প্রথম ভাগ্য-লক্ষীর আগমন সূচনা করিল। চিরকাল এটী আমার যত্ন ও আদরের বস্তু হয়ে থাক্‌বে।

এই বলিয়া তিনি মুদ্রাটীকে মস্তকে ঠেকাইয়া গুরুদেবের প্রতিকৃতির চরণ তলে স্থাপনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আসিলেন। এই ভাবে দীক্ষার সকল কার্য্য সমাধার পর আদরীর হস্তে দুই একটী ফল ও কিঞ্চিৎ গুড় প্রদান করিয়া বলিলেন,—এগুলি খেয়ে নিয়ে জল পান কর, আমিও কিছু খেয়ে নিই। মুখ প্রক্ষালনাদির পর উভয়ের মধ্যে সঙ্গীত সাধনার নিয়ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিল। সাধক বলিলেন,—উপস্থিত প্রত্যহ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে, দিবা এক প্রহরের পর, বৈকালে ও রাত্রিকালে এই চারবার

এক ঘণ্টা করে' সাধবে। প্রথমবারের সাধনায় ষড়জ স্বরটিকে বারবার বহুক্ষণ যাবৎ দম্‌রক্ষা করে সাধবে, তারপর উদারা সপ্তক অনেকবার সেধে নিয়ে মুদারা সপ্তক সাধবে কেবল মাত্র স্বরোচ্চারণের দ্বারা। অন্তবারের সময় স্বরোচ্চারণ ও 'আ' অক্ষর দ্বারা সাধবে এবং রাত্রের সাধনার সময় তারা সপ্তকের স্বর কতকগুলি অক্লেশে উচ্চারণমত গাইবে। প্রত্যহ এই সময়ে শিক্ষা নিয়ে যাবে। আজই তোমাকে তম্বুরা বাঁধবার নিয়মটি দেখিয়ে দিই। যদিও একে বাঁধবার ক্ষমতা অনেক দিন শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা সুর বোধ হলে পর জন্মায় সত্য, তবে স্বভাব জাত সুর বোধ থাকলে শিখেনিতে দেরি হয় না। তোমার পক্ষেও তাই হবে। এই বলিয়া সাধক সুর বাঁধিবার নিয়ম দেখাইয়া দেওয়া মাত্র আদরী নিজ কণ্ঠের ওজনে তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া ফেলিল। তৎদৃষ্টে সাধক মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আদরীর বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন।

আদরী সাধকের মধ্যাহ্নকালীন রন্ধনাদির সময় হইয়া আসিল বুঝিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিয়া তম্বুরা হস্তে সেই দিনের মত বিদায় লইবার জন্য দণ্ডায়মানা হইল।

সাধক বলিলেন,—একটু অপেক্ষা কর, আমার গুরুদেবের চরণতলের পূজার পুষ্প এনে দিচ্ছি। এই বলিয়া কুটির মধ্য হইতে পূজার পুষ্প আদরীর হস্তে প্রদান করিলেন। আদরী তাহা ভক্তিভরে মস্তকে ঠেকাইল এবং অঞ্চলে বাঁধিয়া হৃদয়ের উপর রক্ষা করিল। সাধক সিঁড়ির নীচে নামিলেন, আদরী ধীর পদবিক্ষেপে পরম হৃষ্ট চিত্তে গৃহের দিকে রওনা হইল। সাধক ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইয়া স্নেহবিগলিত চিত্তে একদৃষ্টে গমনের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসীঠাকুর একদিন কার্য্যোপলক্ষে নিকটস্থ সহরের দিকে মধ্যাহ্নের ট্রেনে রওনা হইলেন। মঠ হইতে তাঁহাদের ষ্টেশনটি বিশেষ দূরে নয়। ষ্টেশনটি খুব ছোট্ট। তাই বেশী ট্রেন সেখানে থামে না। যাত্রীদের যাইবার ও আসিবার জন্য মাত্র দুইটি ট্রেন থামে।

সহরটি খুব বেশী দূরে নয় বলিয়া বেলা তিনটা নাগাইদ সন্ন্যাসীজী তথায় পৌছিয়া গেলেন এবং তৎসন্নিকটের দুই একটি গ্রামের সেবা কার্য্যের জন্য গমন করিলেন। গরীব দুঃখীদের খোঁজ খবর লইয়া ও তাহাদের অভাব অভিযোগের যথাযথ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়া পুনশ্চ সহরের দিকে রওনা হইলেন। তথায় পৌছিয়া সেখানকার কিছু কার্য্য সমাধা করিয়া লইবার জন্য এবং তাঁহার সেস্থানের জমীদার বন্ধুটি মহানগরী হইতে সম্প্রতি ফিরিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সহরাভিমুখে গমন করিলেন। হঠাৎ অন্ধকারের আবছায়ায় তাঁহার দৃষ্টি পড়িল চতুর্দ্দিকে বড় বড় পৃষ্ঠায় লিখিত বিজ্ঞাপনের দিকে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে "শ্রীদুর্গা সিনেমা গৃহে তিন দিন ব্যাপী নিখিল-ভারত-সঙ্গীতসম্মেলন হইবে। সমগ্র ভারতের বড় বড় শিল্পিগণের সমাবেশ। অভাবনীয় ব্যাপার। পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন, বিলম্বে হতাশ হইবেন। টিকিটের মূল্য যথাক্রমে ১০৲ টাকা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য, ইত্যাদি।"

সন্ন্যাসীমহারাজ অধিকতর বিস্ময় বোধ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এই মনে করিয়া যে, "এই সামান্য সহরে, নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন

হইতেছে, বড়ই অবাক্ কাণ্ড ত ? ইহার সংবাদ ত আমি কিছু জানিতাম না ! যাহাই হউক দেখা যাউক ব্যাপারটা কি ! আমার গন্তব্য পথের উপরই যখন সেই সিনেমাগৃহ তখন ব্যবস্থা ও অবস্থাটা বুঝিয়া লইতে বোধ হয় অসুবিধা হইবে না।" চলিতে চলিতে তিনি এই কথাটাই কেবল মনে মনে করিতে লাগিলেন যে,"সামান্য সিনেমা গৃহে নিখিলভারতসঙ্গীত-সম্মেলনের মত বিরাট জন সমাবেশের সেখানে স্থান সঙ্কুলান কি করিয়া হইবে ?" এই সকল চিন্তা ব্যতিরেকে আরও একটা দিক দিয়াও তাঁহার মনে পীড়া দিতে লাগিল এই ভাবিয়া যে, সঙ্গীতের মত উচ্চ সম্মানজনক বস্তুর সম্মেলনের জন্য একটা অযোগ্য সিনেমা গৃহকেই বা স্থানীয় ব্যক্তিরা কেন নির্ব্বাচিত করিলেন। কারণ তিনি দেখিয়াছেন, পূর্ব্বে যখন কয়েকবার পশ্চিমে "নিখিল-ভারত-সঙ্গীতসম্মেলন" হইয়াছিল, তখন তিনি যে যে গুলিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই সেই গুলিতে অন্যান্য বিষয়ের নিখিল ভারত সম্মেলনের মত করিয়াই বিরাট প্যাণ্ডেলের মধ্যে মহাসমারোহে যথার্থ ভাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই রকম নানান্ চিন্তাযুক্ত হইয়া সিনেমার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, গাড়ী, ঘোড়া, সাইকেল-রিক্সা করিয়া এবং পদব্রজে লোক জন আসিতে সুরু করিয়াছে। এমন সময়ে তাঁহার প্রতি একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি সন্ন্যাসীজীর হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—"এই যে মহারাজজী কখন এলেন ? মঠের সব কুশল ত ? আপনার কথা আমি স্মরণ কচ্ছিলেম, চলুন উপরের ঐ কক্ষে গিয়ে বসা যাক্।" এই বলিয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে সেই কক্ষে লইয়া গিয়া চেয়ারে বসাইলেন এবং বেয়ারাকে দিয়া সন্ন্যাসীজীর জন্য চা ও জলখাবার আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—এ কি ব্যাপার বলুন ত ? আমি হকচকিয়ে

গেছি, এই সামান্য সহরে হঠাৎ এত বড় ব্যাপার হচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গও জানতেম না। সে যা হ'ক শুধু তাই নয়, এই ছোট্ট সিনেমা গৃহে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের মত বিরাট কাণ্ড যে কি ভাবে সম্ভব হ'তে পারে, এ ধারণা আমার এখনও আসছে না। এজন্য বড়ই কৌতূহলী হয়ে পড়েছি; সমস্ত ব্যাপারটা আপনি আমাকে সংক্ষেপে একটু দয়া করে বলুন।

ভদ্রমহোদয় উত্তরে কহিলেন,—আপনি দেখছি বড়ই ভাবনায় পড়েছেন। সমস্তই আপনাকে বল্‌ছি, আগে আপনি একটু জলযোগ করে নিন। এমন সময় বেয়ারা চা ও জলখাবার লইয়া সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিলে পর সন্ন্যাসীজীকে অনুরোধ করিলেন উহা গ্রহণ করিবার জন্য।

এই ভদ্রলোকটি বিগত মহাযুদ্ধের শুভক্ষণে ব্যবসাতে বেশ ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপালাভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য এখন তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। যে কোন সভা, সমিতি, ক্রিয়া কর্ম্মে তাঁহার যোগাযোগ সর্ব্বত্রই। 'সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কৃতকর্ম্মফলের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এখন নানান্ বিষয়ে কিছু কিছু দান করেন এবং এইভাবে কিছুটা ভারসাম্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া চলেন। নাম ডাকের খুব প্রয়াসী, তবে নিজের স্বার্থের ক্ষতি করিয়া নয়। বাল্যকাল হইতে ইনি একজন সঙ্গীতেরও ভক্ত। ইনি মহানগরীতে সঙ্গীতের বড় বড় আসরে প্রায়ই উপস্থিত থকেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ সকল আসরের কর্ম্ম-কর্ত্তাদেরও বেশ সখ্য স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। এইজন্য ঐ সকল স্থানে ইঁহাকে বেশ একজন মাতব্বর বলিয়া মনে হয়। বাহ্যিক পরিচয় মোটামুটি ইঁহার এইরূপ। সন্ন্যাসীঠাকুরের সঙ্গে ইঁহার অনেক দিনের আলাপ।

ভদ্রব্যক্তি সন্ন্যাসীজীকে বলিলেন,—আপনি আমাদের এই সম্মেলনের ব্যবস্থাকে অসম্ভব কেন মনে করলেন, তা বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছি না। মহানগরীতে বছর বছর অনেকগুলি করে যেমন ভাবে "নিখিল ভারত ও প্রাদেশিক সঙ্গীত সম্মেলন" হয়, তেমনি ভাবে আমরা সেই সকল অনুষ্ঠাতা মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই ত এই সম্মেলন কচ্ছি! আমাদের ত্রুটী তাহ'লে কিসের! কেবল মাত্র তফাৎ এই যে, এখানের সিনেমা গৃহটি সেখানের অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট, কিন্তু আমাদের এই সহরও ত অনেক ছোট; কাজেই লোকের স্থান সঙ্কুলান এতেই হ'য়ে যাবে ব'লে আমরা বেশী করেই ভরসা রাখি। এই ক্ষুদ্র সহরে আমরা যে "নিখিলভারতসঙ্গীতসম্মেলন" আরম্ভ করতে পারলেম তার জন্যে আমাদের আপনি ধন্যবাদ দিবেন মনে করি। আপনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন ব্যক্তি, তাই এই সম্মেলন করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আপনাকে ঘরোয়া ভাবেই জানাচ্ছি;—এখন ব্যবসায়ের বাজার বড়ই মন্দা, তাই ভেবে দেখলেম মহানগরীর মত "নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন" করতে পারলে সব দিকেই সুবিধে হ'বে, এবং দুচারটা দিন গান শোনারও আনন্দ উপভোগ করা যাবে।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—তাহলে বলুন "নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন" এটাকে বলা চলে না।

ভদ্রলোক উত্তরে বলিলেন,—তা কেন বলা চলবে না? বাইরের জনকয়েক খ্যাত অখ্যাত গাইয়ে বাজিয়ে ও দু একজন নর্ত্তক ও নর্ত্তকীকে এনে এবং অনুষ্ঠাতাদের খুসীমত স্থানীয় জনকয়েক শিল্পীদের নিয়েই ত এই ক বছর ধরে মহানগরীতে "নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সংবাদ কি আপনার জানা নেই?

সন্ন্যাসীজী কহিলেন,—আজ্ঞে না। তাহার পর অত্যন্ত বিস্মিত ও

বেদনাহত চিত্তে বলিলেন,—গানের সাধারণ অনুসাকে যে এরকম ভাবে "নিখিল ভারত" নাম দেওয়া যেতে পারে এ ধারণা আমার কল্পনাতীত ছিল। দেখেছি,—পূর্ব্বে যখন কয়েকবার পশ্চিমের বড় বড় স্থানে "নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন" হ'য়ে ছিল, তখন সেই সকল বিরাট অনুষ্ঠান-গুলিকে পরিচালিত করবার জন্যে প্রত্যেক প্রদেশের সঙ্গীতবোদ্ধা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল। সেই সমিতির সভ্যেরাই তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত গুণীদের উপস্থিত হবার জন্যে নির্ব্বাচনপূর্ব্বক যথোচিত ব্যবস্থা করতেন এবং সেই সকল গুণী ব্যক্তিদের মধ্য হতে কয়েকজনকে সম্মেলনের উপদেষ্টা সমিতির সভ্যরূপেও গ্রহণ করতেন। তখন ঐরূপ যথোচিত ব্যবস্থার জন্যে দেশের রাজা, মহারাজা ও জমীদার শ্রেণীর ধনী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় ও আগ্রহ সহকারে পৃষ্ঠপোষকতা করে অনেকেই উপস্থিত থেকে সম্মেলনের গৌরব দান করতেন। তখন দেখা গেছে সঙ্গীতজ্ঞরাও যথার্থ কর্ত্তব্যবোধ ও দায়িত্বের কথা স্মরণ রেখে সকলে নানারূপ কষ্ট ও অসুবিধাকে গ্রাহ্য না করে এবং অর্থের প্রত্যাশা না করে পরস্পর একত্র মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও নিজেদের মধ্যে বিদ্যা ও সাধনার পরিচয় প্রদানের আগ্রহ নিয়ে দেশাত্ম-বোধে ও দেশের কল্যাণের জন্যে উপস্থিত হতেন, এবং পুনশ্চ সম্মেলনে উপস্থিত হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁরা পরের বারের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকতেন। সেই সকল সম্মেলনে দেখেছি, সম্মেলনের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য যথা, সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা, রাগাদির বিবরণ ও তাদের রূপ ইত্যাদি বিষয়ের নিরূপণ, দেশে সুশিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রভৃতির আলোচনা ও বিতর্ক অধিবেশনে হ'ত। এমন কি অধিবেশনের সময় ব্যতিরেকে কর্ম্মকর্ত্তা সঙ্গীতগুণিগণ বিশিষ্ট বিশিষ্ট সঙ্গীত গুণীদের সঙ্গে ঐ সকল বিষয় ঘরওয়া ভাবেও আলোচনা

করতেন ; যদিও তখন তাঁদের প্রাথমিক প্রচেষ্টার দরুণ ঐ সকল বিষয়ের সম্পূর্ণ স্থিরসিদ্ধান্তে তাঁরা আসতে পারেন নি। কিন্তু বর্ত্তমানে ওই সকল প্রধান উদ্দেশ্যমূলক বিষয়গুলির যথাযথভাবে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত ও সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণালী ও সমগ্র দেশের মধ্যে একটি মাত্র বিশুদ্ধ পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার মানকে খাড়া করা দরকার। নানান রকম জটিলতা ও বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলির সমাধানান্তর তাদের যথার্থ রূপদান করবার বাসনা নিয়ে সম্মেলন করতে পারলে তবেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যথার্থ সঙ্গীত সম্মেলন করা হবে। আর সম্মেলনের নামে যদি জলসা হ'তে থাকে তাহলে গভীর পরিতাপের সহিত বলছি এর দ্বারা সঙ্গীতের ও সঙ্গীতজ্ঞদের কখনই মঙ্গল হবে না। আমি মনে করি, যদি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে যথাযথ ভাবে নিখিল ভারত বা প্রাদেশিক সঙ্গীত সম্মেলন হয় তাহলে শিল্পীরা নিশ্চয়ই দেশের ও সঙ্গীতের সর্ব্ববিধ কল্যাণ বুঝে এগিয়ে আসবেন সর্ব্বরকমে সাহায্য করবার জন্যে। তাই বলছিলেম, নিখিল ভারতের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হ'লে নিখিল ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতা এবং একে সুসম্পন্ন করবার জন্যে তাঁদের সাহায্য না পেলে, কোন সম্মেলনকেই নিখিল ভারত নাম দেওয়া যেতে পারে না। একথা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই জানেন বলে মনে করি।

ভদ্রলোকটি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—সত্যি বলছি সম্মেলন সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ ধারণা আমাদের কিছুমাত্র ছিল না। আমরা মনে করতেম, মহানগরীর মত বিশিষ্ট স্থানের ব্যক্তিরা যে ভাবে "নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন" করছেন সেইরূপ সম্মেলনকেই বুঝি যথার্থ নিয়মে হওয়া বলে ; কিন্তু আপনার কাছে আজ সমস্ত শুনে খুব লজ্জা পাচ্ছি। বাস্তবিকই প্রকৃত নিয়মকে মান্য না করে তার মর্য্যাদা নষ্ট করার মত ত্রুটি ও অন্যায় কিছু

নেই। যাই হ'ক এবারকার মত যা হবার হয়ে গেল, যদি আবার আমরা কখনও এরূপ আসর করি তা'হলে তাকে "গানের আসর" নাম দেবো। এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি নানান ধরণের গান বাজনার ব্যবস্থা করে সঙ্গীতের সোর্‌গোল্ করাটাই যখন উদ্দেশ্য তখন সেই সোর্‌গোল্‌কে জল্‌সা ও আসর নাম দিয়ে করলে সবরকম মনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ না হবার কি কারণ থাকতে পারে! সেই ত নিখিল ভারত নাম দিয়ে যাঁরা আসছেন, আসর নাম দিয়েও সেই শিল্পীরা এসে সঙ্গীত পরিবেশন করে যাবেন। বিশেষতঃ আমাদের মত এই সব ছোট সহরে ছোট নাম দিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে কোনরূপ আটক হবে না। সুতরাং আপনি এবারকার মত আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করুন।

সন্ন্যাসীমহারাজ কহিলেন,—দেখুন মার্জ্জনা করবার অধিকার ও ব্যক্তিত্ব আমার নেই। আমি কেবলমাত্র সঙ্গীতের একজন অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ও ভক্তিমান ব্যক্তির মত বিচার বুদ্ধি নিয়ে এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার দরুণ নিতান্ত কর্ত্তব্যবোধে এই সকল অপ্রিয় সত্যকথা বলতে বাধ্য হলেম। এ সকল ত্রুটির মার্জ্জনা কোন ব্যক্তির কাছে চাইবার নয়। মার্জ্জনা যদি চাইতে হয়, তাহ'লে যাঁর কাছে সঙ্গীতের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের আছে সেই পরব্রহ্মের কাছেই ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি আজ সঙ্গীত প্রচারকদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই অভিজ্ঞতা লাভ করে বুঝলেম যে, এত বড় বস্তুকে নিয়ে তাঁরা নিজ স্বার্থের জন্যে কিংবা সাময়িক আনন্দ উপভোগের জন্যে এর যথার্থ মর্য্যাদার ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার স্থান থেকে সঙ্গীতকে নির্ব্বাসিত করতে বসেছেন। শিল্পীদের প্রতিভা অর্থের দ্বারা ক্রয় করে সাধারণের মনোরঞ্জনের উপযোগী করে' পরিবেশন করানর মধ্যে সঙ্গীতের প্রকৃত ভাবরূপ ও ধর্ম্ম রক্ষা পেতে পারে না। আমি মনে করি যে, শিল্পীরাও বিশেষভাবে

একথা অনুভব করেন। কারণ সঙ্গীতের যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম আছে, তার প্রাণ বস্তুকে চিন্‌তে গেলে মানুষের যে সাধনা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়, তা সাধারণের ভিতর হতে শুধু অর্থ নিয়ে দান করা যায় না। সুতরাং এই রকম অনুষ্ঠানকে সঙ্গীতের প্রাণ বস্তুকে নিয়ে সার্কাস খেলা দেখানর মতই বলা যেতে পারে।

কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন,—আপনি আজ যে সমস্ত কথা বল্‌লেন, সত্যই তার জীবন্ত ছবি আজ আমার চোখের সামনে ভাসছে। এখন মনে হচ্ছে, সম্মেলনের মধ্যে সত্যই আমরা সঙ্গীতের সার্কাস দেখি বা কুস্তির আখড়ায় কুস্তিগীর শিল্পীদের তানের যুদ্ধ ও প্যাঁচের এক ঘেয়েমি কেবল দেখতে থাকি। অধিকাংশ সাধারণ শ্রোতাদের অনভিজ্ঞতার দরুণই এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে ; তাঁরা তখনই মোহিত হয়ে উল্লাস প্রকাশ করেন ও হাততালি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানান, যখন শিল্পী রাগ-তালকে নিয়ে তবলা বাদকের সঙ্গে চৌদুনের হামান্-দিস্তায় তার রূপের হাড়্, মাস্ ও রক্তকে পিষে কিমা তৈরী করেন। আজকাল শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই এই সকল অনুষ্ঠানে প্রচুর টাকা পেয়ে সঙ্গীতের প্রলয়-রূপকে দেখানর উপরই ঝোঁক বেশী পড়ে গেছে—অধিকাংশ শ্রোতাদের ধৈর্য্যের স্বল্পতা অনুভব করে। তার উপর আবার এইসব কারণে সম্পূর্ণ ভয় শূন্য হয়ে বা ন্যায়, বিজ্ঞান ও বিধিগত ব্যাকরণকে তোয়াক্কা না করে আসরে এমন সব মাথা-মুণ্ডুহীন 'রূপখঞ্জনী', 'শুদ্ধীবিধানী', 'রীতিমর্দ্দিনী' ইত্যাদি নাম দিয়ে তাঁরা রাগ প্রকাশ করছেন যে তাকে গ্রহণ করবার মত বা শুনে আনন্দ ও তৃপ্তি পাবার মত কোন উপায় নেই। আজ আপনার কাছে উপদেশ ও যুক্তিমূলক কথা শুনে মনে হচ্ছে, বিরাট শ্রোতাবহুল আসরে সঙ্গীতের যথার্থ রূপ-রসের অপমৃত্যু ঘটছে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার মাঝখানে মহানগরী হইতে কর্ম্মকর্ত্তার একজন

বিশিষ্ট ধনী বন্ধু আসিয়া পড়িবামাত্র তাঁহাকে কর্ম্মকর্ত্তা বিশেষ আদরের সহিত বসাইলেন এবং সন্ন্যাসীমহারাজের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। আগন্তুক ব্যক্তিটিও একজন সঙ্গীতের ভক্ত ও নিরপেক্ষ শ্রোতা।

যাহাই হউক—পরিশেষে সন্ন্যাসীমহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা, এই সকল অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরাও ত বহিরাগত শিল্পীদের মতই সর্ব্ব বিষয়ে সম মর্য্যাদা ও অর্থাদি প্রাপ্ত হন? কারণ আপনার কথাবার্ত্তা শুনে এ সম্বন্ধেও আজ আমার মনে আশঙ্কার উদ্রেক হচ্ছে যে, বোধ হয় যথাযথ ব্যবহার তাঁরা পান না এবং এজন্যেই বোধ হয় অনেক গুণীও অনুপস্থিত থাকেন।

ইহার উত্তরে কর্ম্মকর্ত্তার বন্ধুটি বলিলেন,—দেখুন মহারাজজি! আপনার এই সাঙ্ঘাতিক প্রশ্নটা আমার এই কর্ম্মকর্ত্তা বন্ধুটির মুখ দিয়ে শুনে তাঁকে আর বেশী করে লজ্জা দেবেন না। আপনার আশঙ্কা ও ধারণা অমূলক নয়, এইটুকুই জেনে ও শুনে রাখুন; আশাকরি এর বেশী আপনার জানবার আবশ্যক করবে না।

সন্ন্যাসীজী কহিলেন,—আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বোধ হয় এ বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে খুবই উদাসীন ও যোগাযোগ বিহীন আছেন, নচেৎ এরূপ কখনও হ'তে পারত না। সঙ্গীতের মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকে এবং শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্‌দের যথোচিত মর্য্যাদা দানপূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে রক্ষা করার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য দেশের প্রধান ব্যক্তিদের ত আছেই তাছাড়া প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তৃপক্ষেরও এতে কম নেই; বরং তাঁদের দায়িত্ব সর্ব্বাধিক বলে মনে করি। আর একটা কথা, কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে তাকে এই যে জল্‌সায় পরিণত করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে এই প্রদেশের সঙ্গীতজ্ঞরাই বা কেন প্রতিবাদ করেন না? সঙ্গীতের সর্ব্ব বিষয়ের যথার্থ মর্য্যাদা ও নিজেদের সম্মান রক্ষা করে

দেশের সুনাম বৃদ্ধি করবার জন্যে তাঁদেরও ত বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে ?

কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন,—আপনি বেশ কথা বল্লেন ! এখানের সঙ্গীতজ্ঞরা পরস্পর কেউ কাউকে মানেন না ও গ্রাহ্য করেন না বলেই আমার বিশ্বাস। সবাই স্ব স্ব প্রধান হ'য়ে আছেন, কিন্তু যথার্থ মান ও মর্য্যাদার দিকে কারোরই লক্ষ্য আছে বলে আমার ধারণা হয় না। মান-মর্য্যাদা জিনিষটাকে রক্ষা এককের দ্বারা হয় না। সমষ্টিগত শক্তির দরকার। আজকাল লক্ষ্য করুন, চতুর্দ্দিকের সমস্ত বিষয় ও ক্ষেত্রেই সঙ্ঘশক্তি গঠিত হয়ে তাদের মধ্যে হতে প্রধান ও সহপ্রধান প্রভৃতি ব্যক্তি খাড়া করে' সমষ্টিগত ব্যক্তিরা তাঁদের নির্দ্দেশ ও আদেশ মত পরিচালিত হয়ে নিজেদের যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আর সঙ্গীত ব্যবসায়ীদের সমস্তই এর ঠিক উল্টো। দুঃখের কথা বলতে কি, গানের আসরে লক্ষ্য করেছি, স্থানীয় কোন বিশিষ্ট শিল্পী যখন সঙ্গীত পরিবেশন করেন তখন তাঁকে উৎসাহিত ও প্রশংসিত করা দূরে থাক্ বরং বহুল প্রচারিত শিল্পীদের অপেক্ষা তাঁর সুনাম কম হোক্ এই কামনাই অনেকের মনের মধ্যে দিয়ে মুখের ভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশ পায়। আজকাল দুর্ব্বলচিত্ত লোকের সংখ্যা বড়ই বেশী হয়ে পড়েছে, তাই যখন ঐরূপ কোন শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করেন তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই মাথা নাড়তে ও বাহবা দিতে বেশী করে দেখা যায়। অথচ সেই স্থানীয় শিল্পীটি শেষোক্ত শিল্পীদের অপেক্ষা কম ত নন্ই নিরপেক্ষ বিচারে অনেক বড়ই মনে হবে। এইরূপ মনের অপ্রসারতার দরুণ স্থানীয় বহু অনভিজ্ঞ শ্রোতা ও ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের গুণীদের উপর ভ্রান্ত ধারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর আর একটা প্রধান কি কারণ হয়েছে জানেন ? দেশের লোকের

আজকাল সঙ্গীতের উপর আগ্রহ বেড়ে যাওয়ার দরুণ এখন বহু সংখ্যক সঙ্গীত ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশেরই মূলধন অত্যন্ত কম। অথচ এঁরাই দলে ভারী। সাধনায়, বিদ্যায় এবং পারদর্শিতায় বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীদের ওঁরা শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে দেখেন না। জনসাধারণের কাছে নিজেদের ব্যবসা চালু রাখবার জন্যে এঁদের মধ্যে অনেকেই বহিরাগত শিল্পীদেরই সর্ব্ববিষয়ে বড় বলে প্রচার করতে থাকেন। অবশ্য আমাদের মত অনুষ্ঠাতাদেরও ওই দলে ফেলা যায়। আজ আমাদের জন্মভূমির দেশে যে সকল বিশিষ্ট শিল্পীরা কিছু নাম অর্জ্জন করেছেন, তা তাঁদের ভাগ্যলক্ষ্মী ও অদৃষ্টের কৃপায় বলতে হবে।

সন্ন্যাসীজী কহিলেন,—আচ্ছা তাহলে যে কয়জন বিশিষ্ট শিল্পী আছেন তাঁরা কেন নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হননি? তাহলে ত ক্ষুদ্রের দল এবং অন্যান্য দলসমূহ আপনা হতেই বশ্যতা স্বীকার করত?

কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন,—এ কথার ত অনেক আগেই একরকম উত্তর দিয়েছি যে, তা কি করে হবে? নিজেরা স্ব স্ব প্রধান ভাবলে ও তথাকথিত মর্য্যাদার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকলে কি তা সম্ভব হয়? বড় বড়দের মধ্যেও ওজনে কম বেশী আছে। কিন্তু কম ওজনের লোকেরা নিজেদের লঘুত্ব মনে মনে হয়ত স্বীকার করলেও খ্যাতি, মান ও ব্যবসায়ের জন্যে মুখে প্রকাশ করেন না এবং তা কারো কাছেই কোন প্রকারে স্বীকার করতে চান না। যথার্থ তর্কস্থলে ও যুক্তিতে যদি নিজে নাও পারেন তবু অন্ততঃ বাইরের কোন বড় ওস্তাদের সঙ্গে তুলনা দেখিয়ে দেশের প্রকৃত বড়দের কম ওজনের বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। কাজেই এঁরাই বা কোন্ মহত্বগুণে ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ হবেন বলুন? এর একমাত্র সমাধান হতে পারে, যদি কোন দিন দেশের কর্ণধারগণ

অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার দ্বারা শিল্পীদের সাধনা, জ্ঞান, বিদ্যা ও গুণপনার যথোপযুক্ত বিচার করে তাঁদের মান নির্ণয় করে দিতে পারেন, কিংবা যদি শিল্পীরা সঙ্গীতের যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে' সত্যই মনকে উন্নত করতে পারেন তা হ'লেও সমস্ত কিছুর সমাধান সেই মুহূর্ত্তেই হয়ে যাবে। এ চিন্তা শুধু আপনার, আমার একক নয় মহারাজজী। এর চিন্তা ও দায়িত্ব প্রধানতঃ মহানগরীর প্রধান ব্যক্তিদের, সঙ্গীতজ্ঞগুণীদের এবং প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাদের। আজ এই পর্য্যন্তই এই বিষয়ের আলোচনা স্থগিত থাক। এখন আমাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার সময় হয়ে এল। আপনাকে এই অনুষ্ঠান দেখবার জন্যে অনুরোধ করতে ভরসা পাচ্ছি না। কারণ আমি নিজেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি আপনার কাছে যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত কথা শুনে।

সন্ন্যাসীজী অতি দুঃখের সহিত বলিলেন,—সত্যই আপনাদের এই অনুষ্ঠান দেখবার মত আমার মনের অবস্থা আর নেই। এজন্যে কিছু মনে করবেন না। উৎসাহ নিয়ে দায়িত্বকে যথাযথ ভাবে পালন করুন সেই মঙ্গলময়কে সর্ব্বদা স্মরণ করে। আজ তাহলে আমি উঠি।

কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেন,—না না সে হতে পারে না, রাত্রি প্রায় ৮টা বাজে, এই রাত্রে আপনি আর কোথাও যাবেন না। আমি বাড়ীতে অনেকক্ষণ খবর পাঠিয়ে দিয়েছি আমার এই বন্ধু ও আপনি আমার ওখানে যৎকিঞ্চিত আহারাদি করবেন বলে। আর একটা কথা—অসুবিধা নিতান্ত না হলে আমার বৈঠকখানা গৃহে আপনার শয়নের বন্দোবস্ত করে দেবো। এই বলিয়া উভয়ের হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং নিজের মোটরে করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে সন্ন্যাসীজী সেই সঙ্গীত-সাধকের বিবরণী প্রদান করিলে পর উভয়ে অত্যন্ত বিস্মিত ও আগ্রহান্বিত হইলেন তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—তিনি এখন সাধনায় ব্রতী আছেন। লোক-জনের সমাগম বেশী পছন্দ করেন না এবং আমিও তা চাই না। তবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে তাঁর পরিচয় প্রদান করি মাত্র। বেশ, আপনাদের আমি সময় মত জানাব তাঁর কাছে আসবার জন্যে। আর একটা কথা, আজ আমার মনে একটা সঙ্কল্প এসে গেছে; মনে করছি কিছুদিন সেবা কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার আমার সহ-কর্ম্মীদের উপর দিয়ে সঙ্গীতের সেবা কার্য্য করব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে হয়ত আমাকে প্রথমতঃ মহানগরীতে যেতে হ'বে। কিন্তু আমি সেখানের বিশেষ কিছুই জানিনা, তাই আপনারা আমাকে একটু তখন সাহায্য করবেন আশা করি।

এই কথা শুনিয়া উভয়ে পরম উৎসাহের সহিত বলিলেন, আমরা আপনার অধীনস্থ হ'য়ে যথাসাধ্য আপনার আজ্ঞা পালন করব। আমাদের খুব আশা হচ্ছে, আপনার মত একাগ্রচিত্ত সাধু ও মহৎ ব্যক্তি এ কার্য্যে অগ্রসর হ'লে যথার্থ আদর্শযুক্ত সঙ্গীতের মঙ্গল সাধন হবে।

এই কথাবলা শেষ হইতেই তাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তার গৃহদ্বারে আসিয়া পড়িলেন এবং মোটর হইতে নামিয়া সকলে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

কয়েক মাসের মধ্যে সঙ্গীত শিক্ষায় ও সাধনায় আদরী বেশ অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়াছে। সঙ্গীতের দীক্ষার দিন হইতে সেও সাধকের মত গৈরিক বসন পরিধান এবং আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে সংযম রক্ষা করিয়া চলিতেছে। সাধক তাহাকে শীঘ্র কণ্ঠ তৈয়ারীর উপযোগী প্রথমতঃ বহু প্রকারের স্বরগ্রামের দ্বারা সাধন প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাহার পর প্রত্যেক রাগের সামান্য আলাপ এবং ধ্রুপদ অঙ্গের চৌতাল, ধামার, সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল ও তেওরা তালের গান এক একটি করিয়া শিখাইয়া পরে সেই সকল রাগের দুই তিনটি করিয়া খেয়াল গান শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। এই রকম বিধিসঙ্গতভাবে আদরী উপস্থিত প্রত্যেক প্রহরের তিন চারিটি করিয়া রাগ আয়ত্তে আনিতে পারিয়াছে। প্রত্যেক রাগের অতগুলি করিয়া ধ্রুপদ গান শিক্ষার দরুণ রাগের উপর যথার্থ বোধশক্তি অর্জ্জিত হইয়া তাহার বিরাটত্ব উপলব্ধি দ্বারা বহু প্রকারের বিচিত্র গঠন ভঙ্গীর সন্ধান এবং ছন্দরূপের লীলায়িত নৃত্যের স্বরূপ লাভ হইয়াছে। তাই ঐ সকল রাগের মূর্ত্তির উপর অঙ্কন দক্ষতা এখন খেয়ালে ও ধ্রুপদের মধ্যে নিজ সৃষ্টিশক্তিতে নব নব ভাবে প্রকাশিত হইতেছে এবং প্রকাশের মধ্যে নিবিড়ভাব থাকায় রচনাগুলি অতি সুন্দর ও সুমধুর লাগিতেছে। আদরীর এত শীঘ্র যে এই অধিকার লাভ হইল, কেবল প্রাণপন নিষ্ঠা, গুরুভক্তি ও একাগ্রচিত্তে প্রত্যেক দিন বহুবার করিয়া সাধনাই তাহার একমাত্র কারণ এবং তাহার সঙ্গে অবশ্য জন্মগত প্রতিভাও অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে। আদরী এখন সাধনার সময় বাড়াইয়া দিয়া

প্রত্যেক বার দুইঘণ্টার অধিক সময় প্রত্যহ চারিবার করিয়া নিয়মিত সাধনা করিতেছে।

একদিন আদরী নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোড়ী রাগের ধ্রুপদ অঙ্গের চৌতাল তালের একটি বিখ্যাত গান শিক্ষা করিতেছিল। গানটির কথা এইরূপ,—

"গুরুমত সোঁ নাদ গাওয়ে
তব পাওয়ে সরস্বতী কো প্রসাদ………।" ইত্যাদি।

কথার ভিতর মীড় ও সুরের বিন্যাসবহুল এই বিশেষ কঠিন গানটির স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ আদরী প্রায় কুড়ি মিনিটের মধ্যে পরিপাটিরূপে আয়ত্ত ও মুখস্থ করিয়া ফেলিল। সাধক তাহাকে সমস্ত গান মুখে মুখে শিক্ষা দেন, কোন গানই শিক্ষার পূর্ব্বে লিখিয়া দেন না। আদরী শিক্ষাকালে মুখস্থ করিয়া উহা সর্ব্বদা ধ্যান ও চিন্তার ভিতর মনের মধ্যে পাকাপোক্ত করিয়া লয়। পরে নিজে লিখিয়া লইয়া সাধকের কাছে ভুল ত্রুটি সংশোধন করাইয়া লয়। সাধকের গুরু এই রকমভাবেই তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং বলিয়া দিয়াছিলেন, গান মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া আয়ত্ত করিবার আগ্রহ না থাকিলে গানের ভাণ্ডারকে রক্ষা ও বিদ্যাকে পরিপূর্ণভাবে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে ধরিয়া রাখা যায় না। প্রকৃত গুণী হইতে হইলে সমস্ত রাগে দখল রাখিয়া প্রত্যেকটির অনেকগুলি করিয়া পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ গান মুখস্থ রাখিতে হইবে। সুতরাং শিক্ষার সময়ে যদি লিখিতভাবে তাহার উপর নির্ভর রাখিয়া শিক্ষা করা হয়, তাহা হইলে যথার্থ রূপকে এবং গানকে মনে রাখা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়িবে। যাহাই হউক, আজ আদরী এই বিশেষ কঠিন গানটি অতি শীঘ্র আয়ত্ত করিয়া লওয়ায় সাধক অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন,—তুমি আজ এই কঠিন গানটি যত শীঘ্র শিখে

নিতে পারলে. অত শীগ্‌গীর্‌ আমি পারি নাই। কেন পারবে না বল ! তোমরা যে হ'লে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীর জাত গোষ্ঠী।

আদরী সাধকের পায়ের ধুলা মস্তকে ঠেকাইয়া সবিনয়ে হাত যোড় করিয়া বলিল,—আমার নিজস্ব ক্ষমতায় কিছু শিখতে পারি এ ধারণা আমি মনেও স্থান দিই না। যা কিছু ক্ষমতা ও সামর্থ্য সে কেবল আপনার আশীর্ব্বাদ, দয়া, শিক্ষা দিবার অপূর্ব্ব দক্ষতা ও পদ্ধতির গুণে লাভ ক'রেছি। আপনি একেবারে এক কঙ্কর ও আবর্জ্জনাময় মৃত্তিকা নিয়ে গড়তে সুরু করেছেন। আধুনিক শিক্ষালাভে বিদ্যা, বুদ্ধি, মার্জ্জিতরুচি, সভ্যতা, ও বংশগত সংস্কার রূপ—ভাগীরথীর পবিত্র তীরমৃত্তিকার কোন অংশই এই দুর্ভাগা দেশ মৃত্তিকার মধ্যে নেই। সুতরাং এই মাটিকে পরিশোধিত করে গঠনের উপর যা কিছু কৃতিত্ব তার সমস্তটুকুই সেই অদম্য সাহস ও বিরাট শক্তির অধিকারী পরমপূজ্য মহানুভব শিল্পীরই প্রাপ্য।

শিষ্যার এই কথার উত্তরে সাধক প্রীতিপুলকযুক্ত হাস্যে কহিলেন,—তোমার উপমার দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে বলতে পারি যে, সেই গঙ্গার পূত-পবিত্র মৃত্তিকা এখন বর্ত্তমানের আবহাওয়ায় অনেকখানি দুষিত হয়ে পড়েছে। এ জন্যে প্রকৃত সাধক শিল্পীদের এখন সেই মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সেই মৃণ্ময় মূর্ত্তি চিণ্ময় করার বাসনা, ও প্রার্থনা কোনটাই পূর্ণ হতে চায় না, কিন্তু তোমার কথা নিয়েই বলছি, তোমাদের এই কঙ্করময় দেহ ও মনে এখন পর্য্যন্ত কোনরূপ খেয়াল, খুসী, উচ্ছৃঙ্খলতা ও আধুনিক শিক্ষার গর্ব্বরূপ আবর্জ্জনা প্রবেশ করতে পারেনি বলে এবং নিষ্ঠা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অটুট থাকায় এই মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত মূর্ত্তির মধ্যে, তার যথার্থ স্বরূপ ও উজ্জ্বল প্রাণবস্তুটি লুক্কাইত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে

আছে। তোমরা হয়ত তা উপলব্ধি করতে পার না; কিন্তু তোমাদের সান্নিধ্যে যারা সত্যিকারের অন্তর নিয়ে আসে তাদের বুঝতে দেরী হয় না।

সাধকের এই কথা সমাপ্ত হইবার পর সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের দৃষ্টি পড়িল বাউলবেশী একটি বৃদ্ধ বয়সের শুভ্র শ্মশ্রু-গুম্ফযুক্ত দীর্ঘকায় সুন্দর কান্তি-বিশিষ্ট মানুষের উপর। তিনি দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "সাধক বাবুজী আমি কি ভিতরে আসতে পারি?"

সাধক এই কথা শ্রবণমাত্র সেই লোকটির কাছে যাইয়া অতি সমাদরে ভিতরে লইয়া গেলেন, এবং কুটিরের দাওয়ায় নিজ আসনের পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখানে কেমন করে এলেন?

বাউল বাবাজী বলিলেন,—আমি মঠে প্রায়ই আসি। মঠের সন্ন্যাসী মহারাজ সত্যানন্দজী আমাকে বড়ই স্নেহ করেন, এবং কেন জানিনা এই ক্ষেপাবুড়োর গান তাঁর ভাল লাগে বলে আমাকে তিনি দয়া করে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে আসতে অনুমতি দেন। আমারও তাঁকে দর্শন করবার জন্যে মন টান্‌তে থাকে। এই মানুষটির দয়া ও করুণার অন্ত নেই বাবুজী! আজ সেখানে গিয়ে শুনলেম যে, তিনি অন্যত্র কোথায় সেবাকার্য্যে বেরিয়েছেন। তাই শুনে দুঃখিত মনে চলে যাচ্ছিলেম, তখন মঠের পরিজনরা আপনার কথা সমস্ত বল্লেন। যখন শুনলেম যে, সন্ন্যাসী মহারাজ আপনার বিশেষ অনুরাগী ও বন্ধুস্থানীয়, তখনই বুঝে নিলেম আপনি বড় কম ব্যক্তি নন; তাই শোনা মাত্র মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়ল আপনাকে দর্শন করবার জন্যে। সত্যই আপনাকে দর্শন করে সে ব্যাকুলতা আমার সার্থক হয়েছে।

সাধক সবিনয়ে কহিলেন,—বাবাজী! আপনি প্রেমিক ও ভাবে আপন-ভোলা মানুষ, তাই নিজের অন্তরের মত সকলকেই মনে করেন;

কিন্তু আমার সম্বন্ধে বেশী বড় করে কিছু ধারণা করবেন না। আমি সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী অতি সামান্য ব্যক্তি মাত্র। যাই হ'ক, আমার ভাগ্য গুণে সন্ন্যাসীজীর আদরের পাত্র আপনি,—আজ আমার কুটিরে যে এতটা কষ্ট করে ও আমাকে ভালবেসে এসেছেন, তার জন্যে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আজ এখানে আমার স্বহস্তের রন্ধন গ্রহন করে গেলে আরও বেশী করে সুখী হব।

বাউল ঠাকুর বলিলেন,—বাবুজী, আপনার মনোমুগ্ধকর কথা আমাকে বেশী করে অভিভূত করে দিল। আহারাদির জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। মঠের ভাণ্ডারী মহাশয় আমাকে সেখানে আহারাদি করে যাবার জন্যে বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছেন, আমিও তাঁকে কথা দিয়ে এসেছি। সুতরাং এর জন্যে আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হবেন না। আপনার এখানে আহারাদির আনন্দ একদিন না একদিন পূরণ হবেই। বাবুজী! এইটিই বুঝি মঠের লোক বর্ণিত সেই শক্তিরূপা আদরিণী শ্যামা মা? আহা মায়ের মূর্ত্তিখানি শ্যামা মায়ের মতই বটে, দেখবা মাত্র ভক্তি হয়। আদরী প্রণাম করিতে উদ্যত হওয়া মাত্র বাবাজী নিষেধ করিয়া বলিলেন,—তোমরা মাতৃজাতি, আমরা তোমাদের সন্তান। ৺শ্রীশ্রী চণ্ডীতে কি লেখা আছে জান মা?

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

এই ধ্যান মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আদরীর উদ্দেশ্যে বাবাজী নিজ মস্তকে হস্তদ্বয় রক্ষা করিলেন।

বাবাজীর এবম্বিধ আধ্যাত্মিক কথায় ও ব্যবহারে সাধক অতিশয় মুগ্ধ হইলেন। দুই চারিটি সাধারণ কথাবার্ত্তার পর বাবাজীকে সাধক গান শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বাউল ঠাকুর সম্মতিসূচক বিনয়বাক্যে বলিলেন,—আপনাকে শোনাবার মত আমি কি গাইব? তবে আপনার আদেশে আমাদের পাগলের গান যা জানি তাই একটু শুনাই। এই বলিয়া একতারা যন্ত্রটি কণ্ঠের ওজনে বাঁধিয়া লইয়া ভাববিহ্বল মূর্ত্তিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত গানটি শুরু করিলেন।

আমার এ দুনিয়ায় আর কিছু নাই ভাই
কেবল আনন্দলহরী নিয়ে গান গেয়ে বেড়াই।
ওরে সবখানেতে বিরাজ করেন পরাণ ঠাকুর মোর
তাঁর বাঁশীর সুরে সৃষ্টি সকল রয়েছে বিভোর
আমি সেই সুরে মজে আছি অহর্নিশি তাই।
লোকে বলে ক্ষেপা বাউল ছন্নছাড়া নেই কোন কুল
ওরে যে তাঁরে চায় তার কাছে ত নিজের বলে কিছুই নাই।
দেখরে চেয়ে সাগর পানে, ধায় ঝর্ণা নদী কোন্‌খানে
কার তরেতে ফুটে ফুল দেখে চোখ জুড়াই॥

গানটি সমাধা হইলে পর সাধক আগ্রহভরে আর একটি গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

বাবাজী বিশেষ খুসী হইয়া দ্বিতীয় গানটি আরম্ভ করিলেন। যথা:—

তার পায়ের নাচন তালে তালে দোলে হৃদয় পরে,
ওরে শ্বাস নালীতে ফুৎকারে সে আমার গানের স্বরে।
নয়নেতে দেয় দরশন বাহির ভিতর মাঝে,
তার মোহন বাঁশীর সুর সাথে মোর একতারা বাজে।
দুজনাতে একসাথে রই ভুবনভরা গেহে,
সদা প্রেম ডোরে বাঁধা আছে, নয় ভক্তিতে, স্নেহে।

ছিন্ন মলিন আলখেল্লা মাথায় রুক্ষ কেশ,
কষ্ট কি মোর হৃদে রাজে ত্রিলোকরাজের বেশ।
তার পায়ের চিহ্ন চলার পথে সদাই দেখা যায়,
নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে মোর যখন যেথা চায়।
দেহের বাসা ছাড়ব যখন ছাড়বে না সে মোরে,
আমার সকল মাঝে চেতন রূপে সদাই বিরাজ করে॥

আদরী গানের ভাবাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে থাকাকালীন একবার লক্ষ্য করিল সাধক সজল নয়নে সমাধিস্থের মত বাবাজীর ভাবপ্রবণ দেহতত্ত্বের গান শুনিতেছেন। দ্বিতীয় গানটি সমাপ্ত হইবার পর সাধক ভাবরাজ্য হইতে ফিরিয়া বাবাজীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—সত্যই আপনাদের হৃদয়ে ভগবান যে সদাজাগ্রত আছেন সে বিষয়ে কোনই ভুল নেই। আপনারা যথার্থই সুখী। নশ্বর বস্তুকে ত্যাগ করে অনশ্বর বস্তুর ধ্যানে সর্ব্বদা রত থেকে তাঁর ভাবে বিভোর হয়ে নেচে গেয়ে পরমানন্দে থাকেন এবং বন্ধনময় মানুষকে মুক্তিপথের সন্ধান দিয়ে তাদের ধন্য করেন। বাবাজীর কোথায় নির্দ্দিষ্ট ভাবে অবস্থিতি হয় অর্থাৎ কোন কিছু আশ্রমাদি আছে কি না?

বাউল ঠাকুর বলিলেন,—না বাবুজী, আমার কোন আশ্রম টাশ্রম নেই। থাকি তাঁর এই উন্মুক্ত বিপুল ধরণীর যত্র তত্র। গৃহ আমার কখন বৃক্ষতল, কখন দেবতাদের মন্দির প্রাঙ্গণ, আবার কখন সাধু সজ্জনের কুটির দাওয়া ইত্যাদি।

আদরী জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি কখনও গৃহী ছিলেন, সন্তান সন্ততি কি ছিল বা আছে?

বাউল ঠাকুর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ পরম তৃপ্তির সহিত আগ্রহ সহকারে বলিলেন,—আগে যা ছিলেম তার কথা বলব না,

তবে এখন আমি বিরাট পরিজনবর্গের মধ্যে পরম সুখে বাস করি। সেগুলি কি রকম জান মা! এই তোমার মত আমার অনেক মা আছেন, বৃক্ষ, লতা, পক্ষী, গিরি, নদ, নদী ঝরণা, সাগর, সুনীলাকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি—এরাই আমার এখন বিরাট পরিজন। এদের মধ্যে আমি অনুভব করি কেহ মিত্র, কেহ সখা, কেহ ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, পিতা ইত্যাদি। এদের সঙ্গেই এখন আমার নিবিড় অন্তরঙ্গভাব অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে গেছে; কিন্তু তা স্বাধীন মুক্ত অবস্থায়, কেউ কাউকে নিজ স্বার্থের জন্যে জড়িয়ে ধরে নেই। এই জন্যে আমার এই সকল পরিজনবর্গ সত্যিকারের বড়ই আপন,—জানলে মা!

আদরী বাউল ঠাকুরের এবম্বিধ কথার ভাবার্থ হয়ত সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল না বলিয়া মনে হইল, কিন্তু সাধক শুনিয়া বাবাজীর জানু-দ্বয়ে হস্ত রক্ষা করিয়া বলিলেন,—আহা কি সুন্দর কথা আপনি বল্লেন! সত্যই এইরূপ ভাবতে শিখে আত্মাকে বিলিয়ে দিতে পারাই মানুষের পক্ষে চরম কামনা ও তৃপ্তি মনে করি।

বাউল ঠাকুর সাধকের হাত দুইটি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া বক্ষস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন,—বাবুজি! আপনি আমাকে এত বেশী করে মনে কচ্চেন কেন? আমি অতি সামান্য ব্যক্তি ক্ষেপা বাউল মাত্র; কিন্তু আপনার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে কামনার ধন সঞ্চিত হয়ে গেছে, তা আমাদের অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে। যে মানুষের অন্তরে পরম ভাব অর্জ্জিত হয়ে সুরব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া হয়ে গেছে এবং সেই প্রাপ্ত ফলের ভারে যাঁকে এমন ভাবে বিনয়ে নত করে দিয়েছে তাঁর আর কিছু পেতে বাকি আছে বলে মনে হয় না। আমিই বরং একজন প্রকৃত সঙ্গীত সাধকের কাছ হতে অন্তরে সঞ্চয় করে নিয়ে যাচ্ছি কত ভালবাসা ও সমাদর। আমাদের প্রাণের খবর আপনার মত করে ক'জন লোক

রাখে বাবুজী ? আমরা মানুষের কাছে গেলে ও গান গাইলে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মনে করে শুধু পেটের জ্বালায় ভিক্ষার ফিকিরেই আমরা এই ব্যবসা নিয়েছি। আপনাদের মত দু' এক জন ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে তখন বুঝতে পারি আমরা বোধ হয় গানের মধ্যে দিয়ে জগতের যৎসামান্যও কিছু উপকার করি।

সাধক কহিলেন,—সঙ্গীতের মাধ্যমে, ধর্ম্ম ও ভাবের প্রচার করে, চিরকাল আপনাদের মত ব্যক্তিরাই সংসারের যথার্থ কল্যাণ করে আসছেন। আপনারাই মানুষের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী।

বাউল ঠাকুর বলিলেন,—আপনাকে আর বেশী কিছু বলব না, তবুও আর একবার অন্তর বলতে চাইছে যে, জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলেম যে, প্রকৃত সঙ্গীত সাধক কাকে বলে এবং তাঁর অন্তর কত বড় হতে পারে। আপনার অনেক সময় নষ্ট করে দিলেম; আজ তা হলে এখন উঠি বাবুজী। যদি আপনার সাধনার বা কাজের কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় তা হলে মাঝে মাঝে এসে আপনাকে দর্শন করে যাব এবং ভরসা পাচ্ছি না, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে এরপর যে দিন ভগবান নিয়ে আসবেন সেদিন আপনি ও ওই শক্তিরাণী মা-টি উভয়ে দয়া করে আমাকে একটু সঙ্গীত শুনিয়ে কৃতার্থ করবেন, এই প্রার্থনা রইল।

সাধক স্মিতহাস্তে বিনীতভাবে সম্মতি জানাইলেন। বাউল ঠাকুর সাধককে প্রীতিব্যঞ্জক নমস্কার ও আদরীর মস্তকে পরম স্নেহভরে হস্ত রক্ষা করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে বহির্গত হইয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা যাইল ততক্ষণ উভয়ে শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তৎপরে সাধকের ও আদরীর মনে হইল যেন এক অপূর্ব্ব প্রাণময় পুরুষ ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত

হইয়া স্থানটিকে পবিত্র ও ধন্য করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আদরী সাধককে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা প্রভুজি! আপনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চরম স্থানে পৌঁছে গিয়ে এই সামান্য বাউলের প্রতি ও তাঁর গানের প্রতি এত কি করে মুগ্ধ হ'তে পারলেন তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আমি জানতাম এসব গান আমাদের মত গ্রাম্য অশিক্ষিতদেরই ভাল লাগে, কিন্তু আজ আপনার অবস্থা দেখে আমাকে অত্যন্ত বিস্মিত করে দিয়েছে।

সাধক সহাস্যে বলিলেন,—হুঁ, আমি বুঝেচি, তুমি নিজে সব জেনে ও বুঝে তবুও আমার মুখ দিয়ে কিছু শুনতে চাও, কেমন? আচ্ছা বলছি; দেখ, সঙ্গীতের যে প্রকৃতরূপ, সেই আধ্যাত্মিক রূপের স্থানে পৌঁছ্‌তে গেলে বাল্যকাল হতে এই সমস্ত ভাবপ্রবণ ও ধর্ম্মমূলক সঙ্গীত যথা, বাউল, কীর্ত্তন, কথকতা, রামায়ণ, সাধকদের রচিত গীত, গ্রাম্য সঙ্গীত ইত্যাদি শুনে শুনে মনের শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে মজ্‌বুত্‌ করে নিতে হয় এবং এ জন্যে সহর ছেড়ে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে ঐ সমস্ত গীতকারদের সংস্পর্শে আসতে পারলে তবেই প্রকৃত ভাব বস্তুটিকে মনে ও প্রাণের সঙ্গে ঠিকমত জড়িয়ে রেখে প্রেমের রসে মজ্‌তে পারা যায়। সেই ভাবরস পান করার ফলে রাগ সঙ্গীতের উপরও ভাবের ঘোর বাড়িয়ে দেয়। এ জন্যে সকল অবস্থাতেই সাধকদের এই সকল গান শোনা মাত্রেই মনকে মাতোয়ারা করে' ফেলে। শুধু তাই নয়, সুরব্রহ্মের সাধনায় যে বহু বাধা বিপত্তি আছে, বিশেষতঃ নৈতিক বিপদ আছে তা থেকে রক্ষা করে ঐ সকল গানের প্রভাবশক্তি। কেবল মাত্র যে সঙ্গীতসাধকদের উপকারের জন্যেই উহা প্রয়োজন তা নয়; প্রত্যেক মানুষের জন্যেই ওই সকল গীত বিশেষরূপে

প্রয়োজনীয়। এইজন্যে পূর্ব্বে যাত্রাগানের মধ্যে ও ধর্ম্মের উপাদানে চরিত্র গঠন-মূলক উপাখ্যানের মধ্যে, রামায়ণগানে, কথকতায়, কীর্ত্তনে, ভাবপ্রবণ গ্রাম্যসঙ্গীতে, বাউলদের ও বৈষ্ণবদের দেহতত্ত্ব ও কৃষ্ণলীলা এবং শ্রীচৈতন্যলীলার গানে বাল্য জীবন হতে ধর্ম্মে মতি ও চরিত্র গঠনে অর্থাৎ যথার্থভাবে মানুষ করে গড়তে এইগুলিই ছিল প্রধান উপকরণ। এই ছিল তখন আমাদের শিক্ষার প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়।

আদরী বলিল,—আপনার এই উপদেশগুলি এখন আমি পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরে অনেক কিছু শিখতে পারলাম। একটা কথা আপনাকে সবিনয়ে জানাচ্ছি,—আপনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গানের অপূর্ব্ব ভাবের কথা অনেকবার বলেছিলেন কিন্তু আপনি এইমাত্র যে সকল ভাব ও ধর্ম্মমূলক সঙ্গীতের নাম করলেন, কৈ তার মধ্যে ত উক্ত মহাত্মার গানের উল্লেখ করলেন না ?

ইহার উত্তরে সাধক পরম আগ্রহের সহিত বলিলেন,—তাঁর গানের ও সুরের ভাবকে বুঝতে পারা সাধারণ মানুষের পক্ষে নয় এবং শিক্ষার প্রারম্ভিক ও সঙ্গীত সাধনার প্রথম স্তরের জীবনের জন্যেও নয়। পূর্ব্বোক্ত ভাব ও ধর্ম্ম-সঙ্গীতগুলির রসকে আহরণ করে পূর্ব্বাহ্নে অন্তর ভাণ্ডারে পূর্ণ করতে না পারলে এবং অন্তরে বাহিরে প্রকৃত দর্শনশক্তি অর্জ্জিত না হলে আমার মনে হয় তাঁর গানের যথাযথ ভাবরসের স্বাদ উপলব্ধি হতে পারে না এবং গানের মধ্যে তাঁর সংযোজিত সুর সম্বন্ধেও বলা যায় যে, তার ভাবমাহাত্ম্য বুঝতে হ'লে রাগ সঙ্গীতের উপর অনেকখানি প্রকৃত উপলব্ধি-শক্তির অর্থাৎ আধ্যাত্ম্য শক্তির প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়,-তাঁর গান সাধারণভাবে বিচার ও গ্রহণ করা যায় না। এই জন্যেই তাঁর গানের নাম উল্লেখ করতে সাহস করিনি—বুঝলে ?

আদরী বলিল,—এই দার্শনিক মহাকবির একটি গান শুনবার জন্যে আমার মন আজ বড়ই ব্যাকুল হয়েছে, আপনি অনুগ্রহ করে একখানি শোনান না প্রভুজী!

সাধক কহিলেন,—আমি কি তাঁর গান যথাযথভাবে গাইতে পারব? তিনি দর্শন ও অনুভব করে' যে গান রচনা করে গেছেন, সে স্থানে পৌঁছবার খানিকটাও অন্ততঃ যোগ্যতা না পেলে তাঁর গান গাওয়ার অর্থ কতটুকু থাকতে পারে জানি না। যাই হোক তোমার ইচ্ছা পূরণ করব।

এই বলিয়া সাধক তম্বুরাটি আনিয়া, বিশ্বকবির রচিত এই গানটি আরম্ভ করিলেন,—

"একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
কিছু পলাশের নেশা কিছু বা চাঁপায় মেশা
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি।
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোন্ স্বপনের ছবি আঁকে!
যেটুকু যায়রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি।
রচি মম ফাল্গুনী।"

গানের শেষের দিকে সাধকের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গানের প্রথম দুই কলি শ্রুতমাত্র আদরীর অন্তর-আত্মায় শিহরণ জাগাইয়া তড়িৎ প্রবাহের মত তাহাকে আলোড়িত করিয়া দিল। জীবনে এই রকম অনুভূতি আজ তাহার এই প্রথম মনে হইল।

অন্তরাত্মার কিযে ইঙ্গিত তার স্বরূপ সন্ধানের কোন হদিস্ খুঁজিয়া পাইল না বটে কিন্তু মনের কোনে যে বস্তুটি লুকাইত ছিল তাহা হইতে যেন গানের ঐ কথা ও ভাবের সংঘর্ষণে হঠাৎ এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া তাহাকে চমকাইয়া দিল।

গানটি সমাপ্ত হইয়া গেলে পরও উভয়ের ভাবে তন্ময়তার ঘোর কিছুক্ষণ থাকিয়া গেল। তৎপরে আদরী কথা উত্থাপন করিয়া বলিল,—এমন চমৎকার ভাবে বিশ্বকবির গান গাওয়ার যথার্থতার উপরও আরো যথাযথর কিছু বাকি থাকে কি না জানি না। তবে যে গান গাওয়া ও শোনার মধ্যে গায়ক ও শ্রোতা উভয়কেই প্রকৃত পথের সন্ধান লাভ করিয়ে দিয়ে এমন করে ভাবে পাগল করে দেয়, সেইরূপে গাওয়া গান আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ও ভাববোধের শক্তিতে মনে হয় গীতরচয়িতাকে চরম সার্থকতা ও উদ্দেশ্যের সফলতা দান করে। সত্যই—আহা—এ গানটির প্রত্যেকটি ছত্র কি নিবিড়ভাব সম্বলিত হয়ে রচিত হয়েছে, যার তুলনা আছে কিনা জানি না, এবং সুরসংযোজনার মধ্যে বিভিন্ন রাগের রূপরসাংশ কি সুন্দর ভাবে মিশ্রিত করে' বিশ্বকবি ভাবের পেয়ালায় মানুষের সম্মুখে ধরে দিয়েছেন; যে পান করবে তার অন্তরে এনে দিবে প্রত্যেক চুমুকে পরম তৃপ্তি ও শান্তি। অবশ্য ওই রকম ভাবে সেই স্বাদকে যথার্থভাবে রক্ষা করে' তাকে আরও বেশী করে' ভাবের পাত্রে কথার মধ্যে সুরের রসকে বাড়িয়ে তুলে আকণ্ঠ পান করাবার মত পরিবেশনের শক্তি নিয়ে যদি আপনাদের মত প্রকৃত ভাবুক ও সঙ্গীত সাধক নিযুক্ত হন তবেই উহার যথার্থ রূপরসদান সম্ভব বলে মনে করি। এ জন্যেই আপনি পূর্ব্বে সত্যই বলেছেন, বিশ্বকবির গান সকলের জন্য নয়।

সাধক বলিলেন,—আদরিণি! তুমি ত দেখছি এখন বেশ গুছিয়ে বলতে শিখেছ? বাস্তবিক বড়ই আনন্দ হল তোমার বলবার ভঙ্গী দেখে।

আচ্ছা বলত, এই গানটিতে কোন্ কোন্ রাগের রূপাংশ সংযোজিত হয়েছে ?

উত্তরে আদরী বলিল,—গানটির স্থায়ীতে প্রথমতঃ ভৈরব রাগের পর আর এক রকম যে সুর প্রকাশ পাচ্ছিল তাকে ঐ গোষ্ঠী ভুক্ত রাগ বলে বোধ হল এবং সেটা কলিঙ্গড়া বলেই মনে হয়। আপনি যখন ভৈরব রাগ শিখিয়েছিলেন তখন ঐ রাগটির গোষ্ঠীভুক্ত পারিপার্শ্বিক রাগগুলির রূপের ঘর যথা—রামকেলী, যোগীয়া, কলিঙ্গড়া, প্রভৃতির আরোহণ অবরোহণের নিয়ম, গতিবিধি এবং বাদী সংবাদীর বিষয় আপনি মুখে বলে দিয়েছিলেন, তাই থেকে মনে হল কলিঙ্গড়ার রূপ বলে', এবং অন্তরা ও আভোগের সুরে ভৈরবীর বিশুদ্ধ রূপের প্রকাশ আছে এবং সঞ্চারীতে ভৈরব রাগেরই ঘর আছে।

সাধক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া মনে মনে বলিলেন,—চমৎকার মনে রাখার শক্তি ত! এমন ভাবে চিন্তাশক্তিকে বাড়িয়ে দায়িত্ববোধে ও জ্ঞানার্জ্জনে স্পৃহা না থাকলে কোন বিদ্যাই লাভ হয় না। ভৈরব ও ভৈরবী রাগ আদরী বিশেষ ভাবে শিক্ষা পেয়ে আয়ত্ত করেছে, কিন্তু কবে কখন আমি ঐ রাগগুলির সামান্য নিয়ম জানিয়েছিলেম তাতেই তার সেইগুলির উপর বোধশক্তি এসে গেছে। বাস্তবিকই একেই বলে বুদ্ধির প্রখরতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। প্রকাশ্যে বলিলেন,—শোন! আমি এখন মনে করছি, এরপর মাঝে মাঝে তোমাকে দু একখানা করে বিশ্বকবির গান এবং অন্যান্য ধর্ম্মসংগীতও শিখিয়ে যাব, কেমন ?

আদরী সবিনয়ে বলিল,—আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন প্রভু! সে আপনার ইচ্ছে, আপনি শিক্ষা দিচ্ছেন, কাজেই এ সম্বন্ধে যা ভাল বুঝবেন বা মনে করবেন তার উপর আর কি আছে!

সাধক কহিলেন,—ঠিক্ ঠিক,—তোমাকে শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞেস

করা আমার ভুল ক্রমে হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে সঙ্গীত শিক্ষকদের অবস্থা কি রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কথা তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। আমার গুরুদেব একদিন বলেছিলেন, "জান? আজকাল যারা সঙ্গীত শিক্ষা করতে আসে বা শিক্ষা করবার জন্যে বাড়ীতে শিক্ষক নিযুক্ত করে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই শিক্ষাগুরুর কাছে অনবরত এটা ওটা ফরমাস্ করে শিখতে চায়। গুরু তাকে যে নির্দ্দিষ্ট পথে নিয়ে যাবেন তার উপায় রাখে না। এজন্যে গুরুরাও বাধ্য হয়ে ব্যবসার খাতিরে ছাত্রদের মনের অবস্থা বুঝে নিয়ে নিজকে সঙ্গীতবিক্রেতা মাত্র মনে করে' সেই শিষ্যরূপ খরিদ্দার লক্ষ্মীটির মনস্তুষ্টি করতে বাধ্য হন। অবশ্য এরূপ দুর্গতিপূর্ণ মনোভাব তাদের মধ্যেই বেশী প্রকাশ পায় যারা কাঁচা অবস্থাতেই রৌদ্রের আভা পেয়ে পাকা রং ধরার মত নিজেকে সত্যই সুপক্ক হয়েছে বলে মনে করে।" গুরুদেব আরো দুঃখের সহিত বলেছিলেন যে, "একটু শিখতে পারলেই আজকাল এই রকম শ্রেণীর সংখ্যাই বেশী। এজন্যে প্রকৃত উচ্চস্তরে উঠার সংখ্যা এত কম। এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর ছাত্ররূপী পরীক্ষক আছে, যারা কেবল বড় বড় নাম করা ও নাম না করা সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে আড়ম্বর করে দীক্ষা নিয়ে দিন কতক নেড়ে চেড়ে দেখে অপছন্দ করে চলে যায় এবং আবার আর একজনকে গুরু করে তাঁর অন্তর-আসনে বিশ্বাসরূপ পবিত্র মূর্ত্তিটির উপর গুঁতো মেরে চলে যায়। এই রকম করে সারাজীবন তারা ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত গুরুদের কাছে খাব্‌লে খাব্‌লে খেয়ে বেড়ায়"

আদরী এই সমস্ত কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া কহিল,—"প্রভুজি! আপনি আর আমাকে এ রকম কথা শুনাবেন না। অনুগ্রহ করে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করুন। এসব কথা শুনে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে।

সাধক সস্নেহে বলিলেন,—হবার কথাইত, তুমি যে বর্ত্তমানকালের একটি উজ্জ্বল আদর্শযুক্তা মেয়ে।

আদরী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কহিল,—প্রভুজি! আজ আপনার অনেক বেলা হয়ে গেল, এখন আমাকে অনুমতি করুন গৃহে যাবার জন্যে; আপনাকে এখন রন্ধনাদি করতে হবে।

সাধক কহিলেন,—আচ্ছা এস। আদরী তম্বুরাটি হস্তে লইয়া দণ্ডায়মানা হইল।

সাধক কহিলেন,—দাঁড়াও! একটা মনের বাসনা জানাচ্ছি। বাউল ঠাকুর তোমাকে যাবার সময় যে নামটি সম্বোধন করে' তোমার গান শোনার কথা বলেছিলেন সেই নামটি শুনামাত্র আমার মনে বাসনা অঙ্কিত হয়ে গেছে ওই নামটি তোমাকে দেবার জন্যে। এ জন্যে আজ হতে পিতৃব্যসম সেই বাউল ঠাকুরের প্রদত্ত 'শক্তিরাণী' নামই তোমার হ'ল। তিনি অন্তরদ্রষ্টা, তাই ঠিক বুঝেই এই নাম উচ্চারণ করেছিলেন। আমার এই ইচ্ছা তোমাদের সবাইকে জানাবে।

আদরী অতি বিনয় ও লজ্জানত মস্তকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে গৃহের দিকে চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথিত সেই সহরের সম্মেলনরূপ গানের জলসার অনুষ্ঠাতা ভদ্রলোকের গৃহে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী মহারাজ সেইখান হইতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ প্রয়োজনীয় কার্য্য দুই চারিটি সমাধা করিয়া তৎপরে বেলা প্রায় একপ্রহরের সময় তাঁহার সেই জমীদার বন্ধুটির বিরাট গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র দ্বার রক্ষক সিপাহী তাঁহাকে অভিবাদন করিয় দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—জমীদার বাবু বাড়ীতে আছেন?

সিপাহী মস্তক নত করিয়া কহিল,—জী, হাঁ মহারাজ,—আপ্ ভিতর্ যাইয়ে।

সন্ন্যাসী মহারাজ ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র একটি ভৃত্য দৌড়াইয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া সসম্মানে কক্ষের ভিতরে লইয়া গেল এবং বলিল,—আপনি অনুগ্রহ করে একটু বসুন, আমি খবর দিচ্ছি; এক্ষুনি হুজুর এসে পড়বেন। এই বলিয়া সে সত্বর চলিয়া গেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই জমীদার মহাশয় প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী-মহারাজকে সসম্মানে নমস্কার ও অভিবাদন জানাইয়া তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসীজী তাঁহাকে দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; নিকটে যাইয়া পরম প্রীতিভরে জমীদার মহাশয়ের স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিয়া তাঁহার ও তাঁহার কন্যার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। জমীদার মহাশয় সন্ন্যাসীজীর দুই হস্ত ধারণ করিয়া একটি কৌচের উপর বসাইলেন এবং নিজে তাঁহার বাম পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

এই জমীদার মানুষটি একজন বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ উদার ব্যক্তি ও অত্যন্ত অমায়িক। ইঁহাদের বংশ দান, ধ্যান, অতিথিসেবা, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, পূজা, পার্ব্বণ, বিদ্যা, শিল্পচর্চ্চার পোষকতা প্রভৃতির জন্য এককালে খুবই বিখ্যাত ছিল। এখনও ইনি যথাসাধ্য বংশের সুনাম রক্ষা করিয়া চলেন। জমীদারবাবু সন্ন্যাসীমহারাজদের মঠের আদর্শকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন মত সাহায্যদান করিয়া তৃপ্তি অনুভব করেন। বংশগত উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের উপরেও গভীর অনুরাগ আছে। উপস্থিত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার একমাত্র কন্যাটির জন্য মহানগরীর একজন বিশিষ্ট সুরশিল্পীর কাছে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং এইজন্য তাঁহাকে এখন বাধ্য হইয়া বেশীর ভাগ সময় মহানগরীর দক্ষিণ অংশের নিজ বাটীতে যাইয়া থাকিতে হয়। কন্যাটিও আজকাল এই ছোট সহরে থাকিতে ভালবাসেন না। সেখানের আবহাওয়ায় এখন তিনি চরম আধুনিকা হইয়া পড়িয়াছেন। জমীদার মহাশয় নিজে আলাপ ও ধ্রুপদের মত সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বস্তুর প্রতিই বিশেষ অনুরাগী হইলেও কন্যাটি কিন্তু বর্ত্তমানের চলন ও প্রভাবের উপর বিশেষ আগ্রহ বশতঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যে খেয়াল ও ঠুম্‌রী গানকেই বেশী পছন্দ করিয়া তাহাই শিক্ষা করিতেছেন এবং অনেকখানি পারদর্শিতাও লাভ করিয়াছেন। জনসাধারণের কাছে ও নানা প্রতিষ্ঠানে বেশ খানিকটা নামও পাইয়াছেন। এই সুনাম প্রাপ্তির জন্য ও বিরাট অর্থশালীর কন্যা বলিয়াই বোধ হয় নিজের মধ্যে বিনয় ও ব্যক্তিবিশেষের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্যবোধ খুবই কম। তৎপরিবর্ত্তে বরং গর্ব্ব ও অহংকারের ভাবই বেশী করিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। মনে হয় এইরূপ অবস্থার আরও একটা কারণ আছে, তাহা এই যে, কন্যাটি বাল্যকালে মাতৃহীনা হওয়ার দরুণ পিতার কাছে অত্যধিক

আদর পাইয়া সকল রকম আব্দার ও বায়না পূরণ করিয়া আসিতেছে। সুতরাং যথার্থ জীবনগঠনে তাহার প্রতিক্রিয়া খারাপ হইয়া ঐরূপ অনুচিত মনের অবস্থাকে সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু তাই নয়, সর্ব্বদা খেয়াল খুসীমত চলিতে অভ্যস্ত হওয়ার দরুণ নীতি ও স্বভাবের মধ্যেও শৃঙ্খলাবোধ খুব কম হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক, বুদ্ধিতে কিন্তু স্বভাবগত বেশ তীক্ষ্ণধারযুক্তা; তবে যে কোন কার্য্যে ধৈর্য্যের অভাব অত্যন্ত বেশী।

আজ জমীদার মহাশয় ও সন্ন্যাসীজীর মধ্যে সেবা কার্য্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের কথার ভিতর বর্ত্তমানের সঙ্গীত সম্বন্ধেও অনেক বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। এমন সময়ে জমীদারী সংক্রান্ত জরুরী কার্য্যের জন্য নায়েব মহাশয়ের উপস্থিতির কথা ভৃত্য জানাইয়া গেল। তখন জমীদার মহাশয় সন্ন্যাসীজীকে বলিলেন,—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি কন্যাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি; তাকে আশীর্ব্বাদ করে নানা বিষয়ের উপদেশ দিন। খুকী বড্ড বেশী আমাদের বংশের রীতিনীতি ছাড়া হয়ে পড়েছে। মাতৃহীনা আমার ঐ একটি মাত্র সন্তান। ওর মা মৃত্যুর দিন আমার কোলে তুলে দিয়ে সজল নয়নে বলেছিলেন, "খুকীকে আমার অভাব বুঝতে দিও না, তুমি দুজনের হয়ে ওকে সব রকম সুখে রেখে মানুষ করবে।" আমার অত্যধিক স্নেহের দুর্ব্বলতার জন্য ওর কোন বিষয়েই আমি গতিরোধ করতে পারিনি। এইজন্যে সে একটু কেমন যেন উচ্ছৃঙ্খল ধরণের হয়ে প'ড়েছে; আপনি তাকে একটু সংযম ও রীতি নীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। আমি যথাসম্ভব শীগ্‌গীর্ মধ্যে আসছি।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—আপনি ব্যস্ত হবেন না, কার্য্য সমাধা করে আসুন, খুকী এলে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বেশ সময় কাটবে।

জমীদারমহাশয় চলিয়া যাইবার অল্প সময়ের মধ্যেই জমীদারকন্যা

আসিয়া সন্ন্যাসীজীকে নমস্কার করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি কেদারায় উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— মহারাজজী আপনি কতক্ষণ এসেছেন? আপনাদের সব কুশলত? বহুকাল আপনাকে দেখিনি কেন?

উত্তরে সন্ন্যাসীজী বলিলেন,— এই অল্পক্ষণ এসেছি মা, তাঁর কৃপায় উপস্থিত সকলে কুশলেই আছি। তুমি কেমন আছ মা? তোমরা এখানে এখন বেশীর ভাগ সময় থাক না বলে দেখা সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। তবে পত্রের আদান প্রদানে সমস্ত সংবাদই তোমাদের পাই। তোমার নামটি আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই, সাবিত্রী নয়?

জমীদারকন্যা উত্তরে বলিলেন,—মায়ের দেওয়া ঐ নামই ছিল বটে কিন্তু ও নামটা সাবেক কালের নিতান্ত অনুপযুক্ত বলে আমি তাকে বদ্‌লে ফেলে নিজে নিনামা—এই নাম রেখেছি।

সন্ন্যাসীমহারাজ অত্যন্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,— মাতৃ-প্রদত্ত এমন আদর্শযুক্তা নাম অনুপযুক্ত হল এবং তাকে বদ্‌লে ফেলতে হল ঐ রকম একটা অর্থহীন নাম রেখে?

জমীদারকন্যা বলিলেন,—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা, বেদবতী প্রভৃতি ঐ সকল অভাগিনী নারীদের নামকে আজকালের রুচি ও বিচার সম্পন্ন আমাদের মত মেয়েরা উহাকে আদর্শযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না। আমাদের এখন সব রকম ভাবে মর্য্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে পুরুষের উর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এসেছে। আপনার মত ব্যক্তির কাছে এর বেশী আর কিছু বলা উচিত মনে করি না নচেৎ অনেক কিছুই বলতে পারতেম। আমাদের ক্লাবে এই সব বিষয় নিয়ে এক একদিন তুমুল বক্তৃতার ঝড় বয়ে যায়।

এই কথাগুলি উত্তপ্ত ভাবে বলিয়া জমীদারকন্যা পার্শ্বস্থ কাষ্ঠাধার হইতে একটি সচিত্র মাসিক পত্রের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিত্রতারকাদের নানান লাস্য ভঙ্গীযুক্ত ছবিগুলির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

দুঃখে সন্ন্যাসীজীর ললাট কুঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এমন আদর্শযুক্ত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বংশের আদর্শবান পিতার সন্তান হইয়া এই মেয়ে কি করিয়া এমন ভাবে নীতিজ্ঞানহীন ও আদর্শভ্রষ্টা হইল! কালের কি অদ্ভুত গতি! সত্যই কি আমাদের মাতৃজাতিরা এইরূপ ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন? না, না, তা হইতেই পারে না। এ যে ভারতভূমি, ধর্ম্মের ও আদর্শের যে পীঠস্থান; নিশ্চয়ই মনে হয় ইহাদের মধ্যে যথার্থ শিক্ষায় ও চরিত্র গঠনে অত্যন্ত গলদ ঢুকিয়াছে এবং পরিবেশের আবহাওয়াও অত্যন্ত দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাই হউক ইহার জন্য আমি ভবিষ্যতের চিন্তার প্রয়োজন মনে করিতেছি না, কারণ বর্ত্তমানের এইরূপ প্রগতিপন্থী ও পন্থিনীদের ভুল বুঝিতে বেশী দেরী হইবে না। তাহাদের দেহ, জীবন, মন ও আত্মা সব কিছুই যে এখানের এই পরম পবিত্র মৃত্তিকা দিয়া তৈয়ারী। যতই বাহিরের নোংরা কীট প্রবেশ করুক না কেন, তাহাদের দংশন শক্তি বেশী দিন টিকিবে না, শীঘ্রই তাহাদের মৃত্যু হইয়া ঐ মাটির সঙ্গে মিশিয়া সাররূপে পরিণত হইয়া যাইবে। সন্ন্যাসীমহারাজ ইহাও মনে মনে ভাবিলেন যে, এই মেয়েটির সঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া এখন কোন ফল হইবে না। ইহাকে ভাল ভাল সংস্পর্শে লইয়া যাইতে হইবে। আজ বরং আরও কিছু তাহার কাছে মনের পরিচয়ের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানের অবস্থাটা ভাল করিয়া খানিকটা জানিয়া লই। এইরূপ মনের মধ্যে গোপন অভিপ্রায় রাখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মা, তোমার কথা উপস্থিত তর্কের খাতিরে না।

হয় মেনে নিলেম, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, অর্থহীন এই "নিনামা" নাম ব্যতিরেকে আরো ত বহু রকম মানে থাকা নাম ছিল, তার থেকে একটা কেন রাখলে না ?

জমীদারকন্যা বলিলেন,—দেখুন, সে চিন্তা আমি অনেক করেছিলেম। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গিরি, নদী, ঝরণা সাগর, ফল, ফুল, এমনকি শেষের আধুনিক দিকে নেমে এসে ইরিকা, তিড়িকা, নিরিকা ইত্যাদিও খুঁজে দেখলেম যে, সকল রকম নামই অনেকের নেওয়া হয়ে পুরাণ হয়ে গেছে। তার থেকে নিতে গেলে উচ্ছিষ্ট নেওয়া হয়ে পড়ে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে এই নামটিই মনোনীত ও পছন্দ করে নিয়েছি। আমার বান্ধব বান্ধবীরা নামটি শুনে নির্ব্বাচন ক্ষমতার খুব তারিফ্ করেছিল।

সন্ন্যাসীজী হাসিতে হাসিতে তাহার পর আসল প্রসঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—তোমার এখন গান বাজনা ও পড়াশুনা কেমন হচ্ছে মা ?

উত্তরে জমীদারকন্যা বলিলেন,—পড়াশুনা বেশী করতে পারি না, কারণ সময় পাই না, আর তা ছাড়া খুব বেশী ভালও লাগে না। গান বাজনা কচ্ছি বটে, কিন্তু বাবা যে কি ! কেবল বলবেন, "ঐ বাঙ্গালী শিক্ষাগুরুর কাছেই চিরকাল শিখে যাও। তাঁর যে রূপ শিক্ষা, প্রতিভা ও কলানৈপুণ্য আছে, তার খানিকটা আয়ত্ত করতেও তোমার সারা-জীবন কেটে যাবে", বলুন ত ! এটা কি একটা গান বোঝা মানুষের মত কথা হল ? বাবা এ কথাটা কোন রকমেই বুঝতে চান না যে, এখন আমার স্বজাতি ছাড়া বাইরের কোন হোমড়া চোমড়া গায়কের কাছে না শিখলে আমার মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। এখন আমি যতটা ক্ষমতা ও নাম অর্জন করেছি তার গণ্ডীকে ছাড়িয়ে দেশের লোকের কাছে আরও মান ও খ্যাতি বাড়াবার জন্যে আমাকে এখন গানের মাষ্টারকে

ত্যাগ করে ওস্তাদের শরণাপন্ন হবার জন্যে কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধাকে গ্রাহ্য করা চলবে না। তাতে যে যাই মনে করুন। আপনি একটু বাবাকে বুঝিয়ে বলে দিন, যেন শীগ্‌গীর্ কোন ঐ রকম একজন ওস্তাদ ঠিক করে দেন; যাতে করে তাঁর কাছে অন্ততঃ নাড়াটা বেঁধে ফেলে জাতে উঠতে পারি।

সন্ন্যাসীমহারাজ এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে ভীষণ বিস্ময়াবিষ্ট ও বেদনাহত চিত্তে বলিতে বাধ্য হইলেন,—মা, তুমি সঙ্গীতবিদ্যাকে এবং সঙ্গীতগুরুকে এরকমভাবে গ্রহণ করেছ দেখে বড়ই মর্ম্মাহত হলেম। যিনি তোমাকে এতদিন শিক্ষা দিয়ে তোমার অন্তরে সঙ্গীতের শক্তি সঞ্চারিত করলেন, যাঁর কাছে শিক্ষায় তুমি এতটা সুনাম অর্জ্জন করতে পারলে এবং দৃষ্টি শক্তি লাভ করলে সেই গুরু স্বদেশবাসী বলে কিংবা অন্য কোন মোহের বশবর্ত্তী হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে আর একজনের কাছে নাড়া বেঁধে জাতে উঠতে চাও! এতে ত জাতে ওঠা যায় না মা, বরং জাত ছেড়ে অতল গহ্বরে নেমে যাওয়া হয় বলেই মনে করি। গুরুর প্রতি যদি অবিচল ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে তবেই কাম্য বস্তুর যথাস্থানে উপনীত হয়ে তাকে লাভ করা যায়। ঈশ্বর যেমন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তেমনি গুরু, পিতা ও নারীর পতি।

জমীদারকন্যা রুক্ষস্বরে বলিলেন,—তা হলে কি আপনি বলতে চান যে, ক্রমশঃ বড়র কাছে শিখে মানুষ বড় হতে যাবে না?

উত্তরে সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকরী স্তরবাঁধা ডিগ্রী নেওয়া বিদ্যার কথা স্বতন্ত্র আর সঙ্গীত, সংস্কৃত, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি এই সমস্ত বিদ্যার কথা স্বতন্ত্র। শেষোক্তগুলি মহা-পণ্ডিত গুরুর কাছে প্রকৃত ধর্ম্ম ও পবিত্রতাকে বজায় রেখে চিত্তশুদ্ধির

দ্বারা সাধনায় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে লাভ করে বড় হতে হয়। এজন্যে বিশেষ করে এ গুলির সম্পর্ক গুরু শিষ্যের মধ্যে পিতা পুত্রের মত। এই সমস্ত বিদ্যায় যিনি জ্ঞানের আলো দৃষ্টি শক্তিতে এনে দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত গুরু। তাঁকে ত্যাগ করার মত মহাপাপ আর কিছু নেই। শিষ্য এইরূপ গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞানে মনের মধ্যে ধ্যানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে' সেই বিদ্যার সাধনা করে যাবেন। প্রয়োজন হ'লে তাতেই অন্যের সমস্ত গুণ ও শক্তিকে আহরণ করে নিতে পারবেন। এর ব্যতিক্রম যাঁর মধ্যে ঘটবে তিনি বিদ্যায়, জ্ঞানে, সঙ্গীতে ও তার আধ্যাত্মিক শক্তিতে যথার্থ অধিকারী হতে পারবেন না। সারাজীবন লোভের আকর্ষণে ও দুর্ব্বল চিত্তে কেবল কে বড়, কে ছোট এই চিন্তা নিয়েই সন্দিগ্ধ ভাবে তাঁর সময় কেটে যাবে। যে কোন বিদ্যায় আমাদের দেশে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা পূর্ব্বোক্ত আদর্শকে গ্রহণ করেই হয়েছেন। এ স্থলে আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, দেখ, সামান্য দু একটি অক্ষরের জপ মন্ত্র নিয়ে গুরুর আদেশকে নিষ্ঠায় সহিত পালন করে' পরম ভক্তিভাবে সেই মন্ত্র টুকুর সাধনায় মানুষ ভগবানকে লাভ করছে; আর যে গুরু সঙ্গীত শিক্ষাদানে এতগুলি স্বরকে ও তাল মাত্রাকে বোধে আনিয়ে দিতে পারেন এবং বহু প্রকারের গানের দ্বারা ও নানান ভাবে রাগগুলির রূপ চিনিয়ে কণ্ঠে আনিয়ে দিতে পারেন, তাঁর কাছে আর পাওয়ার কি বাকী থাকে? তারপর সাধনার দ্বারা উচ্চস্তরে পৌছান, সেটা ত নিজের নিষ্ঠা ও সাধনার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

জমিদারকন্যা একটু নরমস্বরে কহিলেন, ভাল ভাল জিনিষ যদি কারো কাছে থাকে ত তা নেবার দোষ কি?

সন্ন্যাসীজী উত্তর দিলেন,—নিতে দোষ কিছুমাত্র নেই, কিন্তু সেটা অন্যের কাছে যাচ্ঞা করে নিজের গুরুকে ছোট করে নয়। অর্জ্জুনের

মত শক্তির জোরে ও মোহিত করে গ্রহণ করতে হবে। অস্ত্রবিদ্যায় মহাগুরু দ্রোণাচার্য্যের কাছে অর্জ্জুন নিষ্ঠা ও গুরুভক্তির জোরে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা বিশ্বজয়ী বীর হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি যখন গুরুর ইচ্ছা ও অনুমতিতে দেবতাদের কাছে ভাল ভাল অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে গিয়েছিলেন, তখন ঐ সকল অস্ত্র নিজের বিদ্যার শক্তি দেখিয়ে তাঁদের মুগ্ধ করে কৃতিত্বের সহিত সংগ্রহ করেছিলেন। এমন কি দেবাদিদেবের পাশুপত অস্ত্রটি অর্জ্জুনকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের দ্বারা বীরত্ব দেখিয়ে সন্তুষ্ট করে নিতে হয়েছিল। এই রকমভাবে গুরুর ও নিজের মর্য্যাদাকে সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত রেখে পাঁচ জনের পাঁচটা জিনিষ সংগ্রহ করার কোন দোষ নেই। এতে গুরুর গৌরবই বৃদ্ধি পায়।

জমীদারকন্যা বলিলেন,—আপনি দেবতাদের উদাহরণ বাদ দিন, কারণ তাঁরা সাধনায়, তপস্যায় এবং গুণে মুগ্ধ হয়ে নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেও বরদানে ও কাম্যবস্তু দানে কুণ্ঠিত হতেন না; কিন্তু এখন মানুষের মধ্যে সে দেবত্বের প্রকাশ কৈ? বিশেষতঃ সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে। এঁরা এখন এমন পেশাদার হয়েছেন যে, তাঁদের কাছে কোন কিছু জিনিষ নেবার মত থাকলে তাঁরা তা দিতে চান না যতক্ষণ না নাড়া বেঁধে শিষ্যত্ব গ্রহণ করা হবে। আগেকার সে যুগ এখন ত আর নেই। এখন বেশীর ভাগ গুরুশিষ্যদের সম্বন্ধ কেবল বেচাকেনার দোকানদারীর মত হয়েছে। যতদিন খরিদ করবার খেয়াল হবে ততদিনই দোকানদারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে ক্রেতার। কাজেই আমাদের এখন খেয়াল মেটাবার জন্যই বলুন বা স্বার্থের জন্যই বলুন কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্বের ভীষণ দায় থেকে আমরা মুক্ত। আমার মন ত বলেই এবং অনেকেই বলেন "তুমি এখন গানে যেরূপ পারদর্শিণী হয়েছ তাতে এখন যত শীগ্‌গীর্ পার বাইরের কোন এক ওস্তাদ সাহেবের কাছে শিখতে পাও বা না পাও নাড়াটা বেঁধে ফেলে

অন্ততঃ মানের সাইনবোর্ডটাকে বড় করে তুলে ধর। আজ কাল অনেক গায়ক গায়িকা ও বাদক বাদিকা এরূপ করে জাতে উঠেছে।" কেউ আবার নাম বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে স্থানীয় বড় গুরুকে ত্যাগ করে স্থানীয় সামান্য ব্যক্তির কাছেও আশ্রয় নিচ্ছে। এছাড়া আরো এমন সব কথা আছে যা শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

সন্ন্যাসীজী অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিলেন,—থাক্ থাক্ মা আর কিছু বল না। এসব কথা শুনে ভীষণ বেদনা অনুভব কচ্ছি। আজ তোমার মুখে বর্ত্তমান সঙ্গীতজ্ঞ সমাজের অবস্থা ও স্বরূপ অনেকখানি জানতে পেরে গভীর অনুতাপে মন পীড়িত হ'য়ে গেল। ভাবছি, আমাদের সেই একলব্য, উপমন্যু, কর্ণ, পদ্মপাদ প্রভৃতি আদর্শ শিষ্যের দেশের মানুষ আজ কোথায় কোন্ অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে বসেছে। যে আদর্শ, মহৎদৃষ্টান্ত, প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ প্রভৃতি সমস্ত গুণের অধিকারী হয়ে এই ভারতবর্ষ কত সহস্র বর্ষ হতে পৃথিবীর সমগ্র জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করে এসেছে, সেই দেশের সন্তানদের আজ ঐ সকল গুণের কত দীনতা ও অভাব হয়ে পড়েছে। দেখ মা, তুমি আমার অতি প্রিয়জনের সন্তান; তাই তোমাকে আমি বিশেষ করে' অনুরোধ কচ্ছি, আদর্শচ্যুতা হয়ো না; আদর্শভ্রষ্ট, কর্ত্তব্য বোধহীন মানুষ কখনই বড় হয় না। সমস্ত কামনাই ঐ অভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়; একথা নিশ্চিত বলে জানবে। এর বেশী তোমাকে আর কিছু আমার বলবার নেই।

জমীদারকন্যা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন সন্ন্যাসীমহারাজের উপদেশ পূর্ণ চোখা চোখা বাণগুলি তাঁহার বিবেকের দ্বারে আঘাত দিয়াছে। প্রকৃত আদর্শবান, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও মনুষ্যত্বের অধিকারী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার এমনই গুণ। কিছুক্ষণ পরে

নম্রস্বরে জমীদারকন্যা বলিলেন,—দেখুন, এই শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটা কথার উত্তর আমি জানতে চাই। মনে করুন, যাঁরা ছোট ছোট সহরে বাস করেন তাঁরা সেখানে সঙ্গীতের উপযুক্ত শিক্ষাগুরু কি করে লাভ করবেন? প্রকৃতগুণীব্যক্তিরা বড় বড় সহরেই বাস করেন। সুতরাং তাহলে ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গীত শিক্ষা করবার ইচ্ছা হবে তাঁদের বাধ্য হয়ে স্থানীয় যে সকল অল্প স্বল্প জানাশোনা শিক্ষক থাকেন তাঁদের কাছেই শিখতে হবে। পরে যদি তাঁরা ভাল শিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বড় গায়কগুণীর কাছে শিখতে ইচ্ছে করেন তা হলে কি তাঁরা কর্ত্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে সেই শিক্ষাগুরুকে ছেড়ে বড় গুণীর কাছে শিখতে যাবেন না?

সন্ন্যাসীমহারাজ কহিলেন,—দেখ মা, এরূপ অবস্থার যথাযথ যুক্তি এক কথায় দেখান যাবে না। প্রথমতঃ তোমার অভিজ্ঞতায় যা বুঝলেম তাতে মনে হয়, বর্ত্তমানে বড়দরের গুণীর কাছে শিখতে হলে বহু টাকা ব্যয় করবার মত সামর্থ্য থাকা দরকার। নচেৎ যতই প্রতিভাবান ব্যক্তি হোন না কেন তাঁর যথার্থ শিক্ষা লাভের কোনই সুযোগ নেই। সুতরাং অর্থশালী ব্যক্তি ছাড়া বড় গুণীকে পাবার উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ কোন শিক্ষার্থী যদি বিত্তশালী হন তা হলে তাঁর প্রথম থেকেই উপযুক্ত গুরু নির্ব্বাচন করা উচিত। এর জন্যে তিনি ইচ্ছে করলে নিজস্থানে সেই গুণীকে রেখে দিয়ে শিক্ষা করতে পারেন। তৃতীয়তঃ কথা হ'ল এই যে, যাঁরা অল্প স্বল্প শিখে মফঃস্বলে শিক্ষকতা করেন, আমার মনে হয় তাঁরা নিজেই ভাল শিক্ষকের কাছে শেখবার জন্যে ব্যাকুল থাকেন এবং একজন্যে তাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত গুরু বলে মনেও করেন না। সুতরাং তাঁদের কোন শিষ্যের যদি কোন বড়দরের শিল্পীর কাছে শেখবার অকাঙ্ক্ষা ও সুযোগ আছে বুঝেন তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই

আনন্দের সহিত তৎক্ষণাৎ সম্মতি দেবেন, ছাত্র ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারবে মনে করে। এ বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। এই শ্রেণীর শিক্ষকেরা বিদ্যালাভের উচ্চস্তরের গুরু নন বলে গুরু বদলান দোষের নয় বরং প্রকৃত শিক্ষারক্ষেত্রে এটা ধর্ম্ম; কিন্তু ঐরূপ গুরুর কাছে অনুমতি ও তাঁর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ লাভ করতে হবে এবং প্রারম্ভের গুরুকে চিরকাল যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করে যেতে হবে। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বগ্রামে গিয়ে প্রথমতঃ জননীকে প্রণাম বন্দনা করে তারপরে যেতেন বাল্যকালের পঠশালার গুরুমহাশয়কে প্রণামি দিয়ে প্রণাম করতে। সেই গুরুর আশীর্ব্বাদে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তর তৃপ্তিতে ভ'রে যেতো। অনেক আলোচনা হয়েছে, আজকার মত এ প্রসঙ্গ থাক, তুমি বরং যদি অসুবিধা মনে না কর তা হলে আমাকে একখানি গান শোনাও। আমি তোমার গান বহুদিন শুনিনি।

এই সময় জমীদারমহাশয় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল, কিছু মনে করবেন না।

সন্ন্যাসীজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—মনে খুব করব যদি খুকীমা আমাকে গান না শোনায়।

জমীদারকন্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—চলুন, আপনারা উপরে, যা জানি আমি নিশ্চয়ই শোনাব। এই বলিয়া পিতাকে ও সন্ন্যাসীজীকে উঠাইয়া উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। তাঁহাদিগকে কোচে বসিতে বলিয়া তম্বুরাটি যথাস্থান হইতে তুলিয়া লইয়া নীচে কার্পেটের উপর বসিয়া সুর বাঁধিতে লাগিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীজী নীচে বসিয়া পড়িলেন। তৎদৃষ্টে জমীদারকন্যা কহিলেন,—আপনি চেয়ার ছেড়ে নীচে নেমে নেইবা বসতেন।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—তুমি নীচে বসে দেবাদিদেবের হাতের পরম

পবিত্র তম্বুরাযন্ত্রটি নিয়ে সুরব্রহ্মের সাধনা করবে আর আমি উঁচুতে বসে তাই শুনব ? এত বড় অন্যায় ও অপরাধ জেনে শুনে কি করে করতে পারি বল ? তোমারও কর্ত্তব্য ছিল পূর্ব্বাহ্নে আমাদের নীচে বসতে বলা। অন্যদিকে যিনি যত বড়ই ব্যক্তি হ'ন না কেন, প্রকৃত শিল্পী, কবি, ভক্ত, সাধু, মহাত্মা, মহামানব ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা উচ্চাসনে ত নয়ই একাসনে বসা সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিবেচনা করবার আছে বলে মনে করি; এমন কি উহা সম্রাটেরও পর্য্যন্ত। অবশ্য তুমি কন্যা-স্থানীয়া ও শিক্ষার্থিনী বলেই একাসনে বসলেম। আচ্ছা এবার তুমি মা গান আরম্ভ কর। বলা বাহুল্য, জমীদারমহাশয়ও নিম্নে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। জমীদারকন্যা একটি রাগের সামান্য আলাপ করিয়া তার একটি খেয়াল গান বিলম্বিত গতিতে প্রায় এক ঘেয়ে বিস্তার দেখাইয়া সমাপন করিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—কণ্ঠে তুমি বেশ অনেকখানি সাবলীল গতি ও ক্রিয়া সমূহ আয়ত্ত করেছ দেখে বড়ই খুসী হলেম। ক্রমশঃ আরো উন্নতি হবে আশা করি। আচ্ছা মা! তুমি যে রাগটি গাইলে সেটির সঠিক রূপ ও রস আমি কিছুই উপলব্ধি করতে পারলেম না। ওটা কি রাগ মা ?"

জমীদারকন্যা বলিলেন,— এটির নাম "খট-খম্বা-শ্রী"।

সন্ন্যাসীজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—তার মানে? উত্তর,—তার মানে "খট্"রাগের সঙ্গে খাম্বাজ ও শ্রীরাগের মিশ্রনে "খট-খম্বা-শ্রী" নাম হয়েছে।

প্রশ্ন,—একে শিখতে গেলে এর বাদী, সংবাদী, আরোহণ অবরোহণের কি রূপ নিয়ম জেনে আয়ত্তে আনতে পারা যাবে ?

উত্তর,—এসব রাগের ওসব নিয়ম নীতির কোন বালাই নেই। যখন যা মনে আসবে তখন তাই করে গেলেই হচ্ছে। এজন্যে এই রকম

ধরণের রাগগুলো এখন গাইতে সকলের বেশ ভাল লাগে। কারণ খাঁটি রাগ গাওয়ার বিপদের মত এতে কিছু নেই।

সন্ন্যাসীজী কহিলেন,—চমৎকার শিল্পীদের বিচার বুদ্ধি। একেই ত "খট্"রাগটি প্রাতঃকালের ছয়টি রাগ নিয়ে তৈরী, তার উপর সন্ধ্যা-কালের "শ্রী" এবং রাত্রি কালের "খাম্বাজ"। অদ্ভুত প্রতিভাযুক্ত ব্যক্তির সৃষ্টি সমন্বয় বলতে হবে। রাগটি শুনে কি রকম মনে হ'ল জান? যেন একটি বহুকালের প্রাপ্য পোষাক এখন খুব জীর্ণ হয়ে পড়ায় এবং তার স্থানে এখন একটি নূতন তৈরী করান দুরূহ হওয়ায় অথবা দ্বিতীয় একটি আর না থাকায় মান ও লজ্জাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সেটার উপরে কোন দর্জীর্ দোকানের ঝেঁটিয়ে ফেলা টুক্‌রো ছিট্‌গুলো দিয়ে চতুর্দ্দিকে তাপ্পি লাগালে যেমন সেই পোষাকটির চেহারা হয় তেমনি এই রাগটির চেহারা দৃষ্টে ঠিক সেইরূপ মনে হল। পাঁচরকম জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ছেঁটে সেই অঙ্গগুলোকে দিয়ে সাজিয়ে একটা কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি তৈরী করার মধ্যে যেমন কোন বাহাদুরী ও শিল্পচাতুর্য্য নেই, তেমনি ভারতীয় সঙ্গীতের রাগগুলির সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। আমাদের প্রধান রাগগুলি এক একটি পৃথক পৃথক দেবতাদের মূর্ত্তির মত। সেগুলির প্রত্যেকটিকে সাধনার দ্বারা রূপাঙ্কিত করে পূজা ও ধ্যান করার মধ্যেই যথার্থ তৃপ্তি ও ফল লাভ হয়ে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। যাই হোক্, তুমি মা, এ রকম বিধি ও মাথামুণ্ডহীন রাগগুলো গেয়ো না। তুমি এবার একটি আমাকে আসল রাগ শোনাও।

জমীদারকন্যা কহিলেন,—আশাবরী গাইব? সন্ন্যাসীজী কহিলেন,—বেশত অতি চমৎকার রাগ, গাও মা।

জমীদারকন্যা 'আশাবরী'তে কোমল ঋষভের পরিবর্ত্তে প্রধান ঋষভ যুক্ত করিয়া ঐ রাগের একটি খেয়াল গাহিলেন।

গানটি সমাপ্তির পর সন্ন্যাসীজী কহিলেন,—বেশ চমৎকার লাগল ; তবে প্রাচীন মতে কোমল ঋষভযুক্ত করে গাইলে আরো বেশী রস পাওয়া যেত এবং জৌনপুরী রাগ হ'তে বিশেষ পার্থক্যও পরিলক্ষিত হ'ত। এ যেন 'আশাবরী' রাগ 'জৌনপুরী' রাগেরই নামান্তর বলে মনে হল ; কিন্তু কোমল ঋষভযুক্ত আশাবরীর রূপ সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে রূপ রসের ভাব ও স্বাদ প্রদান করে এবং তাতে অধিকতর শান্তরস পাওয়া যায়। আমি অনেক প্রাচীন গুণীদের মুখে এবং বড় বড় ঘরানায় শেষোক্ত যুক্তি ও বিচার সম্মত নিয়মেই এই রাগটির রূপ বর্ণন শুনে আসছি। আমার মনে হয় যাঁরা আশাবরীতে প্রধান ঋষভ ব্যবহার করেন তাঁরা বোধহয় পারিপার্শ্বিক সমগোষ্ঠির রাগগুলির রূপ রক্ষায় যথাযথ বিচার বিবেচনা সম্বন্ধে সজাগ নন। যাই হোক এ কথা আমি বলব যে, তুমি পূর্ব্বে যে রাগটি গেয়েছিলে তাতে তুমি নিজেও যেমন সত্যিকারের দরদ দিয়ে গাইতে পারনি ও তৃপ্তি পাওনি, তেমনি শ্রোতাকেও দিতে পারনি ; কিন্তু এ রাগটিতে তুমি যতটা দরদ্ দিয়ে নিজে তৃপ্তি পেয়েছ তেমনি আমাদের ও বিপত্তির মধ্যে না পড়তে দিয়ে সহজভাবে রাগের মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ দান করে কর্ত্তব্যপালন ও সুখী করেছ। তুমি নিতান্ত আপন জন বলেই আজ তোমাকে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলে বিব্রত করলেম, কিছু মনে কর না মা। আমার এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অধিকারের কথাতে এইটুকুই বলতে পারি যে, এক সময় বহুদিন ধরে আমার এক দেবতুল্য গুরুর কাছে কেবলমাত্র ধ্রুপদ গান শিখেছিলেম, কিন্তু পরে সেবাব্রত নিয়ে অবধি আর বিশেষ-ভাবে সাধনার সুযোগ হয়ে উঠেনি সত্য, কিন্তু তা বলে একেবারে ছাড়তেও পারিনি ; সময় পেলেই তম্বুরাটি নিয়ে বসি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনবার জন্যে আমার মন সর্ব্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাল্যকাল হতে

আমার সৌভাগ্যবশতঃ বহু গুণীদের সংস্পর্শে থেকে তাঁদের সঙ্গীত ও সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা শুনে এসেছি। তাই এ সম্বন্ধে দুচার কথা বলবার সাহস হয়।

সন্ন্যাসীজীর পাল্লায় পড়িয়া তাঁহার অকাট্য যুক্তি সমূহের প্রভাবে আজ জমীদারকন্যা বিশেষ ভাবে ঘাবড়াইয়া ও মুস্‌ড়াইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার চেহারা ভাল মানুষটির মত করিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া জমীদারমহাশয় মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আজ আমার ও কন্যার পরম শুভদিন।" জমীদারকন্যা জীবনে কোন দিন এরূপ কঠোর যুক্তিরূপ শাসনের সম্মুখীন হ'ন নাই, চিরকাল কেবল অপ্রতিহত ভাবে তোষামোদ, প্রশংসা এবং পরমাসুন্দরী জমীদারের কন্যা বলিয়া নানান ভাবে লোকের কাছে পূজা উপচার পাইয়া আসিতেছিলেন। আজ যেন সন্ন্যাসীজীর ব্যক্তিত্ব ও বিচার শক্তির কাছে তাঁহাকে সশস্ত্রে পরাভব স্বীকার করিতে হইল এবং সমস্ত অস্ত্রই যেন সন্ন্যাসীজীর চরণে সমর্পিত হইল বলিয়া বোধ হইল।

সন্ন্যাসীমহারাজের কাছে ওই সমস্ত কথা শুনিয়া অতি নম্রভাবে জমীদারকন্যা কহিলেন,—আমার শিক্ষকমহাশয় প্রথমতঃ আশাবরীতে কোমল ঋষভ দিয়েই শিখিয়েছিলেন, পরে বর্ত্তমানের কোন একটা পশ্চিমী পদ্ধতির অনুকরণে প্রধান ঋষভ দিয়ে গাইতে শেখান। আমিও তাঁকে বলে ছিলেম যে, আশাবরীতে প্রধান ঋষভ লাগালে 'জৌনপুরী' হ'তে বিশেষ পার্থক্য কি করে থাকবে? তিনি উত্তরে বলেছিলেন "অত বিচার বিবেচনা করতে গেলে নিজেরই ক্ষতি হবে। বেশীর ভাগই যখন আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পশ্চিমী পদ্ধতির এখন ভক্ত হ'য়ে পড়েছেন, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে হাত মিলিয়ে মান ও প্রাণকে বাঁচিয়ে চলাই ভাল নয় কি? অর্থাৎ ভুল-টুল বিচার করে দরকার নেই।"

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—এ ও বেশ চমৎকার পরিণতির অবস্থা জানতে পারলেম। যাকগে, তুমি এক কাজ কর, কোমল ঋষভ দিয়ে একটু গাও ত? দেখি তোমার কোনটার মধ্যে আড়ষ্টভাব লোপ পেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব আসে।

জমীদারকন্যা কোমল ঋষভ দিয়ে ঐ রাগ কিছুক্ষণ গাইলে পর সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—দেখ মা, তুমি যখন প্রধান ঋষভ দিয়ে গেয়েছিলে তখন তোমার সুর রচনার মধ্যে এমন অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন তাইত 'জৌনপুরী গাচ্ছি, না 'আশাবরী' গাচ্ছি ;—এই রূপ একটা অস্বচ্ছন্দভাব, নয় কি? এ জন্যে শেষের মত প্রথমবারে তুমি গানের মধ্যে ঠিকমত মেজাজ আনতে পেরেছিলে বলে মনে হচ্ছিল না। আমি যে কথা বলছি, তা ঠিক কি না বল?

জমীদারকন্যা কহিলেন,—সত্যই আপনি একজন প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ ও বিচারক এবং মানুষের অন্তর বোদ্ধা।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—সঙ্গীত বিদ্যায় ও তার সাধনায় যখন অনেকখানি জ্ঞান পাওয়া হয় এবং দৃষ্টিশক্তি লাভ হয় তখন নিজের সেই জ্ঞানের মর্য্যাদার উপর আস্থা রেখে একটু অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার বিবেচনা করে দেখলেই সব কিছুর নিয়ম, বিধি ও ব্যবস্থার সন্ধান খুঁজে পেতে দেরি হয় না। এটা খুব কঠিন ব্যাপার কিছু নয়। স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকলেই এ ক্ষমতাটুকু আয়ত্তে এসে যায় এবং এই লভ্য বস্তুটিই ক্রমশঃ মানুষকে বড় করে, শক্তিশালী করে এবং জয়ী করে। পারিপার্শ্বিক রাগগুলির সম্বন্ধে দু-এক কথায় বলা যায় যে, এইগুলির যথার্থ বিচার বিবেচনা করে যিনি প্রত্যেকটি রাগের রূপ চিনবার জন্যে যথেষ্ট তফাৎ রক্ষা করে দেখতে ও জানাতে পারেন তিনিই হন যথার্থ বিদ্যার অধিকারী ও প্রকৃত গুণীব্যক্তি। প্রত্যেক রাগের রূপ বস্তুটি কি তার সম্বন্ধে সর্ব্বদা

ধ্যান ও চিন্তা করতে হয়। আমি মনে করি, কণ্ঠে বা যন্ত্রে রাগের রূপকে নিয়ে যতটা সাধনা করতে হয়, তার অনেক অধিক অন্তরে ও মনে চিন্তার সাধনা করতে হয়। নচেৎ এই ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ সন্ধান কোন ক্রমেই পাওয়া যাবে না। আর এই পাওয়ার জন্যে প্রত্যেক সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের প্রথমতঃ প্রত্যেক রাগের ধ্রুপদ গান শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। ধ্রুপদের মধ্যে সঙ্গীতের সব রকম আলোকের সন্ধান পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, প্রকৃত যাঁরা ধ্রুপদের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁদের অন্তরকেও যথার্থভাবে প্রসারিত করে দেয়। আর একটা কথা জেনে রাখ; বাংলা দেশের গ্রাম থেকে নগর পর্য্যন্ত সমগ্র লোকের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ও অন্যান্য ধর্ম্ম সঙ্গীতের প্রতি যে এত আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় তার মূল কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্রুবপদ সঙ্গীতের দ্বারা চর্চ্চার ভিত্তি এই দেশে স্থাপিত হয়েছিল বলে। সে বড় অল্পদিনের কথা নয়, যখন পশ্চিম ভারতে পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর পূর্ব্বে কয়েক শতাব্দী ধরে সঙ্গীতের কোন ইতিহাস পাওয়া যায়নি, তখনও ঐ সম্রাটের সময়ের প্রায় পাঁচ শ বছর পূর্ব্বে হ'তে এই বাঙ্গালা দেশে ধ্রুপদ সঙ্গীতের বহুল পরিমানে চর্চ্চা ছিল এবং এই দেশই যে তখন সঙ্গীতকে রক্ষা করে এসে ছিল তার প্রমাণ এখন বিশেষভাবে পাওয়া যাচ্ছে। বাঙ্গলার মানুষেরা বংশ পরম্পরায় ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের রসধারা পান করে এসেছে বলেই আজও সঙ্গীত জগতে এই দেশ শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। অন্যদেশে আদি গান ঐ ধ্রুপদের চর্চ্চা বাঙ্গলা দেশের মত যে হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায়, সে সব দেশে ধ্রুপদ একরকম উঠে গেছে দেখে। তাছাড়া আমি বহু বৎসর ধরে দেখে আসছি, বাঙ্গলা দেশের ধ্রুপদের রীতি, পদ্ধতি ও নিয়মের মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নিয়ম কোথাও নেই। তাই বলি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে তার যা কিছু রীতি, নীতি, বিধি,

ব্যবস্থা ও রাগরূপের প্রকাশ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিশুদ্ধ নিয়মের নির্দ্দেশ দানের অধিকার একমাত্র বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন ঘরানা গুণীদের মধ্যেই থাকার দাবী আছে বলে মনে করা উচিত।

এই কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জমীদারমহাশয় বলিলেন,—অনেক বেলা হয়ে গেল। এরপর আপনি স্নানাদি সেরে ফেলুন, আমিও সেরে ফেলি, তারপর একসঙ্গে আহারে বসা যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া আহারে বসিলেন। সেই সময় সন্ন্যাসীজী সঙ্গীতসাধকের মোটামুটি সংক্ষেপে সমস্ত পরিচয় দিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা বিশেষভাবে কৌতুহলী হইয়া সেখানে শীঘ্র একদিন যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আপনাদের শীগ্‌গীর্ জানাব।

আহারাদি সমাপনান্তর সন্ন্যাসীজী বিদায় চাহিয়া বলিলেন,—আমাকে একটু কাজ সেরে এই ট্রেনে ফিরতে হবে। জমীদারকন্যা আজ প্রথম সন্ন্যাসীজীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। সন্ন্যাসীজী পরম আহ্লাদের সহিত তাঁহার মস্তকে হস্ত দুইটী রক্ষা করিয়া স্নেহ-বিগলিত চিত্তে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জমীদারকন্যা কহিলেন,—আজ থেকে আমি আপনাকে জ্যেঠা-মশায় বলে ডাক্‌ব। আপনার কথা ও স্নেহের স্পর্শ এরকম ভাবে বাবার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে পাই নি। বাবার উপদেশকে আবদার ও অহংকারে আমল দিইনি, কিন্তু আজ পিতৃব্যের কাছে আমার মাথা হেঁট হ'য়ে গেছে। আপনি আমার সমস্ত অন্যায়কে কেড়ে নিয়ে ন্যায় ও কর্ত্তব্যের আলো দেখিয়েছেন। আজ আপনার কৃপায় বাবাও সুখী হ'লেন।

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে সজল চক্ষে ও হাসিমুখে পিতাকে এবং আর একবার সন্ন্যাসীজীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীজীকে সদর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া জমীদারমহাশয় সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়া বলিলেন,—সঙ্গীত সাধকের ওখানে যাবার কথা স্মরণ রাখবেন।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—নিশ্চয়ই মনে থাকবে। আজ তাহ'লে চলি। এই বলিয়া জমীদার মহাশয়ের স্কন্ধে পরম প্রীতিভরে হাত বুলাইয়া এবং আর একবার জমীদারকন্যার মাথাটি স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা তোমার নামটি কি বলত ?

সাবিত্রীদেবী আনন্দের সহিত বলিলেন,—জ্যেঠামশায়, আমার নাম সাবিত্রী। এই কথা শোনা মাত্র সন্ন্যাসীমহারাজ হাসিতে হাসিতে খুব আনন্দিত মনে চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইল ততক্ষণ পিতা, পুত্রী দাঁড়াইয়া রহিলেন। জমীদারবাবু লক্ষ্য করিলেন কন্যার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি মনে মনে করিলেন কন্যার উহা কৃতজ্ঞতাশ্রু।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাঁকুড়া জেলার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্ত সীমায় কয়েকঘর হরিজনের বাস।

একদিন আমাদের সেই পূর্ব্বকথিত সেবাব্রত মঠের ওই অঞ্চলে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত শাখার একটি কর্ম্মী দুস্থঃদের জন্য সাহায্য সংগ্রহের নিমিত্ত কয়েকটি গ্রাম ঘুরিয়া প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি হরিজনদের পল্লী পথ দিয়া যাইবার কালে দেখিলেন কয়েকটি নানান বয়সের পুরুষ মাদল্ বাদ্য সহযোগে গ্রাম্যগীত গাহিতেছে আর তাহাদের মধ্যস্থলে একটি দশ এগার বৎসরের সুগঠনা গৌরবর্ণা কিশোরী নৃত্য-গীত করিতেছে। মেয়েটি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মস্তক, চক্ষু,ভ্রূ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির ভাব ভঙ্গী এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতেছে যে, তৎদৃষ্টে তাঁহার মনে হইল যেন একটি স্বভাব সুন্দর অনাড়ম্বর জীবন্ত নৃত্যশিল্পের প্রতিমূর্ত্তি। কর্ম্মীটি আরও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এই রকম স্বভাব কুশলী মেয়েটির যদি যথাযথ ভাবে শিক্ষা পাইবার সুযোগ ও আশা থাকিত তাহা হইলে কালে একজন ভারত বিখ্যাতা নর্ত্তকী হইতে পারিত, কিন্তু তাহার সুযোগ এই শ্রেণীর জাতিদের মধ্যে কোথায়! শিক্ষিত সমাজের অনেক মহিলাদের নৃত্য দেখিয়াছি কিন্তু এমন মন ভুলান সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বচ্ছন্দ গতির নৃত্য কখনও দেখি নাই। যতক্ষণ নৃত্যগীত চলিল ততক্ষণ কর্ম্মীটি তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিলেন। যে গ্রাম্য গীতটিতে নৃত্য হইতেছিল তাহার কথাগুলি এইরূপ,—

নাচে তালে তালে রাধাকিশোরী
কালার বাজিছে দূরে বাঁশরী।

ঘুরে ঘুরে উড়ে রঙ্গীন সাড়ী
রাধা কারে ডাকে দু হাত নাড়ি।
আঁখির ঠারে ক্ষণে ক্ষণে চায়
সে যেন তাহারে বলে আয় আয়।
সহসা আসিয়া ননদি সেথায়
কঠিন বাক্যে তাহারে চেতায়।
ভাঙ্গিয়া যাইল নাচের ছন্দ
বাঁশীর সুরও হইল বন্ধ॥

যখন কিছুক্ষণ পরে নৃত্যগীত বন্ধ হইয়া গেল তখন একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রতি কর্ম্মীটির দৃষ্টি পড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল লোকটি যেন লেখাপড়া জানা একটু সভ্য ও চাক্‌চিক্য ধরণের। কর্ম্মীমহাশয় নিকটে যাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সেই ব্যক্তিটি বলিল,—আমি জাতিতে সাহা (শুঁড়ি) এই হরিজন-দের বসতির পশ্চাৎ দিকে অন্যজাতিদের পরে আমাদের কয়েক ঘর বসতি আছে। আমি বাল্যকালে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি মাইনর স্কুলে কয়েকটা ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ে অর্থাভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। পরে একটু বড় হয়ে সহরের একটি ধনীর দোকানে খাতা লেখার কাজ করে আসছি। প্রত্যেকদিন চার ক্রোশ রাস্তা পায়ে হেঁটে কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হই এবং অধিক রাত্রে ফিরে আসি।

কর্ম্মীটি মনে মনে ভাবিলেন,—লোকটি খুব কষ্ট সহিষ্ণু ও কথাবার্ত্তা ও বেশ পরিষ্কার মার্জ্জিত ভাষায় বলিতে পারে। লোকটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঐ মেয়েটিকে দেখে তার পরিচয় ও তাদের জীবন বৃত্তান্ত জানতে আমার বাসনা হচ্ছে। তুমি কি ওদের বিষয় কিছু জান?

লোকটি বলিল,—আমি সমস্তই জানি। ওর বাবা আমাকে জ্যেঠা

বলে ডাকে ও খুব ভক্তি করে। ওর মা অতি শান্ত সুশীলা। এমন সৎস্বভাবের মেয়ে ওদের জাতের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। আপনার কি সময় হবে ওদের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনতে?

কর্ম্মীটি বলিলেন,—যতটা পার সংক্ষেপে আমাকে বল, আমার খুব সময় হবে। এই সকল জাতিদের বিষয় জানবার জন্যে আগ্রহ আমার খুব বেশী।

উভয়ে তখন একটু তফাতে নির্জ্জন স্থানে বসিলেন। লোকটি বলিতে আরম্ভ করিল,—ঐ যে নাচ্‌ছিল, ঐ মেয়েটীর নাম 'লক্ষ্মী' ওর পিতার নাম 'গোবিন্দ'। গোবিন্দের বাল্যকাল হ'তেই কণ্ঠ খুব সুমধুর। আমাদের অঞ্চলে তার মত কেউ গ্রাম্য সঙ্গীত গাইতে পারে না। ঐ গোবিন্দর দেব, দ্বিজে ও গুরুজনদের প্রতি বাল্যকাল হতে খুব ভক্তি। এক সময় সাম্‌নের বড় গ্রামে ৺ দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে একটা বড় রকমের যাত্রার দল আসে। সেই দলের অধিকারী গোবিন্দর গলা শুনে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তখন তার বয়স তের চৌদ্দ হবে। গোবিন্দর তিন চার বছর পূর্ব্বেই তখন একটা পাঁচ বছরের স্বজাতি কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছ্‌ল। তার পিতা-মাতা কেউ তখন বর্ত্তমান ছিল না। সে মাঝে মাঝে দেশে আসত এবং শ্বশুর বাড়ী যেত। যা মাইনা পেত গরীব শ্বশুর শাশুড়ীকে দিয়ে তাদের সাহায্য করত এবং এখানের অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদেরও কিছু কিছু দান করত। এরকম ভাবে দশ বার বছর গত হবার পর ঐ লক্ষ্মী মেয়েটির জন্ম হয়। লক্ষ্মীর বয়স যখন তিন বছর তখন গোবিন্দর শ্বশুর শাশুড়ী হঠাৎ কলেরা রোগে মারা যায়। গোবিন্দকে বাধা হয়ে দেশের ঐ কুঁড়ে ঘরে তার স্ত্রী ও মেয়েকে এনে রাখতে হয়। লক্ষ্মীকে গান ও নাচ ঐ বয়সেই তার বাবা শেখাতে আরম্ভ করে দেয় এবং আমার উপর ভার দেয় একটু

করে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। এরকম ভাবে গোবিন্দর দেশে থাকার সময়ে মেয়েটা নাচ গান শিখে সাত আট বছর বয়সে বেশ তৈরী হ'য়ে উঠল। এখন তার এগার বছর বয়স। আপনি ত স্বচক্ষে তার নাচ-গান শুনলেন, কেমন লাগল আপনার?

কর্ম্মীটী বলিলেন,—খুব ভাল লাগল বলেই ত এত আগ্রহ নিয়ে ওদের কথা জানতে চাইলেম। আচ্ছা, লক্ষ্মীর এখনও কেন বিয়ে হয়নি?

লোকটি বলিল,—লক্ষ্মীর বিয়ের ব্যাপারে এক অদ্ভুত গোপনীয় কাণ্ড ঘটে গেছে, কেউ তা জানে না। লক্ষ্মীর মা আমাকে ও তার স্বামীকে একদিন তার বিবাহের বৃত্যান্ত জানায়।

কর্ম্মীটি বলিলেন,—আমাকে যদি বলতে বাধা থাকে তা'হলে বলে দরকার নেই।

লোকটী বলিল,—না-না বাধা কিছুই নাই আপনাকে বলতে; বরং আপনাদের মত সাধু ব্যক্তিদের কাছে বললে ঐ ক্ষুদ্র জাতিদের সম্বন্ধে অনেকখানি ভাল ধারণাও মনে স্থান পাবে। শুনুন, আমি বলছি,— আমাদের গ্রামের সন্নিকটের আর একটী গ্রামের শেষ প্রান্তে লক্ষ্মীদের এক-ঘর স্বজাতির বসবাস ছিল। সেই গৃহস্বামীর স্ত্রীর সঙ্গে লক্ষ্মীর মায়ের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। এক সময় তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যদি তাদের মধ্যে কারো আগে পুত্র জন্মে এবং পরে কন্যা জন্মে তাহলে সেই দুই সন্তানের মধ্যে তাদের বিয়ে হবে। বিধি নির্ব্বন্ধে প্রথমতঃ গ্রামান্তরের সেই স্ত্রীলোকটীর একটি পুত্রসন্তান হয়। আর তার তিন বছর পরে লক্ষ্মীর জন্ম হয়। উভয়ের যখন বয়স সাত ও দশ তখন সেই ছেলেটার মায়ের হঠাৎ মরণাপন্ন অসুখের খবর পেয়ে লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে দেখতে যায়। সেখানে পৌছে মুমূর্ষু স্ত্রীলোকটির কাছে বসে তার মাথায় ও কপালে হাত বুলাতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে রোগিনী চোখ

মেলে তাকিয়ে বলে,—"ভাই এসেছিস। আমি আর বাঁচবো না এবং বাঁচতে চাইও না। কেবল মাণিকের জন্যেই দুঃখু। সে বড় অবুঝ ও দুরন্ত। তাছাড়া বাপের ভয়ে অস্থির হ'য়ে বাড়ীতে প্রায় থাকে না। সেই জন্যেই কেবল আমার ভাবনা, তার কি হবে। আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে আমার এই মৃত্যুর সময়ে তুই যদি ভাই কথা দিস যে তোর মেয়ের সঙ্গে মাণিকের বিয়ে দিয়ে তাকে জামাই করবি তাহলে আমি শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে চলে যেতে পারি। তোদের মত মানুষকে যদি সে শ্বশুর-শাশুড়ী পায়, আর তোর গর্ভের এই লক্ষ্মী মেয়েকে যদি পত্নীরূপে পায় তাহলে তার জীবনে কোন কষ্টই হবে না।" লক্ষ্মীর মা বলেছিল,—"ভাই তুই অমন অস্থির হোস্ নে। রোগ সবারই হয়, আবার সেরেও যায়। তুই ভাল হ'য়ে উঠ, আমি কথা দিচ্ছি তোর ছেলের সঙ্গে ছাড়া আমার লক্ষ্মীর আর কারো সঙ্গে বিয়ে হবে না। প্রতিজ্ঞা যখন আমরা করেছি তখন ওদের ধর্ম্মতঃ বিয়ে হ'য়ে গেছে জানবি।" লক্ষ্মীর মায়ের মুখে এই কথা শুনে মাণিকের মায়ের মুখে আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছিল। সে বলেছিল,—"আমি তোর মুখে এই কথা শুনব বলেই এতক্ষণ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি। লক্ষ্মীকে আমার কোলের কাছে আসতে বলে দে।" লক্ষ্মী কোলের কাছটিতে এলে পর তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে নিজের মাথার শুকন সিঁদুর একটু খুঁটে নিয়ে লক্ষ্মীর কপালে পরিয়ে দিয়েছিল এবং বিবাহকালের পিতৃদত্ত দু'গাছা রূপার চুড়ি নিজের হাত হ'তে অতি কষ্টে খুলে লক্ষ্মীর হাতে পরিয়ে দেয়। পরে বালিসের নীচ থেকে শেষ সঞ্চিত একটি টাকা বের করে লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে ও মুখে একটি চুমা খেয়ে বলেছিল, "আজ মা তোমাকে পাকা দেখার আশীর্ব্বাদ করলাম। তুমি তোমার পিতামাতার গুণ নিয়ে সকলের আশীর্ব্বাদ লাভ করে চিরসুখী হও, এবং তোমার নামের মহিমা

(Smt / Shri / Kumari / M/S)

সার্থক হ'ক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

লক্ষ্মী তখন যদিও খুব ছোট তবুও তার পিতৃমাতৃদত্ত ও স্বভাবগত বুদ্ধিতে মাণিকের মাকে সেই সময় প্রণাম করবার কালে তার পায়ের উপর কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে ছিল। তা দেখে ও অনুভব করে লক্ষ্মীর মায়ের ও মাণিকের মায়েরও চোখ দিয়ে জল পড়েছিল।

মাণিকের মা বড় দুঃখে বলেছিল—"দেখ ভাই, এ সময় তিনি নিকটে থেকেও সামনে একটিবার আসেন না। বোধ হয় শেষকালে তাঁর চরণ দর্শন ভাগ্যে হ'ল না। কি অপরাধে জানি না বিশেষতঃ কয়েক বছর ধরে তিনি বড়ই নিষ্ঠুর হয়েছেন। আজ তিনদিন ধরে' আমি কেবল একটু করে জল খেয়ে আছি। তাও ছেলেটা যখন এক একবার কাছে আসে তখন সেই যা একটু করে মুখে ঢেলে দেয়। ও পাড়ায় একঘর মানিককে ভালবাসে, সেখানেই এখন সে খাওয়া দাওয়া করে। সন্তানহীন ঐ স্বামী, ও তার স্ত্রী বড় গরীব। এখানে সেখানে খেটে খুটে তাদের কোন রকমে দিন চলে। আমার অসুখের কথা কাউকে বলতে মাণিককে বারণ করে' দিয়েছি। তোরা কেউ জানিস না, আমি বহুদিন ধরে' পরের বাড়ীতে খেটে খুটে যা এনেছি তা ওঁকে খাইয়ে নিজে কোনদিন একবেলা কোনদিন উপোস করে' কাটিয়েছি। উনি যা রোজগার করেন তা অনেকদিন ধরে আর একজনকে দিয়ে আসছেন। আমার সঙ্গে সম্পর্ক এখন তাঁর কেবল দু'বেলা খেতে আসা। আগে আমাকে এত অবহেলা করতেন না, কিন্তু কি জানি আমার অদৃষ্ট দোষে কি যে হয়ে গেল ভগবানই জানেন। আজ তিন দিন ধরে পড়ে আছি, রেঁধে খাওয়াতে পারি নি বলে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি যে আর একজনকে ভালবাসেন তার জন্যে ভাই, আমি কোন দিনই প্রতিবাদ বা ঝগড়াঝাটি করি নি। মনে মনে ভেবে এসেছি আমার যেটুকু

পাওনা তার অধিক আমি পাব কেন। তিনি যাতে সুখ পান সেই আমার পরম সুখ। এসব কথা আমি কাউকেই বলি নি বা বলতাম না; বাঁচব না বলেই আজ তোকে এসব দুঃখের কথা বললাম।"

এই কথা বলার পরই মাণিকের মায়ের শুষ্ক চোখ দিয়ে বহু সঞ্চিত দুঃখ কষ্টের অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেকক্ষণ কথা বলার পর পরিশ্রম ও উত্তেজনার দরুণ ভীষণ হাঁপ এসে পড়ায় লক্ষ্মীর মা তখন তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়ে এবং শালপাতায় করে' মাথায় বাতাস ও বুকে হাত বুলাতে থাকে। লক্ষ্মীও মাণিকের মায়ের পায়ের তলায় হাত বুলাতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে মাণিকের মা একটু সুস্থ বোধ করে' চোখ মেলেছে দেখে লক্ষ্মীর মা বলেছিল "আমি দৌড়ে গিয়ে গ্রামের কাউকে দিয়ে ডাক্তার আনাচ্ছি এবং তোর জন্যে সরবৎ ও দুধসাগু নিয়ে আসছি। এক্ষুণি আসব, ততক্ষণ লক্ষ্মী তোর সেবা করুক। মাঝে মাঝে একটু করে জল খাবি।" এই বলে খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীর মা খানিকটা যেতেই লক্ষ্মীর কান্নার চীৎকার শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে এসে দেখল মাণিকের মা চোখ বুজে চিরশান্তির কোলে বিশ্রাম লাভ করেছে। তার মা তখন লক্ষ্মীকে বলল,—এখন আর কাঁদাকাটা করবার সময় নেই, কর্ত্তব্যের সময়। দেখি একটু দূরে বোধ হয় একটা বুড়ী আছে, তাকে ডেকে গ্রামের সবাইকে ডেকে আনি। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। বুড়ীকে ডেকে এনে সেখানে বসতে বলে লক্ষ্মীর মা আমাদের কাছে সমস্ত ঘটনা বলল। সেদিন রোববার ছিল বলে আমি গ্রামেই ছিলাম। শোনামাত্র সকলকে ডেকে কাঠ সংগ্রহ করে সেখানে গেলাম। অনেক খোঁজা খুঁজি করে মাণিককে একটা গাছ তলায় ঘুমন্ত অবস্থা থেকে উঠিয়ে আনা হ'ল। মাণিকের বাবাকে পাওয়া গেল না। তাদের গ্রামের দু' একজনকে ডেকে সৎকারের ব্যবস্থা করা হ'ল। তারপর

(Shri / Smt. / Kumari / M/S)

যখন চিতায় তু'লে দেওয়া হ'ল তখন লক্ষ্মীর মা সেই সতীলক্ষ্মীর মাথার সিঁদুরটুকু পরম ভক্তির সহিত তুলে নিয়ে নিজের সীঁথিতে লেপন করে নিল এবং নিজের নোওয়াটাকে মৃতার নোওয়ার সঙ্গে ঠেকিয়ে বলেছিল, "ভাই তোর মত যেন আমি পতিকে দেবতার মত চিরকাল এমনি করে বুঝতে শিখি এবং এমনি করে রেখে যেতে পারি" এই বলে পায়ের তলায় মাথা রেখে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠেছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুষ্ক দেহটি ছাই হ'য়ে গেল, কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে সেই নারীটির চরিত্র ও জীবনের কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে চির-অঙ্কিত হ'য়ে রইল। যখন মনে পড়ে তখন চোখ দিয়ে জল এসে যায়।

কর্ম্মীসন্ন্যাসীটিরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"সকল স্তরের সকল মানুষের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে। ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, নিষ্ঠা, ভক্তি, স্নেহ, দয়া, মায়া এই সমস্ত গুণ বিচার করার মধ্যে জাতিগত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কিছু নাই; এর জন্যে উচ্চ—নীচ ভাবাও চলে না। নীচ জাতি বলে আমরা ঘৃণা করি কিন্তু মাণিকের মায়ের চরিত্র যাহা শুনিলাম তাহাতে মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি আমাদের পরমপূজ্যা নারীদের আদর্শ চরিত্রের সঙ্গে এই রকম নারীদিগকেও তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত করা চলে।" লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া তাহার পর সন্ন্যাসী বলিলেন,—মাণিকের কি হ'ল?

লোকটি বলিল,—লক্ষ্মীর মা তাকে সঙ্গে করে আনতে অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে বাপের ভয়ে আসতে চাইল না। বলেছিল,— "আমি মায়ের ঘরেই থাকব এবং এখন থেকে লোকের বাড়ীতে খেটে খাব।" এই কথা বলেই সে দৌড়ে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমরা আর তাকে ধরতে পারি নাই।

এরপর লক্ষ্মীদের কথা বলি,—এই ঘটনার তিন চার বছর পরে

আজ প্রায় ছ'মাস হবে গোবিন্দ জ্বর ও কাশি নিয়ে দেশে এল। জ্বর তার একেবারে ছাড়ে না, দিন দিন যেন ক্রমশঃই শুকিয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দর স্ত্রীও স্বামীর এইরকম চেহারা হয়ে যাচ্ছে দেখে কেমন যেন হয়ে পড়েছে। বৌটার সে হাসিমুখ ও সদানন্দ ভাব আর নাই। সর্ব্বদাই মনমরা হ'য়ে থাকে। লক্ষ্মী এখন এগাঁ ও-গাঁ করে নেচে গেয়ে পয়সা, চাল ইত্যাদি রোজগার করে' সংসার চালাচ্ছে এবং সেই পয়সায় হাতুড়ে চিকিৎসকের ঔষধ প্রভৃতির খরচও চলছে। গোবিন্দ লক্ষ্মীকে তার কাছে আসতে বসতে ও থাকতে দেয় না। ওটা সেটা ফরমাস্ করে' দূরে দূরে রাখতে চায়। কাছে বার বার গেলে বলে,—"মা তুই ঐ উঠোনের সামনে একটু নেচে নেচে সেই শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠে যাবার গানটি গা-ত, ইত্যাদি।" এই রকম ভাবে তাকে ভুলিয়ে রাখে। রাত্রে এক সম্পর্কে বুড়ো পিসির কাছে লক্ষ্মী থাকে। আমাদের এখানের সবাই লক্ষ্মীদের খুব ভালবাসে, কিন্তু আমরা এত গরীব যে ওদের এসময় কিছুই তেমন সাহায্য করতে পারি নি। সহর থেকে ভাল ডাক্তার আনতে পারলে হয়ত গোবিন্দ শীগ্‌গীর্ সেরে উঠত। আমি যাত্রার দলের অধিকারীকে কিছু সাহায্য পাঠাবার জন্য পত্র লিখেছিলাম, কিন্তু তার কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অথচ শুনেছি গোবিন্দর গান শুনার আকর্ষণে সেই যাত্রার দলকে লোকে বেশী করে ডাকৃত। অসুখে বিসুখে আমাদের একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

কর্ম্মীসন্ন্যাসীটি বলিলেন,—তোমার মুখে আজ যে সকল বৃত্তান্ত শুনলেম, তা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি দুঃখজনক। এই সব দুঃস্থ জাতিদের সেবার জন্যই আমাদের এই সেবাব্রত গ্রহণ করা। আমরা এখানের শাখাতে উপস্থিত চারজন কর্ম্মী এসেছি। ভিক্ষায় বাহির হই

(Shri / Smt. / Kumari / M/S)

কিন্তু যাঁদের অবস্থা একটু স্বচ্ছল তাঁদের কাছে মুখের যেরূপ সহানুভূতি পাই সাহায্য সেরূপ পাই না। আবার অনেকে বিশ্বাস করতে চান না আমাদের আদর্শ ও সঙ্কল্পকে। অবশ্য এরূপ অবিশ্বাস বেশী করেন তাঁরাই যাঁরা একটু লেখাপড়া শিখে সহরে চাকরী করেন বা যারা স্কুল কলেজে পড়ে। সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা বরং কিছু কিছু করে দান করেন। যাই হোক তুমি আমাকে লক্ষ্মীদের বাড়ীটা দেখিয়ে দাও, উপস্থিত আজ আমার কাছে যা আছে তা তাদের দিয়ে যাই। তখন সেই লোকটি অতি শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মীকে তাহাদের ঘরের নিকট হইতে ডাকিল।

লক্ষ্মী বাহির হইয়া বলিল,—কি বলছ দাদু ?

কর্ম্মীটি বলিলেন,—তোমাদের জন্য এই যৎকিঞ্চিৎ দিচ্ছি গ্রহণ কর। এই বলিয়া ঝুলির সহিত চাউলগুলি ও একটি টাকা তাহার হাতে দিতে যাওয়া মাত্র লক্ষ্মী বলিল,—আপনি কে ? এবং কেনই বা আমাকে এইসব দিচ্ছেন ?

কর্ম্মীসন্ন্যাসী তখন নিজেদের ব্রতের কথা ও তাহার অর্থ সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন।

সমস্ত শুনিয়া লক্ষ্মী বলিল,—আপনার অনেক দয়া সাধুঠাকুর, কিন্তু আপনার এই পরমদয়ার দানের জিনিষগুলি আমি কি করে নিতে পারি ? আমার যে খেটে রোজগার করবার মত শক্তি আছে। তা ছাড়া বাবা আমাকে সামান্য যে বিদ্যা শিখিয়েছেন তার কৃপায় সহজেই আমি দু'পয়সা আনতে পারছি। বাবা আমাকে অনেক বারই এই কথাটা শিখিয়েছেন যে, মানুষের ক্ষমতা থাকতে ভিক্ষা বা দান গ্রহণ করতে নাই, করলে ভগবান তাতে রাগ করেন। আপনাদের আদর্শ-মত এগুলি দেওয়া উচিত তাদেরই যাদের কোন ক্ষমতা নাই।

অতি দরিদ্র ও হরিজনজাতির মেয়ের এই কথা শ্রবণে কর্ম্মীটি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইলেন। কিছুক্ষণ মনে মনে ভাবিলেন, "ইহাদের মধ্যেও বিচার বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব বলিয়া জিনিষটার অভাব নাই। ঠিকমত শিক্ষা পাইলে সদুপদেশ চমৎকার ভাবে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে। এদের সরল মন ও ভাল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখে এবং তাহার সঙ্গে দরিদ্রতার সুযোগ নিয়ে তাই বোধ হয় মিশনারীরা ইহাদিগকেই বেশী করিয়া খৃষ্টান করিয়া ভারতে নিজেদের ধর্ম্ম সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। অবশ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়া আসিতেছি আমরাই, এদের উন্নতির জন্য কোন বিষয়েই দৃষ্টিপাত করিয়া আসি নাই বলিয়া।" যাহা হউক উপস্থিত এই সমস্ত চিন্তা ছাড়িয়া কর্ম্মীটি লক্ষ্মীকে বলিলেন,—মা আমি তোমাকে এগুলি ভিক্ষা দিচ্ছি না ; তোমার নাচ ও গান শুনে মুগ্ধ হ'য়ে দিচ্ছি—নাও মা।

লক্ষ্মী একটুখানি থমকিয়া বলিল,—আচ্ছা তবে দিন। এই বলিয়া অঞ্চল পাতিয়া বলিল,—এতে চালগুলি ঢেলে দিন, আমি ছোঁব না।

কর্ম্মীটি বলিলেন,—মা, তুমি ঝুলিটা তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে চালগুলি রেখে এস।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিল, ইঁহাদের দেহ ও মন ছোঁয়াছুঁয়ির জন্য অপবিত্র হয় না এবং ছোট জাত বলিয়া ইঁহারা ঘৃণাও করেন না।

কর্ম্মীটি বলিলেন,—মা, তোমার পিতাকে চিকিৎসার জন্যে কোন 'হাঁসপাতালে' ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে পারি কি ?

লক্ষ্মী বলিল,—বাবার ত এমন বিশেষ কিছুই হয় নি। সামান্য জর ও কাশি, ও এমন কিছু নয়। ভগবানের কৃপায় শীগ্‌গীর্ সেরে উঠুন—এই আশীর্ব্বাদ করুন। তা ছাড়া বাবাকে ছেড়ে মা একদণ্ডও বাঁচবেন না এবং আমারও সেইরূপ অবস্থা হবে। আপনি বরং যদি মাঝে মাঝে

সুবিধা মত খোঁজ নেন ও আশীর্ব্বাদ করে যান তাহ'লেই আমরা কৃতার্থ হব।

কর্ম্মীটি লক্ষ্মীর কথা শুনিয়া বলিলেন,—তোমার বাক্য যেন সত্য হয়। ভগবান তোমার পিতাকে শীঘ্র নিরাময় করুন এই তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাই। মাঝে মাঝে আমি নিশ্চয়ই আসব ; তবে আজ চলি। এই বলিয়া কর্ম্মীটি গমনোদ্যত হইলে পর সেই লোকটি বলিল,—আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি, রাত্রি অনেকখানি হয়ে গেল।

কর্ম্মীটি বলিলেন,—না না তোমাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমাদের এ সমস্ত অভ্যাস আছে। তোমার বিনয় নম্র ব্যবহারে আমি খুব খুসী হয়েছি ; আবার দেখা হবে। এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ঐ মেয়েটির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"সত্যই মেয়েটির মধ্যে স্বজাতির রীতি নীতি ছাড়া যেন অনেকখানি উপরস্তরের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি দেখা গেল। ভগবানের নাম গান করার জন্যই বোধ হয় এরূপ হয়। কারণ তিনি যে সঙ্গীতেরই বেশী প্রিয়। তাহার উপর মেয়েটির পিতার বহু দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দৃষ্টে ও সে বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হওয়ার জন্য এবং যাত্রাভিনয়ের মধ্যে চারিত্রিক শিক্ষা প্রভৃতি লাভের গুণে অন্তরের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চিত হইয়া থাকায় কন্যাটির মধ্যে তাহার প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে।"

আরও অনেক কথা এই জাতিদের সম্বন্ধে ভাবিতে লাগিলেন,—"এই রকম শ্রেণীর জাতিদের লোকসংখ্যা আমাদের দেশে বড় কম নয়। ইহাদের দ্বারা ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা কৃষি কর্ম্মাদি করাইয়া নিজেরা উৎপন্ন দ্রব্যাদির পনর আনা ভাগই দখল ও ভোগ করিয়া আসিতেছে। আপদে, বিপদে, গৃহনির্ম্মানাদি কার্য্যে ও স্থানান্তরে গতায়াত ইত্যাদিতে বহুকাল

হইতে বংশানুক্রমে ইহারা দেহ, মন, স্বাস্থ্য, সুখ প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়া এক মুঠা অন্নের জন্য নির্ব্বিকার চিত্তে উপরওয়ালা প্রভুদের হুকুম তামিল করিয়া আসিতেছে। বাধ্য হইয়া ইহারা বাস করে গ্রামের প্রান্ত সীমায় নিতান্ত ভগ্ন এক একটি কুঁড়ে ঘরে। বর্ষায় সেই ঘরে জলের ধারা বহিয়া যায়, শীতকালে স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, ছিন্ন বস্ত্রও সকলের অঙ্গে থাকে না, বিশেষতঃ শিশুরা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকিতেই বাধ্য হয়। বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই তাহাদের উদর পূরণ করিয়া আহার জুটে না। ভদ্র সমাজের লোকেরা বোধ হয় ভাবেন তাঁহাদের জন্য তাঁহারা নিজেরাই মালিক আর ঐ হতভাগাদের জন্য সেই কোন্ অদৃশ্য লোকে একজন ভগবান আছেন তিনি শুধু ইহাদের জন্যই বসিয়া বসিয়া খাতা কলম লইয়া শাস্তি প্রদান করিবার জন্য তাহাদের অদৃষ্ট ও ভাগ্যের বিচার করিয়া আসিতেছেন ; আর আমাদিগকে তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, বিবেক, বিচার, বিবেচনাশূন্য হইয়া যাহা খুসী তাহাই করিয়া যা। তাই বোধ হয় আমরা ভাবিতে শিখিয়াছি ও উহা-দিগকে ভাবিতে শিখাইয়া আসিতেছি যে, আমরা ভাগ্যবান, সমস্ত সুখ ভোগের অধিকারী আর তোরা দুর্ভাগা, পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মের শাস্তি গ্রহণ ও ভোগকারার জাতি ; এই জন্যই তোদের ভগবান এইরূপ ছোট জাত করিয়া পাঠাইয়াছেন। এইরূপ মনুষ্যত্ব বিহীন অকরুণ মনো-ভাবের জন্য বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই জাতের লোকেরা এখন নিরুপায় হইয়া অনেকেই দেশ ছাড়িয়া স্থানান্তরে অর্থাৎ সহরে কিংবা কোলিয়ারীতে গিয়া দুই মুঠা খাইতে পাইবার আশায় বহু দুঃখে ও কষ্টে জন্মভূমির মায়া চিরতরে কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে। এখনও যদি আমরা এই জাতিগুলির প্রতি যথাযথ দৃষ্টিপাত না করি এবং বিচার বিবেচনা না করিয়া চলি তাহা হইলে মনে হয় ইহারা

পর পল্লীর সাধারণ ও ভদ্রসমাজের লোকদের অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে।" এই সমস্ত বিষাদময় কথা চিন্তা করিতে করিতে কর্মীটি শাখাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতসাধকের গুরুদেব একদিন গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে আহারে বসিয়াছেন; তাঁহার স্ত্রী কাছটিতে বসিয়া হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা তোমাকে আজ কেমন যেন মনমরা দেখাচ্ছে, কি কারণ বল দেখি?

গুরুদেব বলিলেন, আজ রাত্রিতে বাসে চড়ে আসতে আসতে একটি বয়স্কব্যক্তির অবস্থার বিষয় জেনে মনটা বড্ড খারাপ হ'য়ে আছে।

গৃহিণী বলিলেন,—ব্যাপারটা কি বলই না শুনি।

গুরুদেব বলিলেন,—বাসে চড়ে একটি লোকের পাশে বসেছি মাত্র, তখন সেই লোকটি বল্‌ল,—"আপনি আমাকে যৎসামান্যও কিছু সাহায্য করতে পারেন কি?" আমি তাঁর চেহারা দেখে বিশেষ ভদ্রলোক বলেই মনে করলেম, যদিও বেশভূষা অত্যন্ত দরিদ্রের মত। যাই হ'ক আমি বললেম, আপনি কি পয়সা আনতে ভুলে গেছেন? বাসের টিকিট আমি কেটে দেবো? কোথায় যাবেন আপনি? লোকটি বল্‌ল, "আমি যাব কালীঘাট। টিকিট আপনাকে কেটে দিতে হ'বে না, সেই পয়সা কয়টি আমাকে দিন।" আমি তাঁকে আটআনা পয়সা দিয়ে,

জিজ্ঞেস করলেম আপনি কোন কাজকর্ম্ম করেন না কেন? সংসার করেছেন না কি? লোকটী বল্‌ল,—"আমি সংসারী, বৃদ্ধামাতা, স্ত্রী ও চারটি পুত্র কন্যা আমার আছে। আমি গান শেখানর কাজ করি, কিন্তু আমার যে গান শেখা ও সাধনা আছে সে গানের টিউশনি জুটে না। মাত্র দুটি টিউশনি খুব কম টাকার আছে। এজন্য আমাকে অতগুলি পোষ্য প্রতিপালন করবার দায়িত্বে সব কিছু লজ্জা সরম খুইয়ে একরকম ভিক্ষের ওপর নির্ভর করে কোন রকমে বহু কষ্টে দিন চালাতে হচ্ছে।" আমি জিজ্ঞেস করলেম,—আপনি কী গান শেখান? তিনি বল্লেন, 'আমি ধ্রুপদ গান শেখাতে পারি। বাংলার প্রাচীন ঘরানার বিখ্যাত গায়কের কাছে আমি দশ বছর ধরে ঐ গান শিখেছিলেম। ভগবানের কৃপায় এই বিদ্যায় অতি সামান্য অধিকারের দ্বারাতেই নিজের দেশে একরকম চলে যাচ্ছিল; কিন্তু আমাদের দেশ যখন পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হ'ল তখন থেকেই আমাদের কপাল ভাঙ্গল। আজ কয়েক বছর এসে অবধি এখানে কোনই পাত্তা পাচ্ছি না। আমি যে সঙ্গীত চিরকাল সাধনা করে এসেছি তাকে শিখতে এখানের লোকদের অত্যন্ত অবহেলা ও অবজ্ঞা দেখে আসছি। তা ছাড়া দেশে থাকার জন্যে আমার নাম ডাক নেই বলে আমার উপর কেউ বিশ্বাস রাখতে চায় না যে আমার সামর্থ্য কিছু আছে বলে'। অবশ্য গায়কী আমার খুব বড়দরের বলে আমি নিজে তা মনে করি না, কিন্তু এটা ঠিক যে, ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রতি যদি লোকের আগ্রহ থাকত তা হলে হয়ত আমাকে এত কষ্টের মধ্যে পড়তে হ'ত না। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে গান শেখানর কথা বল্‌লে তাঁরা বলেন, 'আধুনিকগান, গীত, গজল্ এই সব জানেন মশায়? তা হলে আমাদের ছোট ছোট মেয়েদের জন্যে শিখাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।' আমি উত্তরে বলি, ও সব গান

আমার জানা নেই ও আমরা গাই না, তবে বাংলা ধর্ম্মসঙ্গীত ও দু' একটা ভজন গান শিখতে ইচ্ছা করলে তা বরং শিখাতে পারব। উত্তরে অভিভাবকেরা বলেন, ছেলেমেয়েরা বুড়োদের মত ধর্ম্ম সঙ্গীত শিখে কি বোষ্টম সেজে বসবে মশায়! আপনার দ্বারা হবে না, আপনি যে গান জানেন বলছেন তা শেখাতে পাড়াগাঁয়ের লোকেদের কাছে যান, যারা কোন রুচি পরিবর্ত্তনের ধার ধারে না।"

গুরুদেব পুনশ্চ গৃহিণীকে বলিলেন,—আমি তাঁর ঘরানার কতকগুলি গানের কথা জিজ্ঞেস করে দেখলেম যে তিনি সত্যই অনেক কিছু সঞ্চয় করে রেখেছেন। তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, আমি কেবল মাত্র বল্লেম যে আমি সঙ্গীতের একজন সেবক মাত্র। এই কথা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার নামবার স্থানে বাস এসে পড়ায় নেমে পড়লেম, এবং সেই থেকেই মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে আছে। ভাবছি, এখন সকল দেশেই সঙ্গীতের প্রচার বেড়ে চলেছে, অথচ ধ্রুপদের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের প্রচার বাড়ছে না। এই সঙ্গীতের প্রতি মানুষ যদি এতই অনভিজ্ঞ হয়ে থাকে তাহ'লে সত্যকারের প্রচার বাড়ছে কি করে বলা চলে। এত বড় শ্রমসাধ্য সঙ্গীতের সাধনা ও শিক্ষা লাভ করে মানুষের অন্ন জুটবে না, এর চেয়ে সঙ্গীতের ঘোরতর দুর্দ্দিন আর কি হতে পারে! মানুষ যদি রত্নকে ত্যাগ করে' কাঁচকে গলায় পরে' আদর ও সম্মান দেয় তা হলে মানুষের বিচার বুদ্ধি ও রুচির কত দৈন্য যে এসেছে তা এতে করেই বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। ঘি এর মধ্যে যেমন দালদা প্রবেশ করে' তাকে একরকম প্রায় বধ করে এনেছে এবং নিজে ঘি এর মর্য্যাদা নিয়ে সারাদেশকে অধিকারে এনেছে, তেমনি সঙ্গীতেরও অবস্থা হয়ে পড়ল। প্রকৃত ঘি রূপ আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের বিলোপ হতে চলল এর চেয়ে গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি আছে! আজকার

অভিজ্ঞতায় বিশেষ করে মনে হচ্ছে যে, ভাগ্যিস আমি নিঃসন্তান, তা না হলে বোধ হয় আমারও ঐ ব্যক্তির মত কষ্টের অবধি থাকত না।

গৃহিণী বলিলেন,—আচ্ছা, শুনছি, বাইরের থেকে দু একজন ধ্রুপদী গায়ক এখানে এসে বেশ দুপয়সা সসম্মানে রোজগার কচ্ছেন ?

গুরুদেব বলিলেন,—গিন্নি! তুমি জেনে শুনেও একথা বললে? জান না কি তারা যে বাইরে থেকে এসেছে, আর আমরা যে স্থানীয় দেশীয় লোক। "গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না" এ প্রবাদ বাক্য আমাদের দেশেই সৃষ্ট হয়েছে।

গৃহিণী বলিলেন,—দেখ, একটা কথা আমি এতক্ষণ বলতে ভুলে গেছলেম; একজন গেরুয়াবসনধারী-সৌম্যমূর্ত্তি-সাধুব্যক্তি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তোমার আসতে দেরী হবে একথা বলায় তিনি বল্লেন, "কাল কোন্ সময় এলে তাঁর দর্শন পাব?" আমি তাঁকে বেলা ১০টায় তোমার সাধনার পর আসতে বলেছি; তিনি সে সময় আসবেন বলে গেছেন।

গুরুদেব বলিলেন,—তবে কি এই সন্ন্যাসী সেই মঠের মহারাজ হবেন?

গৃহিণী বলিলেন,—বোধ হয় তাই; কি দীপ্তিময় তাঁর চেহারাটি, দেখা মাত্র শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। মুখে যেন জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও সাধনার জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছে মনে হ'ল। ভারতীকুমারের (সেই সঙ্গীতসাধকের নাম) পত্রে যেরূপ বর্ণনা পাঠ করেছি তাতে এখন বেশ মনে হচ্ছে যে তিনি নিশ্চয়ই সেই মহৎ ব্যক্তি।

গুরুদেব বলিলেন,—তুমি তাঁকে ভাল করে আদর অভ্যর্থনা করেছিলেত?

গৃহিণী বলিলেন,—বৈঠকখানায় আলো নিয়ে দরজা খুলে দিয়ে

বিশেষভাবে বসবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেম কিন্তু তুমি নেই শুনে এবং তোমার আসতে বিলম্ব হবে জেনে তিনি আর ভিতরে এলেন না, বোধ হয় আমাদের সংসারের কথা সব শুনেছেন বলে তাই আমাকে গৃহে একক বুঝে তোমার অনুপস্থিতিতে বসে অপেক্ষা করা অনুচিত বোধেই চলে গেলেন।

পরদিবস বেলা প্রায় দশটার সময় সন্ন্যাসীমহারাজ গুরুদেবের বাটিতে উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে গুরুদেব বৈঠকখানা গৃহে বসাইলেন, এবং বলিলেন,—আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান্ ভারতী-কুমারের পত্র সমূহের মধ্যে বর্ণনা ও পরিচয় মত আপনাকে দর্শন মাত্রেই আমি চিনে নিয়েছি যে, আপনি সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন, বহুবিদ্যাবিশারদ, একনিষ্ঠসেবাব্রতী এবং ভারতীকুমারের প্রতি কৃপা ও স্নেহপরায়ণ মঠের সন্ন্যাসীমহারাজ।

সন্ন্যাসীমহারাজ গুরুদেবকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া জোড়হস্তে বলিলেন,—আমি প্রিয় সঙ্গীতসাধকের বিশেষ বন্ধু এবং সেই মঠের সেবাব্রতী একজন সামান্য ব্যক্তি মাত্র ; তার অতিরিক্ত সঙ্গীতসাধকের কাছে যা শুনেছেন তা অতিরঞ্জিত। আপনি আমার সেই পরম বন্ধু সঙ্গীত-সাধকের গুরু, সুতরাং আপনি আমারও গুরুতুল্য। আজ যে চাক্ষুষ দর্শন করতে পারলেম এ আমার পরম সৌভাগ্য। গুরুমাকে আমি এখান হ'তে সভক্তি প্রণাম জানাচ্ছি।

গুরুদেব বলিলেন ;—আমিও আপনাকে আজ দেখতে পেয়ে পরমানন্দ অনুভব কচ্ছি। আপনার সেখানের সমস্ত কুশলাদি ও আমার ভারতী-কুমারের কুশলাদি জানতে বাসনা করি এবং তৎসঙ্গে সেই আদরী মাএরও।

সন্ন্যাসীজী কহিলেন ;—ভগবৎকৃপায় সকলেই কুশলে আছেন।

সঙ্গীতসাধকের শিষ্যা সেই মেয়েটি এখন বেশ অনেকখানি সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেছেন বলে শুনেছি। আমি নিজে অত্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেকদিন সঙ্গীতসাধকের সঙ্গে দেখা করতে সময় পাইনি, তবে আসবার সময় সেখানে লোক পাঠিয়ে সকলের কুশল সংবাদ জেনে এসেছি।

গুরুদেব বলিলেন,—আমার স্ত্রীকে ডাকি, তিনি আপনাকে দেখলে বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দ পাবেন।

এই বলিয়া গুরুদেব তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিলেন। গৃহিনী ইহার জন্য উন্মুখ হইয়াইছিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র সন্ন্যাসীজী উঠিয়া তাঁহাকে নতমস্তকে প্রণাম জানাইলেন। গৃহিণী প্রতিনমস্কার জানাইয়া কহিলেন,—আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনার মত জ্ঞানী, মহৎ ও আদর্শবান্ ব্যক্তিকে স্বচক্ষে দেখলেম। ভারতীকুমার আপনার বিষয় পত্রে কত যে লিখে, তা পড়ে আমাদের পরম আগ্রহ ছিল আপনাকে দেখবার জন্য। ভগবান আজ সেই সাধ পূর্ণ করলেন। আমি আড়াল থেকে আমার ভারতীকুমারের ও অন্যান্য সকলের কুশল সংবাদ শুনেছি। ভারতীকুমারের জন্য আমাদের মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। ভগবান করুন যেন তার ও তার গুরুদেবের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

সন্ন্যাসীজী কহিলেন;—মা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। সঙ্গীতসাধক যে রকম ভাবে দ্রুত সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছেন তাতে মনস্কামনা সিদ্ধ হ'তে দেরী হবে না, এ ধ্রুব বিশ্বাস আমার আছে।

গুরুদেব বলিলেন;—আপনার কথা শুনে আমার আজ মনে আশা ও আনন্দ আসছে যে, আপনার মত উপযুক্ত ব্যক্তির সাহায্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং ভারতীকুমারের সাধনালব্ধ শক্তি এই দু'এর একত্র মিলনে

সঙ্গীতের ও সঙ্গীতজ্ঞদের যথার্থ মহিমা, মর্য্যাদা, প্রচার ও রক্ষা পাবে এবং দেশের মঙ্গল সাধন হবে। যাই হ'ক, এখন বলুন আপনি কবে এসেছেন এবং কতদিন এখানে থাকবেন ?

এই কথা জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় রকম কাল পাথরের সাবেকি থালায় কিছু ফল এবং বাড়ীর প্রস্তুত নারিকেল ও ক্ষীরের মেঠাই ভর্ত্তি করিয়া গুরুদেবের স্ত্রী একহস্তে আসন ও অপর হস্তে ঐ পাত্রটি আনিলেন, আসন পাতিয়া সন্ন্যাসীকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যে স্থানে জলযোগের পাত্রটি রক্ষা করিলেন সেই স্থানটি পূর্ব্ব হইতে গোময় দিয়া মার্জ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ জলযোগ করিতে করিতে বলিলেন,—আমি পরশু এসেছি এবং বোধ হয় আরো দু'চার দিন থাকতে হবে।

আসার উদ্দেশ্যও সংক্ষেপে প্রকাশিত করিয়া বলিলেন,—আমার দু' একটি বন্ধুর সহায়তায় সহরের কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত বর্ত্তমানের সঙ্গীত সম্বন্ধে বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করে' এবং আমাদের উদ্দেশ্য সমূহ প্রকাশ করে' তাঁদের কাছে বিশেষ ভাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। এখনও অনেকের কাছে যেতে হবে। তারপর আমি ভারতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থানে কিছুদিন এই বিষয়ের জন্য প্রচার ও উদ্দেশ্য সমূহ বিবৃত করে' সেখানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করব। ভগবানের কৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করবে, এটুকু আমার ভরসা ও সাহস আছে।

জলযোগ সমাপনান্তে অন্যান্য বিষয়ের দুই চারিটা কথার পর সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—সঙ্গীত সাধকের সঙ্গে পরিচয় হবার দিন থেকে আপনাকে দর্শন ও আপনার সঙ্গীত শ্রবণ করব এই আকাঙ্ক্ষা অন্তরের মধ্যে খুবই করে আসছিলেম। প্রথমটি পূর্ণ হয়েছে, দ্বিতীয়

আশাটি পূর্ণ করবার জন্যে আমি ভরসা পাচ্ছি না বলতে; আমার সে সৌভাগ্য হবে কি? গুরুদেব বলিলেন,—সে কি! এর জন্যে এত সঙ্কোচ কেন! আপনাকে শোনাব না ত কাকে শোনাব, এক্ষুণি শোনাচ্ছি।

এই বলিয়া গুরুদেব সুবৃহৎ তম্বুরাটি নামাইয়া সুর বাঁধিতে বসিলেন। তম্বুরার তার চারিটি বাঁধিতে আধ মিনিটও সময় লাগিল না। ইহা দৃষ্টে সন্ন্যাসীমহারাজ মনে মনে ভাবিলেন, প্রকৃত সুরবোধ হইলে এত শীঘ্রই সুর বাঁধিবার ক্ষমতা আসে।

তম্বুরাটি কাঁধে তুলিয়া লইয়া গুরুদেব বলিলেন,—কোন্ রাগ আপনার শুনতে ইচ্ছে করছে বলুন?

সন্ন্যাসীজী কহিলেন,—ফরমাস্ করা খুবই ধৃষ্টতা, তবে আপনি যখন অনুমতি দিচ্ছেন তখন ভরসা পেয়ে আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছি যে, অপ্রচলিত ছাড়া যে কোন প্রচলিত রাগ আপনি অনুগ্রহ করে শোনান।

গুরুদেব বলিলেন,—অত্যন্ত খুসি হ'লেম আপনার যথার্থ ভাবে রাগের রূপ উপভোগ করবার বিচার শক্তি আছে দেখে।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—যে সকল রাগ ঘরানায় একমত নেই এবং অধিক মিশ্রণে অহেতুক তৈরী হয়েছে, সেই রকম রাগগুলোকে ফরমাস্ দিয়ে শোনা এবং বাহাদুরী দেখাবার জন্যে শোনানকে কি আপনি প্রকৃত ভাব ও রসবোদ্ধাশ্রোতা ও শিল্পীর পরিচায়ক বলে মনে করেন?

গুরুদেব বলিলেন;—কখনই নয়। দেবতার বরে কোন মানুষের যদি বহুশত বৎসর পরমায়ু হয়, আর তিনি যদি একটা রাগকে নিয়ে ততকাল সাধনা করে যান তাহলে আমি মনে করি সেই একটা রাগেরও বিস্তার-শক্তির শেষ হবে না। প্রচলিত প্রধান রাগগুলির মধ্যে কয়টাই বা আমরা যথার্থভাবে আয়ত্তে আনতে পেরেছি! দাবার খেলোয়াড়দের

মধ্যে যেমন এক একজন খেলোয়াড়, কেহ বোড়ের চালে, কেহ বা গজে, কেহ বা ঘোড়ার চালে সিদ্ধ হস্ত হয়ে, সেই এক একটি বলের শক্তি ও কৃতিত্ব দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেন ও খ্যাতি অর্জ্জন করেন তেমনি এক একটি রাগের শক্তি ও তার কৃতিত্ব দেখানর মধ্যেই প্রকৃত শিল্পীকে চেনা যায়। আর দাবার যে খেলোয়াড়রা সব বলগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করে' খেলায় জিত্‌তে ইচ্ছে করেন, তাঁরা যেমন সত্যকারের বড় খেলোয়াড় হ'তে পারেন না এবং বল চালনার শক্তিও তাঁদের যথার্থভাবে লাভ যেমন হয় না তদ্রূপ সমস্ত রাগগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা সঙ্গীতের ব্যবসার ক্ষেত্রে নেমে ঐরূপ ভাবে রাগের শক্তি সামর্থ্য অর্জ্জন করবার সুযোগ ও উপায় লাভ করতে পারিনি। তবে আমার মনে হয় অন্ততঃ প্রচলিত ও বিশুদ্ধ রাগগুলি নিয়ে সারা জীবন তাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

এই কথাগুলির পর গুরুদেব বলিলেন,—আপনি এখানেই মধ্যাহ্নের আহার শাকান্ন দু'টো গ্রহণ করবেন। আমার স্ত্রী অনেক আগেই এ কথা জানাবার জন্যে বিশেষ ভাবে বলে দিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসীজী করজোড়ে বলিলেন,—আমি যেখানে আছি, সেখানে আহারাদি করব এই কথা আমার বন্ধুকে বলে এসেছি, আমাকে আজ ক্ষমা করবেন বরং অন্য দিন আমি এ সৌভাগ্য লাভ করব।

আচ্ছা তাই হবে ;—এই বলিয়া গুরুদেব গৌড়সারং রাগের আলাপ সুরু করিলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরিয়া আলাপ করার পর একখানি চৌতাল, ধামার ও সুরফাঁকতাল তালের ধ্রুপদ গান করিলেন। গুরুদেবের সুমধুর ভরাট কণ্ঠ, তদুপরি রাগের উপর নিবিড়ভাব ও নূতন নূতন বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপায়ণ এবং সাড়ে তিন সপ্তকের অধিক কণ্ঠে সাবলীল ভাবে স্বর সমূহের গতিবিধি শুনিয়া ও লক্ষ্য

করিয়া সন্ন্যাসীজী আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ যাবৎ তাঁহার বাক্যস্ফুরণ হইল না।

ইত্যবসরে পিয়ন আসিয়া একটি খোলা খামের চিঠি দিয়া গেল। খামটির মধ্য হইতে ছাপা হরফে লিখিত পত্রখানি পাঠ করিয়া গুরুদেব দেখিলেন, উহা একটি নাম করা বিশেষ স্থানের প্রতিযোগিতায় বিচারকের স্থান গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ লিপি।

পত্রখানি তিনি সন্ন্যাসীজীর হস্তে প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসীজী উহা পাঠ করিয়া বলিলেন,—এত বড় দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণের জন্যে খোলা পত্রের দ্বারা অনুরোধ জানানর মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষদের কি নির্ভরতা ও নিশ্চিন্ত ভাব থাকতে পারে তা বোঝা গেল না। যে চিঠি পাওয়ার উপর কোন বিশ্বাস স্থাপন করা চলে না, সে চিঠির দ্বারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যাঁরা পাঠাচ্ছেন তাঁরা কৃতার্থ করছেন সেই সকল ব্যক্তিদেরই। অর্থাৎ তাঁদের মান মর্য্যাদা রক্ষার বিষয়ে কোন চিন্তাই কর্ত্তৃপক্ষদের আসে বলে মনে হয় না। সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বিষয়ের চতুর্দ্দিকে পরিস্থিতির এমন দৈন্যদশা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মনে হয় এত বড় বিদ্যায় যাঁরা যথার্থ অধিকার লাভ করেছেন তাঁদের চিনবার ও বুঝবার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আমাদের দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সত্যই নেই।

গুরুদেব বলিলেন,—শুধু বড় বড় প্রতিযোগিতায় বিচারকের ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই এইরূপ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। এ দোষ শুধু দেশের লোকেরই নয়, আমাদের নিজেদেরও আছে। আমরা যদি সকলে মিলে নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন না হই, কেবল কিসে সামান্য অর্থ লাভ হবে ও জনসাধারণের কাছে নানা পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা নাম বাহির করতে পারা যাবে এই বিষয়ই যদি মনে প্রাণে করতে থাকি তা হ'লে যথার্থ মান ও মর্য্যাদার প্রশ্ন কোথায় থাকে বলুন?"

অনেক বিষয়েই আমাদের দুর্ব্বলতার অন্ত নেই। এই দেখুন না কেন, আজকাল সঙ্গীতের বড় বড় উপাধিগুলোর মূল্য বিচারের কোন দরকারই হয় না। যার যা খুসী নিতে পারলেই হ'ল; গ্রহণের শক্তির কোন বিচার বালাই নেই। যে সব উপাধি সঙ্গীতের বহু উচ্চ স্থানে পৌছে প্রবীণ বয়সে নিতেও শঙ্কা আসা স্বাভাবিক বলে মনে হয়, সেই সব উপাধি স্বেচ্ছায় একটা বড় লোকের বা বড় স্থানের নাম লাগিয়ে দিয়ে বাল্যকাল হতে অনেকে নিয়ে চলেছেন, আবার কেহ কেহ চার পাঁচ বছর মাত্র সঙ্গীত শিক্ষা করে' গলায় তখনও সুর বসেনি তাতেই গানের স্কুল, কলেজ থেকে বিরাট উপাধি পেয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে উপাধি আইনতঃ বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক্তিয়ার ভুক্ত, তাকেও যেখান সেখান হ'তে দেওয়া হচ্ছে এবং নিয়ে শ্লাঘা অনুভব করা হচ্ছে। মনের এই সমস্ত ভীষণ দরিদ্রতা থাকার জন্যেই আমার মনে হয় সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ উচ্চস্তরের সমাজের সমপর্য্যায় ও সমমর্য্যাদায় আসতে পারেন নি।

সন্ন্যাসীমহারাজ একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—আপনার কাছে তাঁদের আর এক প্রকার মানসিক অবস্থার কথা শুনে মনে বড় দুঃখ এল। যাই হ'ক দেশের গুণীদের সম্বন্ধে আমি একথা বলতে পারি যে, আমরা বরাবরই আত্মবিস্মৃত জাতি হয়ে থেকে গেছি।

এই বলিয়া তিনি সেই দিনের মত গুরুদেবের কাছে বিদায় চাহিয়া বলিলেন,—আমি যদি আবার পরশু এই সময় আসি তাহলে আপনার সে সময় অবসর হবে কি?

গুরুদেব সাগ্রহে বলিলেন,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমার সময় হবে এবং সে দিন এখানে আহারাদি করতে হ'বে।

সন্ন্যাসীজী সহাস্যে সম্মতি জানাইয়া সভক্তি নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় লইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শক্তিরাণী (আদরী) এখন নিজে সঙ্গীতসাধকের সমস্ত পরিচর্য্যার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

মধ্যাহ্নে সঙ্গীতসাধকের আহারের পর তাঁহার প্রসাদান্ন ভক্তি সহকারে একটি শাল পত্রে রক্ষা পূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি নদীতে পরিষ্কার করিয়া আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেয়; এবং তৎপরে সেই প্রসাদ নিজ গৃহে লইয়া গিয়া অগ্রে গ্রহনান্তর পরে গৃহের রন্ধন আতপ অন্ন ভোজন করে। শক্তিরাণীকে এখন দেখিলে মনে হইবে যেন, একটি গৈরিক-বসনা, জ্যোতির্ম্ময়ী যোগিনী ও ভক্তিনিষ্ঠার প্রতিমূর্ত্তি।

সঙ্গীতসাধকের কুটিরের পশ্চাৎদিকের বিস্তৃত খোলা জায়গার কিয়দংশে শক্তিরাণী নিজ হস্তে একটি ছোট ফুলের বাগান তৈয়ারী করিয়াছে এবং তাহার মধ্যস্থলে মৃত্তিকার দ্বারা একটি বৃত্তাকার বেদী নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে। সেই বেদীর উপরে ভাববিহ্বলা হইয়া মাঝে মাঝে গান গাহিতে থাকে।

* * * * *

একদিন বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় মঠের সদর দ্বারে একটি বৃহদাকার মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আওয়াজ শুনিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ বহির হইয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই জমিদারবন্ধু ও তাঁহার কন্যা সাবিত্রীদেবী গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সন্ন্যাসীজী

তাঁহাদিগকে বিশেষ আদরের সহিত বলিলেন,—আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিলেম।

জমিদারমহাশয় সবিনয় নমস্কার জানাইলেন, এবং সাবিত্রীদেবী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

জমিদারমহাশয় বলিলেন,—এখানে আর এখন বিলম্ব করবেন না, চলুন নিয়ে সঙ্গীত সাধকের কাছে।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—তাই হ'ক, সেখানেই যাওয়া যাক।

এই বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া সাধকের কুঠিরাভিমুখে পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। সাধকের আশ্রম খুব বেশী দূরে নয়। যাইতে যাইতে ক্ষুদ্র নদীটির নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র তাঁহারা এক অতি অপূর্ব্ব সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। সাবিত্রীদেবী এতক্ষণ সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ ঐ সঙ্গীত কর্ণে যাওয়ামাত্র থমকিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা ও অবাক হইয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রায় দৌড়াইয়া সেই সুরকে অনুধাবন করিয়া চলিলেন। ক্রমশঃ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই যেন তাঁহাকে সেই সুরের আকর্ষণে আবিষ্ট করিয়া গতিশক্তি রহিত করিয়া দিতে লাগিল। যাহাই হউক, কোন রকমে নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি বুঝিলেন যে, কুটিরের পশ্চাৎদিক হইতে সঙ্গীতের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। তখন সেইদিকে যাইয়া দেখিলেন বেদীর উপর আলুলায়িত কেশে গৈরিকবসন পরিহিতা একটি দেবীরমত মূর্ত্তিময়ী নারী গান গাহিতেছে।

সাবিত্রীদেবী সেই স্থানে একটু অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

শক্তিরাণী বসন্তকালের প্রাকৃতিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া একটি জৌনপুরী রাগের খেয়াল গান করিতেছিল।

গানটির কথাগুলি এইরূপ;—

বাগমেঁ বৈঠ কোয়েলিয়া
ফাগুন দিনমেঁ কো কো কো কর।
মোর নাচত পাপিহাঁ বোলত
নব নব সুমন পর মধুপ গুঞ্জার।
অ্যায়সোঁ বখতমেঁ জমনা কিনার
বাঁশুরী বজাওয়ত নন্দ-কুমার
শুন ধুন চরাচর থির হো গয়ী
রাধা সখিয়ন আওয়ত দোর॥

শক্তিরাণী কিয়ৎক্ষণ পরে যখন গান ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সাবিত্রীদেবী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—ভাই তুমি কে? দেবী না মানবী?

শক্তিরাণী হঠাৎ এই স্থানে এই রকম একজন পরমাসুন্দরী নারীকে দেখিয়া এবং তাঁহার এইরূপ নিবিড় সম্ভাষণে হতবাক ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল। পরে শক্তিরাণী বলিল,—আমি স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র জাতির দীনদরিদ্রের মেয়ে। আপনি কোন দেবী কিনা তাই দয়া করে বলুন!

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—আপনি জাতি ও দীন দরিদ্রের কথা আমাকে বলে বড়ই লজ্জা দিলেন। আপনাকে দেখামাত্র মনে হল আপনার মধ্যে কোন জাতিরই ছাপ নেই। অর্থাৎ আপনি সমস্ত জাতির উর্দ্ধে। আপনি নিশ্চয়ই সঙ্গীতসাধকজীর কাছে বহুদিন ধরে' গান শিখছেন নয়? এমনভাবে কি করে গাইতে শিখলেন্ ভাই? আপনার গান শুনে আমার আজ মনে হচ্ছে যে, আমি এতদিন ধরে' সঙ্গীতের সাধনা সামান্য যা করে আসছি তা যথাযথভাবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে করিনি। সঙ্গীতকে গর্ব্বের বস্তু ও অর্থের দ্বারা ক্রয়সাধ্য এই ভেবে আসছি বলেই বোধ হয়

আপনার মত তার আধ্যাত্মিক প্রাণ বস্তুর সন্ধান লাভ করতে পারিনি।

শক্তিরাণী সবিনয়ে বলিল,—আমি কিছুই এখন শিখি নাই দিদি! যদি আপনি প্রভুজীর গান শুনেন তাহ'লে আমি মনে করি সঙ্গীতের যথার্থ রাগ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আপনার উপলব্ধি হ'বে। দিদি, আপনিও তাহ'লে গানের চর্চ্চা করেন দেখছি। আপনার পরিচয়টি দয়া করে আমাকে দিন এবং আপনার নামটি কি বলুন না?

সাবিত্রীদেবী পরম পুলকিতা হইয়া বলিলেন,—আপনি আমাকে দিদি বলে' ডেকে গর্ব্বান্বিতা করলেন। আজ হ'তে তুমিও ভাই আমার সত্যকারের পরম আদরের বোনের মত হ'লে।

এই বলিয়া সাবিত্রীদেবী শক্তিরাণীকে নিবিড় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাহার গণ্ডে একটি চুম্বন করিলেন। শক্তিরাণী তখন ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল।

সাবিত্রীদেবী নিজ পরিচয় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—আমার নাম সাবিত্রী।

শক্তিরাণী বলিল,—আহা কি সুন্দর নাম! ভারতের সমস্ত পরমপূজ্যা আদর্শ নারীদের আমি প্রতিদিন পূজা করি ও মনে মনে নাম জপ করি। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঠিক ওই নামের আদর্শযুক্তা নারী হতে পারবেন। আজ আমি নিজেকে ধন্যা মনে করলাম এই ভেবে যে, আপনি আমার পূজনীয়া দিদির মত হলেন এবং আমিও আপনার দয়ার পাত্রী একটি অতি ছোট্ট বোন হবার সৌভাগ্য লাভ করলাম। শক্তি-রাণীর নিকট এবম্বিধ মর্ম্মস্পর্শী ও সুমধুর শ্রদ্ধাযুক্ত বিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সাবিত্রীদেবীর হৃদয় তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"আমরা ভাষাকে কি রকম ভাবে ব্যবহার করে আসছি, আর এই অরণ্যবাসিনী মেয়েটি কি রকম

উচ্চস্তরের ভাবযুক্ত হ'য়ে ভাষা ব্যবহার করে' মনকে গলিয়ে দিচ্ছে। সত্যই জীবন যদি ধর্ম্মের সংস্পর্শে ও তার প্রতি নিষ্ঠা ভক্তি নিয়ে গঠিত না হয় তাহ'লে মনে হয় জীবনে যথার্থ কিছুই লাভ হবে না। সন্ন্যাসী-জ্যেঠামহাশয়ের কাছে সেদিন আমার চরিত্র সংশোধন হয়ে জ্ঞানলাভ হয়েছিল আর আজ আমার এই মেয়েটির কাছে জীবনের যাত্রা পথের দিক নির্ণীত হ'য়ে গেল। সত্যই আজ আমার আর একটি সৌভাগ্যের দিন।"

শক্তিরাণী বলিল,—আপনি কি ভাবছেন দিদি? আপনাকে কর-জোড়ে অনুরোধ কচ্ছি, দয়া করে আমাকে একটা গান শোনান্ না!

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—বোন, আমি যখন তোমার মত করে সত্যিকারের গান গাইতে পারব তখন শোনাব। তুমি বরং আমার সে সুদিন ও সৌভাগ্য লাভের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাও; তোমার প্রার্থনাতেই যদি আমি সফলকাম হ'তে পারি। নচেৎ আমার কোন বল ভরসা আছে বলে বিশ্বাস করি না।

শক্তিরাণী বলিল,—দিদিরাণী, আপনি আমার অতি ক্ষুদ্র শক্তিকে অত্যন্ত বাড়িয়ে বলে বড়ই লজ্জা দিচ্ছেন। আপনার অন্তরে যদি আকুল আগ্রহ এসে থাকে তা হ'লে সেই পরমপুরুষের কানে পৌঁছতে দেরী হবে না। আপনার পিতাজী ও মহারাজজী অনেকক্ষণ হবেন প্রভুজীর কাছে এসে গেছেন। চলুন আমরা সেখানে এখন যাই।

এই বলিয়া শক্তিরাণী সাবিত্রীদেবীর কটিদেশ জড়াইয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে সেখানে লইয়া চলিল। নিবিড় বেষ্টনে উভয়ে আবদ্ধ হইয়া যখন চলিলেন তখন সেই গমন শোভার নির্ম্মল দৃশ্য কবি ও শিল্পীর অন্তরের একটি ভাব-সহায়ক বস্তুর মত হইল।

উভয়ে সাধকের কাছে উপস্থিত হইলে পর সাধকজী সাবিত্রীদেবীকে সসম্মানে ও শক্তিরাণীকে সস্নেহে বসিতে বলিলেন।

সাবিত্রীদেবী সঙ্গীতসাধকের অপূর্ব্ব সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট ও প্রকৃত সাধকের মত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিতা ও মুগ্ধা হইয়া গেলেন। তাঁহার কাছে যাইয়া সশ্রদ্ধ প্রণাম করিতে উদ্যত হইবা মাত্র সাধকজী বলিলেন,—আহা করছেন কি! থাক্ থাক্ প্রণাম করতে হ'বে না। এই বলিয়া তিনিও প্রতি নমস্কার জানাইলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ এই জমীদারমহাশয় ও তাঁহার কন্যার বিস্তৃত পরিচয় পূর্ব্বাহ্ণে সাধককে পত্রের দ্বারা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং এখানে আসিবার পূর্ব্বে সাধকের কাছে তাহার প্রত্যুত্তরে সম্মতি লাভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং নূতন করিয়া সাধককে ইঁহাদের পরিচয় জানিয়া লইবার প্রয়োজন হইল না।

জমীদারমহাশয় সাধককে দর্শন করিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত ও আহ্লাদিত হইলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। জমীদারমহাশয় সাধককে বলিলেন,—আমি একটা কথা আপনাকে নিবেদন করতে পারি কি?

সাধক বলিলেন,—আপনি কি জানতে চান তা নিঃসঙ্কোচে বলুন।

জমিদারমহাশয় বলিলেন,—আপনার বংশ ও নিজের পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানবার বাসনা হচ্ছে। দয়া করে যদি বলেন তা হলে মনের এই আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হয়।

সন্ন্যাসীজীও বলিলেন,—আমারও অনেকদিন হ'তে এবিষয়ে আগ্রহ ছিল, আজ বন্ধু এই প্রসঙ্গ তুলে ভালই করলেন। এই কথায় সাধকের মুখে করুণ ভাব দেখা দিল। পরে ওষ্ঠপ্রান্তে একটু মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল এবং তিনি বলিতে লাগিলেন,—আমার বংশ এবং নিজের পরিচয় এমন কিছু মূল্যবান নয় যে, তা শুনিয়ে আপনাদের সুখী করতে পারব; বরং আপনারা দুঃখই হয়ত পাবেন। যাই হ'ক আপনাদের ইচ্ছার জন্যে

আমি সংক্ষেপে জানাচ্ছি।

ঘটনা শুনিবার জন্য সাবিত্রী ও শক্তিরাণী অধিকতরভাবে অধীর আগ্রহের সহিত উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

সাধক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আমার জন্মভূমি এই পশ্চিম-বঙ্গেরই একটি বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রতিষ্ঠাশালী গ্রামে। আমি ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। আমার পিতামহ এই বঙ্গেরই একস্থানের মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। সেই মহারাজের গানে অত্যন্ত সখ ছিল। তাঁর কাছে যে খাঁসাহেবওস্তাদ ছিলেন তাঁর অন্তর ছিল অতি উদার এবং তিনি বিশেষ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন চরিত্রবান গুণীধ্রুপদী ছিলেন। ওই ওস্তাদের গান শুনতে শুনতে আমার পিতামহের ইচ্ছা ও আগ্রহ হ'ল তাঁর দুটি পুত্রকে সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্যে। তিনি প্রথমতঃ বঙ্গের একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গুণী ধ্রুপদ গায়কের কাছে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। পরে মহারাজের কাছে এই কথা বারম্বার শুনতে থাকলেন যে, সঙ্গীত শিক্ষা করতে হ'লে মুসলমান গায়কের কাছে শেখানর ব্যবস্থা করাই উচিত; নচেৎ যথার্থ ঢংএর গান শিক্ষা লাভ হয় না। তখন পিতামহ সেই ওস্তাদকে অনুরোধ জানালেন একজন ভাল মুসলমান গায়ক পশ্চিম থেকে আনিয়ে দেবার জন্যে: সেই ওস্তাদ তখন তাঁর পরিচিত পশ্চিমের এক রাজদরবারের ওস্তাদকে সবিশেষ জানিয়ে পত্র লিখেন। সেখানকার ওস্তাদ একজন নামকরা খেয়াল গায়ককে পাঠিয়ে দেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমার পিতামহ দেশে এনে আমাদের বাগানবাড়ীতে ওস্তাদের থাকবার ও আহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ের ব্যবস্থা এবং মোটা মাইনে ধার্য্য করে দিয়ে আমার পিতা ও খুড়ো মহাশয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করে' রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই শিক্ষক নির্ব্বাচন আমার পিতামহীর একেবারে মনঃপূত হয়নি। তিনি পূর্ব্বের সঙ্গীত গুরুকে খুব মান্য

করতেন। সেই গুরু যখন বিদায় নিয়ে যান, তখন তিনি তাঁর কাছে কেঁদে বলেছিলেন-—"কাজটা মোটেই ভাল হ'ল না। আমার মন কি জানি কেন বড়ই ভয়াকুল হ'য়ে পড়েছে। অন্তর বলছে যেন আমার ছেলেদের ভীষণ অমঙ্গল হ'বে। আপনাকে সরিয়ে দেওয়ার অভিশাপ যেন তাদের উপর লাগবে বলে আশঙ্কা হচ্ছে।"

এই কথা শুনে সেই গুরু বলেছিলেন,—"মা, আপনি দুঃখিতা হবেন না। সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি এর জন্যে কিছু মাত্র দুঃখিত নই। আপনার পুত্ররা যেন যথার্থ ভাবে সঙ্গীতের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে' মনে প্রাণে ও বিদ্যায় উন্নতি লাভ করেন এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে জানিয়ে চললাম। আর আমি কয়দিনই বা আপনার ছেলেদের শিখিয়েছি যে, তার জন্যে আমার দাবি, অভিমান ও দুঃখ আসতে পারে।" এই বলে তিনি পিতামহীকে প্রণাম জানিয়ে চলে যান। যাবার সময় আমার পিতামহী তাঁর নিজের সঞ্চিত কিছু অর্থ তাঁকে দিতে গেছলেন, কিন্তু সেই আদর্শবান গুরু বিনীত ভাবে নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

এই সময় আমার বাবার বয়স ছিল কুড়ি এবং কাকার ছিল আঠারো। কয়েক মাস পরে আমার পিতামহ হঠাৎ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীতে পরলোকগমন করেন। পিতামহ তাঁর জীবনে বিপুল বিষয় সম্পত্তি করেছিলেন। পিতামহী অকস্মাৎ নিদারুণ শোক পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়েন। তখন তাঁর বড় ভাই এসে বিষয় সম্পত্তি দেখা শুনা করতে থাকেন এবং অচিরেই তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে পড়েন।

পিতামহের মৃত্যুর এক বৎসর পরে আমার বাবার বিবাহ হয়। মাতার বয়স তখন চৌদ্দ পনের হবে। বিবাহের দুই বৎসর পরে আমার জন্ম হয়। মা আমার বড় ধার্ম্মিকা, নিষ্ঠাবতী ও আদর্শপরায়ণা নারী ছিলেন। তাঁর খুব বড় এক পণ্ডিত বংশে জন্ম হয়ে ছিল।

খাঁসাহেবের চারিত্রিক ও নানারূপ পানদোষ যে ছিল এ কথা পূর্ব্বে বিশেষভাবে কেহ জানতে পারেন নি। পিতামহের মৃত্যুর পর খাঁসাহেব তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করতে লাগলেন। পিতা ও পিতৃব্যকে সঙ্গীত শিক্ষাদানে কৃপণতার সুযোগ নিয়ে তাঁদের কাছ থেকে নানা ভাবে অর্থ আহরণ করতে লাগলেন, এবং তৎসঙ্গে তাঁদের সর্ব্বনাশ সুরু করে দিলেন পানদোষ ইত্যাদি ধরিয়ে। এরূপ ভাবে ছ, সাত বছরের মধ্যে পিতার সব রকম ভাবে নৈতিক অধঃপতন হয়ে গেল এবং বাগানবাড়ীটি একটি নরকে পরিণত হ'ল। কাকা আমাকে বড় ভালবাসতেন। তিনি ছোটথেকে আমাকে গান শেখাতে আরম্ভ করেছিলেন। আমি এক একদিন দিদিমা ও মাকে লুকিয়ে বাগান বাড়ীর পিছনে গাছের আড়াল থেকে গান শোনার আকর্ষণে দাঁড়িয়ে থাকতেম উৎকর্ণ হ'য়ে। যখন আহা বাহবা ইত্যাদি জড়িত গলার চীৎকার শুনতেম তখন ভয় পেয়ে পালিয়ে আসতেম।

পিতামহীর সেই ভাই সর্ব্বময়কর্ত্তা হয়ে কু-অভিসন্ধিতে বাবা ও কাকার সব রকম অনিষ্টকারী খেয়ালের অর্থ জোগান দিয়ে তাঁদের সর্ব্ব-নাশের পথ পরিষ্কার করে দিতে সহায়তা করতে থাকলেন এবং নিজে জমীদারীর আয় ও জমী জায়গা আত্মসাৎ করতে লাগলেন। পিতামহী অতি সরল প্রকৃতির এবং সমস্ত লোকের উপরে বিশ্বাস পরায়ণা ছিলেন। এরকম ভাবে কিছুকাল চলার পর যখন তিনি পুত্রদ্বয়ের অধঃপতনের সংবাদ জানতে পারলেন তখন অত্যন্ত মর্ম্মাহতা হয়ে ৺কাশী চলে যান এবং সেখানে গিয়ে কিছুকাল পরেই শোকে, দুঃখে, দেহরক্ষা করেন।

আমার মা, বাবা ও কাকাকে সংযত ও সৎপথে আনবার জন্যে বহু রকম ভাবে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থকাম হন। মাও এই দুঃখে ও ভাবনায় দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি আমার সুশিক্ষার ভার দেন গ্রামের একজন বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বৃদ্ধ

পণ্ডিতের কাছে। সেই পণ্ডিতমহাশয় আমাকে পুত্রাধিক স্নেহে শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও ধার্ম্মিক জীবন যাপনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ও সদুপদেশ দান করে' লেখাপড়া শেখাতে থাকেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গীতের যথার্থ মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও বহুবিধ উপদেশ দিতে লাগলেন। এই রকম ভাবে তাঁর কৃপায় আমার শিক্ষার ভিত্তি ধর্ম্মের উপাদানে গড়ে উঠতে লাগল।

আমার যখন চৌদ্দ বছর বয়েস তখন পিতাকে নানা ব্যাধিতে আক্রমণ করে' অকালে মৃত্যুর কবলে ঠেলে দেয়। আমি সেই বয়সে পিতৃহারা হ'লেম। কাকা বিবাহ করে সংসারী হলেন না। তাঁর খাঁসাহেবের প্রতি এত গুরু ভক্তি ছিল যে, হিন্দুর যা অভক্ষ্য তাও সেই খাঁসাহেব গুরুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ না করে কোন খাদ্য গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, "গুরু যে জাতের হবেন শিষ্যেরও ধর্ম্মতঃ সেই জাত সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তে যাবে। নচেৎ গুরুকে অস্বীকার করা হয় এবং তাতে অধর্ম্ম ও মহাপাপ হয়, কাজেই আমার হিন্দুত্ব সেই দিনই চলে গেছে যে দিন আমি মুসলমান ওস্তাদের কাছে সঙ্গীতে দীক্ষা নিয়েছি। সঙ্গীতের গুরু এবং মন্ত্র গুরুর মধ্যে কোন তফাৎ থাকতে পারে না, বরং সঙ্গীতের গুরু আরও উচ্চস্তরের গুরু।" এইরূপ ন্যায়সঙ্গত বিশ্বাসের দরুণ তিনি নিজেকে ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীই মনে করতেন। বাবা মারা যাবার পর দেখা গেল আমাদের অভিভাবক বাবার সেই মাতুলের কৃপায় জমীদারীর আয়ের প্রায় সাড়েপনরআনাই শেষ হয়ে গেছে। খাঁসাহেব এবং কাকার কাছে আর সেরূপ অর্থের যোগান না আসায় তাঁরা একদিন কোথায় চলে গেলেন; সেই থেকে কাকার আর কোন সংবাদ জানা যায়নি। মা আমার বহু রকম দুঃখ, যন্ত্রনা ও শোক পেয়ে আর সহ্য করতে না পেরে আমাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে মৃত্যুর কোলে চির শান্তি লাভ করলেন। আমি শোকে, দুঃখে, এত কাতর হয়ে পড়ি যে, তা দেখে

আমার সেই পণ্ডিতমশায় আমাকে বুকে করে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে রেখে সান্ত্বনা দেন এবং বহুবিধ শিক্ষার মধ্যে বিশেষ করে' এই প্রেরণাই আমাকে দিতে থাকেন যে, যে পবিত্র সঙ্গীতকে কলুষিত করে' বংশের চরম দুর্গতি এনে দিল, আমি যেন সেই সঙ্গীতকে কলঙ্ক মুক্ত করে' যথা-স্থানে তার পবিত্রতা রক্ষা পূর্ব্বক বংশের মহাপাপ ঘুচাই। এরকম ভাবে তাঁর স্নেহেরনীড়ে দু' তিন বছর কেটে গেল। বলতে ভুলে গেছি, মায়ের মৃত্যুর কিছু দিন পরেই বাবার মাতুলকে বিতাড়িত করে দিয়ে-ছিলেম; অবশ্য তিনি তার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন।

তারপর একদিন আমি নিকটবর্ত্তী সহরে গিয়ে একটি পরিচিত উকিলের কাছে আমার মনের ইচ্ছা সবিনয়ে নিবেদন করি। তিনি আমার বাসনানুযায়ী একটি দলিল লিখে দিয়ে তা রেজিষ্টারী করে দেন। দলিলটিতে যে কথা লেখা আছে তার সারমর্ম্ম এইরূপ,—"আমি আমার দেশের বসত্‌বাটীটি দাতব্যচিকিৎসালয়ের জন্য আজ স্থানীয় গভর্ণমেণ্টকে দান করলেম। আমার বিষয় সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের যে টুকু আয় আছে উপস্থিত বার্ষিক চার হাজার টাকার মত হবে। ঐ টাকা হ'তে মাসিক আমার গ্রামের সেই পণ্ডিতমহাশয়কে প্রণামী স্বরূপ ত্রিশটি, আমাকে আমার অবস্থিতির ঠিকানায় মাসিক ত্রিশটি এবং আমার পিতামহের আমলের বৃদ্ধ ভৃত্যকে মাসিক কুড়িটি করে টাকা নিয়মিত ভাবে দিতে হবে। বাকী যা থাকবে তা চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয় হবে। আর এর প্রধানপরিচালক হিসেবে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা ও সাহায্য করবেন আমার ওই পণ্ডিতমহাশয় যতদিন জীবিত থাকবেন।"এই দলিলের একটি খসড়া পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিই এবং পত্রে আমার গমন উদ্দেশ্য সমস্ত জানিয়ে তাঁর চরণে শত সহস্র ভক্তিযুক্ত প্রণাম নিবেদন ও আশীর্ব্বাদ কামনা করে সামান্য কয়েকটি টাকা সম্বল নিয়ে

সেখান হ'তে মহানগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ি। পূর্ব্বোক্ত সহরের একটি লোককে সঙ্গী হিসেবে পাই। তিনি মহানগরীতে পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে চলে যান। আমি বিরাটসহরে এসে দিশেহারা হ'য়ে পড়ি, এখানে সেখানে ঘুরতে থাকি, সামান্য কিছু খাবার একবেলা কিনে খাই আর যেখানে রাত্রি হয় সেখানের কোন গৃহের দাওয়ায় বা ফুটপাতে রাত্রি কাটাই এবং সর্ব্বদা ভগবানকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে থাকি সদ্‌গুরু লাভের জন্যে। এরকম ভাবে কিছুদিন গত হবার পর অর্থ প্রায় ফুরিয়ে আসতে থাকায় কোন রকমে মাত্র দু'এক পয়সার মুড়ি খেয়ে দিন কাটাতে থাকি। রাস্তায় সম্ভ্রান্ত লোককে দেখতে পেলেই তাঁদের জিজ্ঞেস করি সঙ্গীতগুরুর সন্ধান পাবার জন্যে। কোন কোন ব্যক্তির মুখে দু চার জনের সন্ধান পেয়ে সেখানে যাই এবং মনের বাসনা জানাই কিন্তু তাঁরা কেউই আমল দিতে চাইলেন না। আমারও কি জানি কেন তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনে যোগ্য গুরু বলে মনে হল না। তারপর একদিন ভগবান আমার আকুল প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন। আমি একটি নির্জন জায়গায় বসে কাকার শেখান একটি খেয়াল গান কচ্ছি, সে সময় আমার ঈশ্বর তুল্য এই গুরুদেব সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমার কণ্ঠ শুনে এবং আমার মনের বাসনা জেনে ও সে সময়কার শরীরের অবস্থা দেখে শিশুর মত কেঁদে ফেললেন। তারপর একরকম প্রায় কোলে করেই তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে গুরুমাকে সকরুণ উচ্চৈস্বরে ডেকে বললেন,—"ওগো শুনছ? আজ আমি একটি হারানিধি কুড়িয়ে পেয়েছি এই নাও।" গুরুমা ছুটে এসে আমার মুখপানে তাকিয়ে সেই অন্তর্দ্রষ্টা দেবীরূপা নারী আমাকে তাঁর কোলে জড়িয়ে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। গুরুদেব আমার সমস্ত পরিচয় দিলেন গুরুমাকে। গুরুমা চোখ মুছতে মুছতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে হাত মুখ ..ধুতে জল

দিলেন এবং থালায় করে খাবার এনে কাছে বসিয়ে খাওয়ালেন। অনেক দিনের পর সে দিন পেট ভরে মায়ের কাছে বসে খাওয়ার মত করে খেয়ে তৃপ্তি পেলেম। তারপর ভাল দিন দেখে গুরুদেব আমার শিক্ষা আরম্ভ করে দিলেন। গুরুদেব ও গুরুমায়ের আমার প্রতি যত্ন স্নেহ ও দয়া মায়ার কথা বলে' কত আর জানাব। আমার মনে হয় বর্ত্তমান পৃথিবীতে এরকম মানুষ খুব দুর্লভ। যাই হ'ক, তারপর আমার ঠিকানা পেয়ে প্রতিমাসে সেই টাকা মণিঅর্ডারের দ্বারা নিয়মিত ভাবে আসতে লাগল। আমার গুরুদেবকে সেই টাকা তাঁর চরণে কোন রকমেই কোন দিন দিতে পারিনি। তিনি বলতেন, "তুই বাবা আমার সঙ্গীত সাধনায় যে টুকু জ্ঞান লাভ হয়েছে তার ধারক বাহক হবি তা হলেই আমার তোর কাছে চরম গুরুদক্ষিণা লাভ করা হবে।" অথচ তাঁর সংসার খরচের মত আয় মোটেই বেশী ছিল না। আমি গুরুমাকে অন্য প্রকারে দ্রব্যাদি আনিয়া দিয়া সানুনয়ে ও করজোড়ে গ্রহন করবার জন্যে অনুরোধ করতেম। না গ্রহন করলে আমি অন্তরে খুব কষ্ট পাব একথা তিনি নিশ্চিত জেনে কৃপা করে কিছু কিছু গ্রহন করতেন, তবে এ জন্যে আমাকে খুব নিষেধ করে বলতেন, "বাবা তুই এই টাকা সঞ্চয় করে রাখ্ সময়ে বিশেষ কাজে লাগবে।" আমার কিন্তু কর্ত্তব্যে সেটা মোটেই মনঃপূত হত না। গুরুর কৃপায় শিক্ষা গ্রহণে আমার পারগতা দেখে গুরুদেব যেন বিদ্যা ঢেলে দেবার জন্যে ব্যাকুল হতেন। এ স্থলে গুরু মায়েরও একটু পরিচয় না দিলে বলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি নিজে খুব বিদ্বান ও নিষ্ঠাবান বড় বংশের মেয়ে এবং সংস্কৃতে এম্, এ পাশ। তাঁর পিতা আমার গুরুদেবের মহান চরিত্র এবং সঙ্গীতে একজন যথার্থ গুণী ও পণ্ডিত জেনে জামাতা করতে মনস্থ হয়ে কন্যার সম্মতি জানতে গিয়ে বুঝেন যে, গুরুদেবকে সঙ্গীত শ্রবণের জন্যে মধ্যে মধ্যে আহ্বান

করা কালীন তাঁর কন্যা তাঁকে দর্শন করে' মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করেন, এবং কন্যা তাঁকে পতিরূপে পেলে পরম সৌভাগ্যশালিনী মনে করবেন একথাও তাঁর মাতার নিকট জানতে পারেন। গুরুমা বর্ত্তমান যুগের এক আদর্শবতী নারী। তিনি যে নিজে একজন উচ্চ শিক্ষিতা একথা তাঁকে দেখলে কেউ মনেই করতে পারবে না। অর্থাৎ কোনরূপ গর্ব্বের ছাপই তাঁর মনে ও বাহিরে প্রকাশিত হয় না। ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দেননি যে, তিনি এম্, এ, পাশ। স্বামীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাপ নেই বলে' পড়াশুনা সম্বন্ধে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আমি এখানে এসে ওঁর দয়ায় যৎসামান্য কিছু লিখতে পড়তে পারি মাত্র।" সংসারের সমস্ত কাজ এবং দীন, দরিদ্র, অতিথি অভ্যাগতের সেবা ইত্যাদি সকল কর্ম্মই নিজে পরম আনন্দের সহিত করে থাকেন। গুরুমা বলেন, "আমি সংসারের কাজ কর্ম্ম করে এবং ওঁর সেবা ও তোমাদের আদর যত্ন করে যেমন তৃপ্তি পাই এমন তৃপ্তি আমি জীবনের অন্য কোন বিষয়ের কাজে পেতেম না। এই সংসারের সেবাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মের ও রীতি নীতির মানদণ্ড।" গুরুমার বেশভূষায় বিলাসের চিহ্ন মাত্র নেই। হাতে কেবল দুখানি লাল শাঁখা ও একটি নোওয়া মাত্র। মোটা বসন পরিধান করে থাকেন, তাতেই তাঁকে প্রকৃত দেবীর মত দেখায়। গুরুদেব ও গুরুমার কাছে থেকে আমি পিতামাতার অভাব ভুলে গেছলেম। এরপরে আমার বিষয় সন্ন্যাসীজী সবই জানেন এবং তাঁর কাছে আপনারাও সব শুনে থাকবেন মনে করি। কাজেই এর অধিক আমার আর কিছু বলবার নেই।

সাধকের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া দুঃখে ও বিস্ময়ে সকলের মন ভরিয়া গেল। বহুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে সাবিত্রীদেবী ও শক্তিরাণী মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুছিতে ছিলেন। তাঁদের অন্তর আজ সাধকের প্রতি আরও

নূতন করিয়া গভীর ভাবে মমতায় ভরিয়া গেল।

সকলে অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর জমিদারমহাশয় সাধককে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গীতসাধনার মধ্যে তাঁহার কোন কল্পিত ভবিষ্যত উদ্দেশ্য কিছু আছে কিনা।

এই প্রশ্নের বিষয় দুইটির সম্বন্ধে সন্ন্যাসীমহারাজের অনেক দিন হইতে জানিবার বাসনা ছিল কিন্তু পাছে তাঁহার প্রিয়বন্ধু সঙ্গীতসাধক কিছু মনে করেন, এইজন্য তাঁহাকে এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই বলিয়া পূর্ব্বাহ্নে জমীদারমহাশয়ের দ্বারা উত্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাধক বলিলেন,—আমি কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়েই সঙ্গীত সাধনায় ব্রতী হয়েছি। তার মধ্যে প্রথমতঃ এইরূপ ভাবে জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে ও সাধনায় সঙ্গীতের অধ্যাত্ম শক্তিকে যদি লাভ করতে পারি তা হ'লে তার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করব। আর একটি প্রধান কামনা আছে তা এই যে, পূর্ব্বে যেমন মুনি ঋষিরা শিষ্যদের আশ্রমে রেখে ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, তেমনি ভাবে সঙ্গীত শিক্ষা লাভের জন্য যদি ব্যবস্থা করতে পারি তা হলে আমার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে মনে করব। এ বিষয়ে আমার পরম হিতৈষী বন্ধু সন্ন্যাসীমহারাজের কাছে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতি পাব মনে করে রেখেছি। অবশ্য আশ্রম তৈরীর জন্যে অর্থের প্রয়োজন আছে। দেখা যাক্, ভগবান যদি কৃপা করেন তা হ'লে গুরুদেবের ও আমার ঐকান্তিক কামনা পূর্ণ হবেই। গুরুর আশীর্ব্বাদ বাণী বিফল হবে না, এ ধারণা আমার দৃঢ় আছে। এই আমার দুইটি উদ্দেশ্যের কথা আপনাদের কাছে নিবেদন করলেম।

সাধকের কাছে এই কথা শুনিয়া সেই দিনকার মত সকলে বিদায়

লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীমহারাজ তাঁহার সম্প্রতি মহানগরীতে গমন ও সেখানের কার্য্যাবলী এবং গুরুদেবের ও গুরুমায়ের সঙ্গে সাক্ষাতাদি সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। উহা শুনিয়া সাধক পরম আনন্দিত ও পরিতোষ লাভ করিলেন। সকলের সঙ্গে কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত সাধক অগ্রসর হইয়া বিদায় অভিবাদন জানাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শক্তিরাণী তাঁহাদের সঙ্গে মঠ পর্য্যন্ত যাইয়া জমীদারমহাশয় ও সাবিত্রীদেবীকে বিদায় অভিনন্দন ও সকলকে সভক্তি প্রণাম এবং আসিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। সাবিত্রীদেবী শক্তিরাণীকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—বোন্! তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, মন আমার তোমার কাছেই পড়ে রইল। (মনটাকে যে আর একজনের কাছে গচ্ছিত রাখিয়া চলিলেন সেইটার কথা তাঁহার অন্তরের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিয়া গেল।) আবার শীগ্‌গীর তোমার কাছে এসে জুটব, আজ ভাই তাহলে আসি,—কেমন?

জমীদারমহাশয় নিজের কন্যার মত ঠিক সেই রকমভাবে শক্তিরাণীর মাথায় হাত বুলাইয়া পরম স্নেহযুক্ত অন্তরে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—মা তোমাকে দেখে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে—তা বলে জানান অসম্ভব, সাবিত্রী যেন তোমার যোগ্যাদিদি হয়।

এই কথা বলিয়া মোটরে উঠিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীজীকে জমীদারমহাশয় সভক্তি নমস্কার জানাইলেন এবং সাবিত্রী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীমহারাজ উভয়কে গভীরভাবে প্রীতি, স্নেহ জানাইয়া বলিলেন,—আমি অবিলম্বে আপনার কাছে যাব, বিশেষ প্রয়োজন আছে। জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আমি সাগ্রহে আপনার প্রতীক্ষায় থাকব।

এই কথা বলার পর মোটর চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ দৃষ্টি গোচর হইল ততক্ষণ সাবিত্রীদেবী ও শক্তিরাণী উভয় উভয়ের দিকে সজল নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। গাড়ী অদৃশ্য হইয়া যাইলে পর সন্ন্যাসীমহারাজ শক্তিরাণীকে বলিলেন,—মা! তুমি আর বিলম্ব ক'র না. অনেক বেলা হয়ে গেল বাড়ী যাও। শক্তিরাণী তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া গৃহের দিকে রওনা হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সেই রকমভাবে লক্ষ্মীর উপার্জ্জনের দ্বারা তাহার পিতার শুশ্রূষাদি ও সংসারের খরচ তিন চারি বৎসর ধরিয়া চলিল। লক্ষ্মীর এখন বয়স হইয়াছে পনেরর কাছাকাছি। এখন সে গানের সঙ্গে নাচ করিতে লজ্জা পায়। তাহার পিতা বহুদিন আগে গান সাধিবার জন্য একটি একতারা কিনিয়া দিয়াছিল। সেই যন্ত্রটির সাহায্যে কণ্ঠ সাধনা করিয়া এখন সে বহু গান আয়ত্ত করিয়াছে এবং সেইটিকে এখন হাতে করিয়া গান গাহিয়া উপার্জ্জন করে।

লক্ষ্মীরপিতাগোবিন্দ মধ্যে বেশ অনেকখানি ভাল হইয়া উঠিয়াছিল। সকলের ধারণা হইয়াছিল বুঝি গোবিন্দ সারিয়া উঠিল। এই সময়ে গোবিন্দ লক্ষ্মীকে অনেকগুলি যাত্রা অঙ্গের রাগসঙ্গীত ও কীর্ত্তন শিখাইয়া ছিল। দুই তিন বৎসর একই রকমভাবে থাকার পর হঠাৎ গোবিন্দকে আবার সেই রোগের পুনরাক্রমণে শয্যাশায়ী করিয়া দিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে একদিন সজ্ঞানে লক্ষ্মীরমাকে এক হস্তে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া অন্য হস্ত লক্ষ্মীর মস্তকে রাখিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু চিরমুদ্রিত করিল।

লক্ষ্মীরমায়ের এত বড় আঘাত সহ্য হইল না। গোবিন্দ যেদিন হইতে রোগের পুনরাক্রমণে পীড়িত হইয়া পড়িল সেই দিন হইতে লক্ষ্মীরমা একেবারে নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এক প্রকার প্রায় অনাহারে এই কয়দিন থাকিয়া দিবা রাত্র স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। সেই দিন গোবিন্দর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহু বন্ধনের মধ্যে সেও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে লক্ষ্মীর

ক্রন্দনের ভীষণ চীৎকারে পাড়ার সমস্ত লোক জড় হইয়া দেখিল গোবিন্দ মৃত এবং লক্ষীরমা গোবিন্দর বুকের উপর মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া আছে, আর লক্ষী পার্শ্বে মূর্চ্ছিতা। সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল এ কি ব্যাপার!! লক্ষীর মূর্চ্ছিত দেহটি সেই সাহাজাতির লোকটি কোলে তুলিয়া লইয়া বাহিরের আঙ্গিনায় একটি দড়ির খাটিয়ার উপর সযত্নে রক্ষা করিয়া মাথায়, কপালে ও মুখে জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে তখন গোবিন্দর মৃত দেহের উপর হইতে লক্ষীরমাকে তুলিতে গিয়া দেখিল, সতী সাধ্বী নারী স্বামীর অভাব সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের চিরমিলনের আসা-যাওয়ার পথে চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ উভয়ের মৃত্যুর সংবাদ গ্রামে ও তাহার পার্শ্বস্থ স্থানে শীঘ্র ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যে বহু স্ত্রী, পুরুষ, শিশু প্রভৃতি লোকজনের সমাগমে স্থানটি ভর্ত্তি হইয়া গেল এবং সকলে যুগল-বন্ধন মৃত্যু দর্শন করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষীর জ্ঞান হইলে পর যখন সে জানিতে পারিল যে তাহার মাতাও পিতার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন তখন সে প্রায় পাগলিনীর মত হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল,—হবে না! এ রকম হতেই হবে!! মা যে তার মৃতা সখীর চিতাশয্যার উপর তাঁর হাতের নোওয়া ঠেকিয়ে ও মাথার সিঁদুর খুঁটে নিয়ে সিঁথেয় পরে আশীর্ব্বাদ চেয়ে নিয়েছিল,—"যেন সেই সখীর মত সধবার চিহ্ন নিয়ে মরতে পারি। স্বামীহারা হয়ে যেন বেঁচে থাকতে না হয়।" বা—বা—বা—কি সুন্দর আমার বাবা-মাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখাচ্ছে, ওগো তোমরা দেখ—দেখ! এই বলিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত লোকও তখন কাঁদিয়া ফেলিল। লক্ষী আবার কান্না থামাইয়া বলিল,—বাবা আমায় পরশু দিন বলেছিলেন, "মা, তুই নাচ একেবারে ছেড়ে দিলি, বিশেষ পরিশ্রম

করে শিখেছিলি, একদিন তোর নাচ দেখতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে।" তাঁর চিন্তাতে আমি তাঁকে নাচ দেখিয়ে তাঁর সাধ মিটাতে পারি নাই। ওগো! তোমরা বাবাকে বাইরে নিয়ে এস আমি তাঁকে নাচ দেখাব। এই বলিয়া লক্ষ্মী তাহার বাবার প্রিয় গান একখানি গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার চোখের জলে বুক ভাসার সঙ্গে সেই নাচ ও গান এবং তাহার অবর্ণনীয় করুণ দৃশ্য সমবেত ব্যক্তি-বর্গকে বিহ্বল, নিস্পন্দ ও বাক্যহারা করিয়া দিল। লক্ষ্মীকে বাধাদান ও সান্ত্বনা দিবার মত কাহারও বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

এই রকম অবস্থায় লক্ষ্মীর আবার মূর্চ্ছার উপক্রম দেখিয়া অনেকে তখন বুদ্ধি ফিরিয়া পাইয়া ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্মীকে ধরিয়া ফেলিল। লক্ষ্মী মূর্চ্ছায় এলাইয়া পড়িল। তাহাদের সেই পরম হিতৈষী সাহাজাতীয় লোকটির নাম দয়াল দাস। ঐ দয়াল দাসের স্ত্রী লক্ষ্মীকে কোলের উপর রাখিয়া মাথায় বাতাস করিতে করিতে বলিল,—তোমাদের এ রকম হতভম্ব হয়ে থাকলে চলবে না, শীগ্‌গীর্ শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। যত দেরি হবে এই মেয়েটার জ্ঞান ফিরে এলে আবার এইরূপ পাগলের মত কাণ্ড করতে থাকবে এবং আবার অজ্ঞান হয়ে হয়ে হয়ত মারাই যাবে।

এই কথাগুলি শুনিয়া সকলের সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। যুবা হইতে বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দাহাদি ক্রিয়ার সমস্ত জোগাড় করিতে লাগিয়া গেল। দুইটি বেশ শক্তমত বাঁশ কাটিয়া আনিয়া একটি বড় আকারের শবাধার তৈয়ারী করিয়া লইল। অচিরেই সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন পুরুষেরা হরিধ্বনি ও নারীরা উলুধ্বনি দিতে লাগিল এবং জন কয়েক মিলিয়া শব দুইটি তুলিয়া আনিয়া সেই অবস্থায় উভয়কে শবাধারের উপর শয়ন করাইল। তাহার পর মৃতযুগলের কপাল ও গণ্ড চন্দন-চর্চ্চিত

করিয়া অনেকগুলি ফুলের মালা গলায় পরাইয়া দিল। মৃতার মস্তকে ও পদদ্বয়ে সেই জাতীয়া সধবা স্ত্রীলোকেরা সিঁদুর ও আলতা পরাইয়া প্রণাম করিল—চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহাদের ঐরূপ ভাগ্যের জন্য মৃতার আত্মার কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিয়া লইল। ইহার পর খোল, করতাল, মাদল, শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে এবং সকলের হরিধ্বনি ও স্ত্রীলোকদের ক্রন্দন রোলের মধ্যে দম্পতি-যুগলের পবিত্র শবদেহ শ্মশানাভিমুখে চলিল।

তথায় চিতার উপরে দেহ দুইটি রক্ষা করিয়া সকলে লক্ষ্মীর জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার এখনও জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। কিছুক্ষণ পরে তাহাকে দয়াল ও তাহার স্ত্রী এক প্রকার কোলে তুলিয়া আনার মত করিয়া সেইখানে উপস্থিত করিল এবং কোন প্রকারে তাহাকে দিয়া মুখাগ্নি করাইয়া লইল। লক্ষ্মী আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—ওগো বাবাকে আমি আর একবার নাচগান শুনাব, তোমরা একটু দাঁড়াও আগুন ধরিয়ে দিয়োনা। এই বলিয়া লক্ষ্মী সেই চিতাশয্যার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাগলিনীর মত নাচিতে নাচিতে গান আরম্ভ করিয়া দিল। তখন দয়াল দাস ও তাহার ভ্রাতা দৌড়িয়া লক্ষ্মীকে তুলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। লক্ষ্মী তখন আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। এদিকে অল্পক্ষণের মধ্যেই হুতাশন নশ্বর দেহ দুইটি ভস্মীভূত করিলেন।

সব শেষ হইয়া গেল।

যে গোবিন্দ ও গোবিন্দর স্ত্রী দেশের সম্ভ্রান্ত ও অন্যান্য ব্যক্তির কাছে জীবিতকালে সহানুভূতি, দয়া, মায়া, আদর ও সাহায্যাদি পায় নাই ও মানুষ বলিয়াই কোনরূপ গণ্য হয় নাই, সেই নীচজাতির দুইটি মানুষও আজ মৃত্যুর পর সকল জাতির কাছে মানুষ হিসাবে প্রশংসাভাজন হইল

এবং বহু গুণের অধিকারী ছিল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। লক্ষ্মীর মাতাও আদর্শ পূণ্যবতী নারীরূপে গণ্যা হইল। আমাদের দেশের লোকের ইহাই একটি বৈশিষ্ট্য।

* * * * *

লক্ষ্মীর পিতামাতার মৃত্যুর দিন হইতে তাহাকে দয়ালদাস ও তাহার স্ত্রী নিজের বাড়ীতে রাখিয়া সান্ত্বনা দান ও সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিতেছে। লক্ষ্মী নীচজাতির মেয়ে বলিয়া তাহাকে তাহাদের গৃহে রাখার জন্য দয়ালের স্বজাতিরা ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া ভীষণ বাধা দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা সে আপত্তি ও বাধা গ্রাহ্য করে নাই। দয়াল তাহাদিগকে বলিয়াছিল,—"দেখ পূর্ব্বে যা ছিল তা ছিল, বর্ত্তমান যুগে ছোট বড় জাতি নিয়ে আর বিচার আচার করা চলে না। সত্যকারের জাতি এখন দুটো, গরীব ও বড়লোক। তাও থাকবেনা; তোমরা দেখতেই ত পাচ্ছ যে, উচ্চ জাতির কোন লোক যদি অধিক দরিদ্র হয় তাহ'লে তার জাতিত্বের কোন সম্মানই আজকাল আর থাকে না, তাকে বাধ্য হয়ে অনেক অর্থবান নিম্ন জাতিদের রাধুঁনিগিরি কিংবা চাকর গিরির কাজ করে জীবন যাপন করতে হয়। অতি নিম্ন জাতি বলে যারা চিরকাল পরিচিত হয়ে আসছে তাদের মধ্যে যদি কেউ বড়লোক হয় কিংবা বর্ত্তমানের উচ্চশিক্ষা পেয়ে উচ্চপদ লাভ করে তাহলে সেই ব্যক্তির আর জাতিত্বের দোষ ও তার উপর ঘৃণা থাকে না। তখন সকল জাতির কাছেই তার সম্মান, খ্যাতি ও পূজা লাভ হয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে ত আজকাল আর জাতি নিয়ে কোন বাধাই নাই, মুচি, ব্রাহ্মণ সব সমান। কাজেই এখন আর ছোট, বড় জাতি নিয়ে বিচার করা ও ঘৃণাভাব পোষণ করার কোন অর্থ আছে বলে মনে করা উচিত নয়। তাছাড়া গোবিন্দ চিরকাল ব্যবহারে প্রকৃত মানুষের মত ছিল এবং সঙ্গীতের সাধনায় ভগবানের নাম করে' কাটিয়ে

গেছে। সে হিসাবে সে জাতির মাহাত্ম্যের গুণ বিচারে উচ্চ সম্মান পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিল। আজ তাহার কন্যাকে এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে আমি গৃহে স্থান দিয়ে যৎসামান্য মানুষের কর্ত্তব্য পালন করেছি বলেই মনে করি। উপরন্তু এমন চরিত্রবান সঙ্গীতপ্রেমিক ও সাধকের উপযুক্তা নির্ম্মলস্বভাবা, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও আদর্শযুক্তা কন্যারত্নটি আমাদের গৃহে আছে বলে আমরা নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছি। এজন্য তোমাদের বাধার উত্তরে এ কথা জানাচ্ছি যে, লক্ষ্মীদিদিকে রাথায় তোমরা যদি সামাজিক ভণ্ডামির দরুণ আমাদের জাতিচ্যুত ও একঘরে করতে চাও তাহলে সেটাকে আমরা শাস্তি মনে করব না, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলে মনে করব। ভগবান আমাদের যে জন্য মানুষ করে পাঠিয়েছেন তার প্রধান মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে বিপদে আপদে রক্ষা ও সাহায্য করা। সুতরাং মেয়েটাকে তার এই অবস্থায় ত্যাগ করে অমানুষিক কার্যের দ্বারা মহাপাপে লিপ্ত হ'তে পারব না। তোমরা ত জান, লক্ষ্মীদের স্বজাতি যারা তারা অত্যন্ত গরীব, তাদের স্ত্রী পুরুষ সকলকেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অন্নের জন্য সারাদিন খেটে কাজকর্ম্ম করতে হয়; একবেলার অন্নেরও সংস্থান কারো ঘরে থাকে না। সুতরাং তাকে এসময় তাদের জাতের কে দেখা শুনা করবে বলত?" দয়ালদাসের এবম্প্রকার বলিষ্ঠ ও দয়ামায়াযুক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে তাহার স্বজাতিরা আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজের লোক হইলে হয়ত তাহাকে এইরূপ মহানুভবতার জন্য ও মনুষ্যত্ব দেখানর ফলস্বরূপ জাতিচ্যুত ও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করিতে হইত। যাহাই হউক তাহার পর দয়ালদাস নিজের সামর্থ্য মত লক্ষ্মীকে দিয়া যথা দিনে তাহার পিতামাতার যৎকিঞ্চিত ভাবে শ্রাদ্ধ করাইয়া লইল। লক্ষ্মীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ইহার জন্য সে কাহারও কাছে যাচ্ঞা করিল না।

লক্ষ্মী এখন শোকের ধাক্কা অনেকটা বিশেষ চেষ্টা ও বিচার বিবেচনার দ্বারা সামলাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ সে বুঝিল যখন শোকের দারুণ যন্ত্রণায় আহারাদি পর্য্যন্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছিল তখন তাহার পরম দয়ালু ও দয়াবতী মানুষ দুইটিরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাকে লইয়া তাহারা সর্ব্বদা কাটাইয়াছে এবং সেই সেই দিন তাহার দাদুর চাকরীস্থানে যাওয়াও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পরে আরও বুঝিতে পারিল যে, দাদুর যে রকম তাহার জন্য কামাই হইতেছে তাহাতে হয়ত ইহার পর তাঁহার চাকরীটী রাখাই ভার হইবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই সে এখন শান্ত হইয়াছে। দয়ালদাস ও তাহার স্ত্রী লক্ষ্মীর এখন মনের অনেকখানি উন্নতি লক্ষ্য করিয়া আশান্বিত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে।

এই শান্ত অবস্থার মধ্যে লক্ষ্মী আর এক চিন্তাতে বিভোর হইতে লাগিল। এই চিন্তা তাহার বহুদিন হইতেই বাসা বাঁধিয়াছিল। প্রথম প্রথম সঠিক বুঝিতে পারিত না কাহার জন্য তাহার মন মাঝে মাঝে আকর্ষিত হয়। পিতার অসুখের দরুণ তাহাকে নানান্ চিন্তায় ও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইত বলিয়া ঐ চিন্তার আকর্ষণ বিশেষ ভাবে মনকে চঞ্চল করিয়া দিবার অবকাশ পায় নাই। অথচ স্বভাব-ধর্ম্মের গুণে ও নারীত্বের মহাপবিত্র যাহা তাহার প্রভাবে ক্রমশঃ তাহার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই মনের অলক্ষ্যে অন্তরের মধ্যে সেই চির সম্পর্কের প্রথিত অঙ্কুর অল্প অল্প করিয়া প্রেমের রসসিঞ্চনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এখন লক্ষ্মীর কাছে পিতামাতার সব দায়িত্ব ও চিন্তা ফুরাইয়া যাওয়ায় অন্তরে প্রবিষ্ট সেই অঙ্কুর যেন তর্ তর্ করিয়া বাড়িয়া উঠিয়া ফুলে ফলে বর্দ্ধিত হইয়া পড়িল।

এখন প্রায় সর্ব্বদাই তাহার সেই একটি মুখ মনে পড়িতে লাগিল, যাহাকে সে বাল্যকাল হইতে মাত্র কয়েকবার দেখিয়াছে এবং যাহার সঙ্গে তাহার বর্ত্তমান, ভবিষ্যত ও সবকিছু ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ত্তব্য, নিষ্ঠা গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছে তাহার মা ও মায়ের সেই সখী তাহার মৃত্যুকালে।

এই কয়দিন হইতে অহরহ সেই চিন্তা প্রবলভাবে আসিয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত ও অস্থির করিয়া তুলিল। এখন প্রায় সর্ব্বদা চুপ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই মানুষটির রূপের নানা রকম সুন্দর সুন্দর ছবি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিতে লাগিল।

এখানে একটা কথা জানান আবশ্যক যে, আজ প্রায় তিন বৎসর হইল বাপের নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া অন্য একটা গ্রামের কোন লোকের সঙ্গে মাণিক কোলিয়ারী অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে। সেই অবধি আর কেহ তাহার সংবাদ পায় নাই। তাহার পিতা এখন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া কোন প্রকারে গ্রামে গ্রামে গিয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া আছে। তাহার সেই রক্ষিতাটি রোগের লক্ষণ দেখামাত্র তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য এক গ্রামে যাইয়া আবার নূতন করিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

মাণিকের বাবা ভিক্ষা করিতে যাইয়া এখন লোকের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল বলে,—"আমার পাপের শাস্তি ত এখন কিছুই হয় নাই। আরো ভীষণ শাস্তি আমার পাওয়া উচিত, তবেই আমার প্রতি ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার করা হ'বে। নিজে মহাপাপে লিপ্ত হ'য়ে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মকে ত্যাগ করে অমন সতী, সাধ্বী স্ত্রীকে নির্ম্মমভাবে অকালমৃত্যুর কবলে ঠেলে দিয়েছি। পুত্রকে নির্য্যাতন করে' অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছি; —আমার পাপের শাস্তির কি শেষ আছে? অনেকে

বলে ভগবান নাই, আচ্ছা বলুন ত আমাকে দেখেও কি তাদের বিশ্বাস হবে না? ভগবানের কি সুন্দর বিচার মানুষের উপর! সেই বিচারের রায় বেরাতে দেরী হয় না—ইত্যাদি।"

এই সমস্ত সংবাদ লক্ষ্মীদের সবাই জানিয়াছিল এবং মাণিকের নিরুদ্দেশের সংবাদ লক্ষ্মীর কর্ণেও আসিয়াছিল। মাণিকের জন্য তাহার ব্যাকুল মন আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন সে সঙ্কল্প করিল যে, তাহার সন্ধানে তাহাকে যতই দুঃখ কষ্ট করিতে হউক না কেন, সেই সাগরে ডুবিয়া তাহার অন্তরের মাণিককে উদ্ধার করিতেই হইবে। এইরূপ আকুল ভাব ও চিন্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে একদিন সে নিশা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া দয়ালদাসের স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইল। যাত্রার পূর্ব্বে করুণাময়ী দিদির চরণে প্রণাম জানাইল এবং যে ঘরে তাহার পরমপূজ্য-দয়াময় দাদু শায়িত ছিল সেই ঘরের দরজার সামনে সজলনয়নে ভূমিষ্ট-প্রণাম করিয়া একখানি বস্ত্র ও একতারাটি সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইয়া হইয়া পড়িল। পূর্ব্বাহ্নে পত্রের দ্বারা তাহার মনের বাসনা ও উদ্দেশ্য সমূহ বিবৃত করিয়া তাহা এমন একটি স্থানে রাখিয়া দিয়াছিল যেন প্রাতঃকালে তাহারা উঠিয়াই না পায় এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। লক্ষ্মী তাহার পর পিতামাতার ক্ষুদ্র ভগ্ন কুঠিরের নিকট অতি সন্তর্পণে উপস্থিত হইয়া নিঃশব্দে কিছুক্ষণ রোদন করিল এবং পরক্ষণে চলিল যেখানে তাহার পিতামাতার অন্তিমশয্যা রচিত হইয়াছিল। সেইস্থানে গিয়া সেই ভস্মচিতার উপর মস্তক রক্ষা করিয়া চোখের জল ফেলিল এবং তাঁহাদের আত্মার কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিল তাহার কামনা সিদ্ধির জন্য। পরে উঠিয়া জোড়হস্ত মস্তকে ঠেকাইয়া সেই স্থানটি তিনবার প্রদক্ষিণ করিল এবং আর একবার পিতামাতার

উদ্দেশে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম জানাইল। শেষে করুণকণ্ঠে সকলের কাছে বিদায় চাহিয়া লইয়া ও দোষ ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া দ্রুতপদে রওনা হইয়া গেল।

পাকা রাস্তায় চলিতে চলিতে লক্ষীর যখন প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করা হইয়াছে তখন পূর্ব্বদিকে উষার শুভ্র আলো প্রকাশিত হইতে লাগিল। আরও কতকটা পথ চলার পরই তপনদেবের রক্তিম আভা বিচ্ছুরিত হইয়া ধরণীকে অলক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া দিল। তৎপূর্ব্বেই রাস্তার দুই পার্শ্বের বৃক্ষোপরি নানান জাতীয় পক্ষিকুল নিদ্রাভঙ্গের নির্দ্দেশ কলরবে চতুর্দ্দিক ভরিয়া তুলিয়াছিল। তখন বসন্ত কাল, বৃক্ষসমূহ হইতে মুকুলের মধুসৌরভে এবং মক্ষিকা ও ভ্রমরের-গুঞ্জনে তাহাদের পরিধিস্থল মাতাইয়া তুলিয়াছে। অদূরে অশ্বত্থবৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শুষ্ক ডালে বসিয়া একটি শ্বেতবর্ণের ঘুঘুপক্ষী খো-খো-চ্চ খো-খো-চ্চ রবে ডাকিয়া তাহার সাঙ্গিনী বা সঙ্গী প্রাতঃকালে উঠিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সেই চিন্তাতে যেন করুণ-ভাবে তাহার উপস্থিতির সন্ধান জ্ঞাপক খো-খো-চ্চ অর্থাৎ 'কো-থা-আছ' ইহাই কণ্ঠধ্বনিতে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে সেখানে মিলিত হইবার জন্য সবেদন মিনতি জানাইতেছে।

সমস্ত জীবের মধ্যে বিশেষ করিয়া পক্ষিজাতিরা এক মুহূর্ত্তও সঙ্গীহীন হইয়া থাকিতে পারে না। দাম্পত্যের নিবিড় বন্ধন ও ভালবাসা ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশী আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, যে সকল পক্ষীদের কণ্ঠধ্বনিকে আমরা সঙ্গীত বলিয়া অনুভব ও বর্ণন করি, সেই সঙ্গীত তাহারা প্রকাশ করে তখন, যখন উভয়ের মধ্যে সময় সময় মিলন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপ স্বভাব ও প্রকৃতিদত্ত সঙ্গীত বিষয়ে আমরা অনুভবের

দ্বারা বুঝিতে পারি যে, পরম প্রিয় বস্তুকে নিবিড় ভাবে পাওয়ার কামনাই হইল সঙ্গীতের প্রাণবস্তু। মানুষ যদি সেই পরমাকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাইবার জন্য যথার্থ ভাবে সঙ্গীতের মাধ্যমে সঙ্গীতকারী পক্ষীদের মত আত্মনিবেদন করিয়া আহ্বান করিতে পারে তবেই তাহার কণ্ঠে সত্যকারের সঙ্গীত প্রকাশিত হইবে।

এই শিক্ষা শুধু পক্ষীদের কাছেই নয়,—প্রকৃতিদত্ত অনেক বস্তুর মধ্যেই আমরা উহা লাভ করিতে পারি যদি একাগ্র হইয়া দৃষ্টিশক্তি নিয়োগ করি। এই সমস্ত বস্তু লাভের স্থান পল্লীঅঞ্চলের নানা রকম দৃশ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই প্রকৃষ্টভাবে হয়। ওই সকল স্থানে বিশেষ করিয়া মনকে মাতাইয়া দেয় প্রকৃতির প্রাতঃকালীন ও সন্ধ্যা রূপের সময়।

লক্ষ্মী তপনদেবের লোহিতবরণ দর্শনপূর্ব্বক একটু নির্জ্জন স্থানে গিয়া বৃক্ষতলে পূর্ব্বাস্য হইয়া সূর্য্যদেব ও অন্যান্য দেবদেবীকে প্রণাম জানাইল এবং তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করিল। পরে নতজানু হইয়া একতারা যন্ত্রটির সুরে সুর মিলাইয়া একটি বিশুদ্ধ ভৈরবরাগে প্রার্থনা গীত গাহিল।

পূর্ব্বে যাত্রা অঙ্গের গানের সুর প্রায় সমস্তই বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীতের দ্বারা এবং কিছুসংখ্যক গানে কীর্ত্তন অঙ্গের সুরে রচিত হইত। এখনও দুই একটি সাবেকী উচ্চ রুচি সম্পন্ন অধিকারীর দলে আগেকার মত গানের অনেকখানি উন্নতি ও সাধনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়; তবে তাহা হাল্‌কা ধরণের। আগেকার যাত্রায় প্রায় সমস্ত গানই ধ্রুপদ অঙ্গের তালে গীত হইত।

তখন যাত্রার উপাখ্যানগুলি যেমন মানুষের সর্ব্ববিধ কল্যাণ দান করিত তেমনি গানের সুর সমূহও আনিয়া দিত রাগসঙ্গীতের উপর

গভীর প্রেরণা ও আনন্দের আকর্ষণ। কালের গতিতে বর্ত্তমানে সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল! ধর্ম্মের আবহাওয়া মানুষের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল।

যাহাই হউক, এখন আসল কথা বলা যাউক। গোবিন্দ নিজে যে দলে ছিল সেই দলের অধিকারীর রাগসঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়া গোবিন্দর সেই সঙ্গীত শিক্ষা ও সাধনা করবার সুযোগ হইয়াছিল।

লক্ষ্মী ভাবযুক্ত হইয়া যে গানটি গাহিল, সেইটি তাহার নিজের রচিত। গানের কথাগুলি এইরূপ :—

দীন দয়াল প্রভু অগতির গতি
তোমার চরণে সদা রাখ মোর মতি।
সুখে সম্পদে যেন ভুলি নাই কভু
যত দুঃখ দাও মোরে ডাকিব তবু
বল দাও অন্তরে, আর তব জ্যোতি ॥

হঠাৎ প্রাতঃকালে এমনভাবে এইরূপ নির্জনস্থানে সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইয়া নিকটবর্ত্তী দুই একঘর কৃষিজীবী জাতির স্ত্রী-পুরুষ সকলে ছুটিয়া আসিল। তাহারা আসিয়া দেখিল একটি আলুথালু বেশে নবযৌবনা বিরসবদনা পরমশ্রদ্ধা আকর্ষণকারিণী নারীকে। গান থামিয়া যাইলে পর লক্ষ্মীকে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহার আগমন বৃত্তান্ত, উদ্দেশ্য ও কারণ।

লক্ষ্মী বলিল,—তোমরা বলতে পার এখান হতে আর কতদূর হেঁটে গেলে আমি কোলিয়ারীর কোন নিকটবর্ত্তী সহরে পৌছতে পারব?

সেই লোকগুলির মধ্যে একজন বলিল,—কোলিয়ারীর নিকটবর্ত্তী সহর এখান হ'তে অনেক দূর। তুমি আরো দু'ক্রোশ হেঁটে গেলে

আমাদের এই অঞ্চলের সহরে পৌছতে পারবে, তারপর সেখানে পৌছে লোককে জিজ্ঞেস করে নিবে তোমার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যাবার জন্য কোথায় বাস পাওয়া যায়।

লক্ষ্মী আর কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। লোকগুলি হতভম্ব ও অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পথমধ্যে একটি নিভৃত পুষ্করিণীতে স্নানাদি সারিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি করিয়া লইল। বৃহৎ কেশগুচ্ছটি এলাইত অবস্থায় রাখিয়া আবার দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেই সময়কার অপরূপ ভক্তিমাখান মূর্ত্তিখানি দেখিয়া পথচারিদের মনে হইল, যেন পূর্ণযৌবনা এলোকেশী মহামায়া শিববিরহে কাতরা হইয়া দুঃখক্লিষ্ট বদনে চলিয়াছেন। পল্লীর ধর্ম্মপরায়ণ বয়োবৃদ্ধ কৃষকশ্রেণীর লোকেরা তাহার গমন পথ সসম্ভ্রমে ছাড়িয়া দিয়া সভক্তি হৃদয়ে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সহরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল একটি চায়ের দোকানে কয়েকজন যুবক ভাল জামা কাপড় পরিয়া বসিয়া আছে। তন্মধ্যে পাণ্টুলুন পরিহিত ও সার্টের হাত গুটান এবং লম্বা লম্বা মাথার চুল সামনের দিকে ভেড়ার শিংএর মত করিয়া আঁচড়ান যুবকই বেশী। লক্ষ্মী তাহাদিগকে বিশেষ ভদ্রশ্রেণীর লোক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে যাইয়া তাহার গন্তব্য পথের মোটর-বাস কোথায় পাওয়া যাইবে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল।

হঠাৎ সকালে বাদ্যযন্ত্রহস্তে এমন সুন্দর সুঠাম পূর্ণযৌবনা নারীকে দেখিবামাত্র সেইসকল ছোক্রাদের পঙ্কিল হৃদয় লালসায় ভরিয়া উঠিল। যুবকদের মধ্যে কেহ তাহাকে ভিতরে আসিতে বলিল, কেহবা আকার ইঙ্গিতের দ্বারা অশিষ্ট আচরণ দেখাইতে লাগিল, আবার কেহ মুখ

হইতে সিগারেটের ধোঁয়া তাহার মুখের দিকে লোলুপ ভাবে ত্যাগ করিয়া বলিল,—"তুমি দেখছি গানও জান। একটা রঙ্গের গান শোনাও ত! সকালে মনটাকে চাঙ্গা করে নেওয়া যাক।"

লক্ষ্মী ইহাদের ইত্‌রামি দেখিয়া বলিল,—আমি পল্লীতে জন্মাবধিই ছিলাম, কৈ সেখানকার মানুষদের কাছ থেকে ত এরূপ আচরণ কোনদিন পাই নাই। আমি একা নারী, বিপদগ্রস্তা হয়ে আপনাদের আমার দেশের পরম সহায়ক ভদ্রবংশের সন্তান বলে এবং নিজের সত্যকারের শ্রদ্ধাভাজন দাদার মত মনে করে' সামান্য একটু উপকার প্রার্থনা করলাম, তার বদলে আপনারা একজন গরীব অনাথা বোন্‌কে এরকম ভাবে অপমানিত করলেন দেখে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলাম। পল্লীর লোকেরা বেশীর ভাগই অশিক্ষিত; তাদের মধ্যে যেটুকু ধর্ম্মভাব, কর্ত্তব্যবোধ ও সম্মান সম্ভ্রম জ্ঞান আছে তা অপেক্ষা আপনাদের কাছে অনেক বেশী আশা করেছিলাম। কারণ সহরের লোকেরা লেখাপড়া শিখে জ্ঞান ও চরিত্র অর্জ্জন করবার সুযোগ পায় কিন্তু আপনাদের কাছে কুৎসিত ব্যবহার পেয়ে আমার ধারণার পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। এখন মনে হচ্ছে সহরের সভ্যতা চরম অসভ্যতারই নামান্তর। একজন অতি দরিদ্র নীচ জাতির মেয়ে মনে করে' আপনারা নির্ভয়ে আমাকে দেখামাত্র পশুর মত আচরণ দেখাতে কুণ্ঠা অনুভব করলেন না, কিন্তু কোনদিন আপনারা কি শুনেছেন যে, আমাদের জাতির কোন পুরুষ আপনাদের ভদ্রবংশের নারীদের উপর এরূপ অপমান করতে সাহস করেছে? যদি তাদের মধ্যে কেহ এরূপ আচরণ করত তাহলে তার জন্য যেমন কঠোর শিক্ষা ও শাস্তির প্রয়োজন থাকত তেমনি আপনাদের প্রতিও নিশ্চয় থাকা উচিত হয়। আমার সময় নাই এবং আপনাদের উপযুক্ত সম্মান জানিয়ে যাবার জন্য আমার পায়ে সেরূপ কোন

পরিধান নাই নচেৎ তাহার দ্বারা আমি আপনাদের যথোচিত উত্তর দিয়ে যেতাম।

এই বলিয়া ক্ষোভে, দুঃখে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—মা! আমি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তোমার তেজস্বিনী রূপ ও ব্যক্তিত্ব রক্ষার শক্তি দেখে অত্যন্ত শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়েছি।

যুবকেরা সেই বৃদ্ধকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বৃদ্ধ লক্ষ্য করিলেন,—কোন্ কোন্ যুবক উপস্থিত ছিল এবং তাহার মধ্যে তাঁহার স্কুলের কোন ছাত্র আছে কি না।

বৃদ্ধ লক্ষ্মীকে পুনশ্চ বলিলেন,—মা! তোমার কি হয়েছে? এরা তোমাকে কি বলেছে?

লক্ষ্মী সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলে পর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাহা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন,—কি বলব মা দুঃখের কথা! আজকাল এক শ্রেণীর যুবকেরা এইরকম প্রায় সমস্ত সহরেই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছে। ইহার কারণ কি জান মা! বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের সন্তানদের রীতিনীতি ও চরিত্র গঠনের জন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যেও তাহার অভাব অত্যন্ত বেশী হয়ে পড়েছে। তার ওপর বায়স্কোপ এদেশে আসার যুগ থেকে বেশীর ভাগ ঘটনায় কুৎসিত হাবভাব যুক্ত বিলেতী ছবির নোংরামি চিত্রে দেখায় এবং তার অনুকরণে অনেক দেশীয় চিত্রেরও সেই বিষর্পিত রূপ বাল্যকাল হতে মনে অঙ্কিত হওয়ায় মানুষ নীতিভ্রষ্ট ও যথেচ্ছাচারী হয়ে পড়েছে ও পড়ছে। এর অনিষ্টকর প্রভাব শুধু পুরুষ মানুষের মধ্যেই নয়, সহরের নারীদের মধ্যেও অনেকের ভিতর প্রবেশ করেছে। আমরা যুগধর্ম্মের ওপর সব দোষ

চাপিয়ে দিই কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি ধর্ম্মের সঙ্গে শিক্ষাকে জড়িয়ে না রাখা, বুদ্ধি ও বিবেচনাকে উপেক্ষা করা এবং অসংযতভাবে চলার ফলস্বরূপই এইরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে। যাক্‌গে এখন এসব কথা। আজ একটি সামান্য স্তরের তোমার মত মেয়ের মর্য্যাদা ও নারীত্ব রক্ষার শক্তি দেখে বড়ই আশান্বিত ও আনন্দিত হলেম। প্রত্যেকে যদি এইরূপ নিজের মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করে' চলে তাহলে কারো সাধ্য নেই সেই পরমবস্তুকে নষ্ট করতে পারে। আজকের মত তোমার আদর্শে এইরকম ভাবে সকল নারীরা ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে নীতিহীন মানুষদের যদি শিক্ষা দিতে থাকে, তাহলে সমাজের কল্যাণ ফিরে আসতে দেরী হবে না। মা! এখন তুমি বল কোথা হ'তে আসছ এবং কোথায় যাবে? আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় তাহলে আনন্দের সহিত তা পালন করব।

লক্ষ্মী করজোড়ে বলিল,—বাবা! আপনার দেবত্ব ও মহত্ব আপনার মুখে ও বাণীতেই জাজ্জল্যমান হয়ে আছে। আমার বাবা বলেছিলেন, মানুষের মুখই হ'ল অন্তরের দর্পণ। আপনাকে বেশী কষ্ট করতে হবে না, আপনি কেবল বলে দিন কোন্ পথ দিয়ে গেলে কোলিয়ারীর মধ্যস্থলের কোন সহরের বাস ধরতে পারব।

বৃদ্ধ বলিলেন,—মা! আমি তোমাকে নিজে সেখানে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসব। তার পূর্ব্বে তুমি মা আমার একটা অনুরোধ রাখ।

লক্ষ্মী বলিল,—আপনি দয়া করে বলুন কি আদেশ।

বৃদ্ধ বলিলেন,—তোমাকে বড়ই বিরস ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমার বাড়ী বেশী দূরে নয়, তুমি আমার সঙ্গে চল, সেখানে গিয়ে কিছু আহার গ্রহণ করে' তোমার এই বুড়ো বাপকে তৃপ্ত করবে।

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া লক্ষ্মীর চোখ দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিল,—সন্তানের পিতা মাতা ছাড়া এ কষ্টটাকে কেহ সর্ব্বাগ্রে এত বড় করে দেখতে পারে না। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন, কিন্তু একটা কথা, আপনি যে খাদ্য দিবেন তা আপনার প্রসাদ করে দিবেন; আমি তা পেয়ে ধন্যা ও কৃতার্থ হব।

বৃদ্ধ বলিলেন,—মা! তোমাকে দেখে ও কথাবার্ত্তা শুনে খুব উচ্চবংশের শিক্ষিতা মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে তারও অনেক উপরের তুমি। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধমহাশয় লক্ষ্মীকে অতি যত্ন করিয়া বাড়ীতে লইয়া চলিলেন॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বব্যবস্থা মত সন্ন্যাসীমহারাজ জমিদারমহাশয়ের গৃহে একদিন যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়া জমিদারমহাশয় ত্বরিতপদে নীচে নামিয়া সন্ন্যাসীজীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন ও নমস্কার জানাইয়া উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র সন্ন্যাসীজীর কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করায় তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ সেই গীত শ্রবণ করিয়া মনে মনে অনুভব করিতে পারিলেন যে, সাবিত্রীর কণ্ঠে এই কয়দিনের মধ্যেই অনেকখানি ভাবের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

জমিদারমহাশয় বলিলেন,—সেইদিন সঙ্গীতসাধকের ওখান হ'তে আসার পর থেকে অনেক বিষয়েই সাবিত্রীর পরিবর্ত্তন এসে গেছে। সে চাঞ্চল্যভাব একেবারে নেই। পোষাক-পরিচ্ছদ, ভোগবিলাস সব ত্যাগ করেছে সে। এখন কেবল মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করে থাকে; খাদ্যাদি বিষয়েও ভীষণ আচারনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। ওর নিজের ঘরটিকে এখন ঠিক ঠাকুর ঘরের মত করে ফেলেছে। অতি প্রত্যূষে উঠে স্নানাদি সেরে নিয়ে পূজাপাঠ সমাধা করে' সেইখানে বসেই সঙ্গীত সাধনা করে প্রায় একাদিক্রমে দু'ঘণ্টার উপর। তার-পর আমার প্রাতরাশ ইত্যাদির নিজহস্তে ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে পূজার প্রসাদ কিছু গ্রহণ করে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে চারবার সাধনা করছে। মধ্যাহ্নে আমাদের দেশের বড় বড় সঙ্গীতগুণীমহাত্মাদের

গ্রন্থাদি দৃষ্টে ধ্রুপদ গান প্রত্যহ এক একটা করে তুলে' কণ্ঠে সেই-গুলিই এখন বেশী করে গায়।

এই কথার একটু পরেই সাবিত্রীদেবীর গান থামিয়া গেল এবং তিনি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতে যাইবেন অমনি পিতার সহিত সন্ন্যাসীমহারাজকে দেখিয়া পরমপুলকে তাঁহাকে এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া সন্ন্যাসীজীকে বলিলেন,—আপনার কথা বাবা প্রায়ই বলছিলেন এবং আপনার আসার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন।

সন্ন্যাসীজী সাবিত্রীদেবীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—আমরা অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনছিলেম। সত্যই তোমার গান আগেকার অপেক্ষা এখন অনেক ভাল লাগছিল। তুমি ধ্রুপদ গানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা হয়েছ দেখে বড়ই খুসী হলেম।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—সেদিন শক্তিরাণীর কাছে তার সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে পরিচয় পেয়ে এবং সঙ্গীতসাধকজী ধ্রুপদ গানই বেশী সাধনা করেন শুনে ও তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু বিষয়ের তত্ত্ব জেনে বুঝলেম যে, সঙ্গীতের মধ্যে যে বিরাট ভাব ও আধ্যাত্মিক রূপ বিরাজ করে' আছে তার মর্ম্মকে যথার্থভাবে গ্রহণ করতে হ'লে ধ্রুপদসাধনা করা চাই-ই। তাই আমি সেখান থেকে এসে অবধি বাংলাদেশের গুণীদের প্রণীত সঙ্গীতগ্রন্থ হতে সেইসব অমূল্যরত্ন আহরণ করবার ও কণ্ঠে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছি। ওইসকল শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বাবার আলমারিতে এতদিন হতাদরে পড়েছিল, আজ আমার কাছে দেবতার মত পূজার স্থান পেয়েছে। গ্রন্থদেবতাদের কৃপায় যেন কিছু লাভ করতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—তোমার অন্তরে যখন ভক্তি, নিষ্ঠা এসে গেছে এবং ধ্রুপদের উপর যথার্থ বোধশক্তি লাভ করেছ তখন তোমার

মনস্কামনা পূর্ণ হবেই। ধ্রুপদের মধ্যে একটা বিপুল প্রভাবশক্তি কি আছে জান! এই গান সাধনার দ্বারা মানুষ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়, বিনয়ী হয় এবং ঈশ্বরের দিকে তাহার মন ধাবিত হয়। এজন্যে অন্যসব শ্রেণীর গান শিখবার পূর্ব্বে ধ্রুপদ গান শিখবার এত বেশী প্রয়োজন থাকে। অবশ্য আদর্শের উপর লক্ষ্য থাকা চাই। গুরু এবং শিষ্য উভয়কেই আদর্শবাদী হতে হবে, নচেৎ এই ব্রহ্মবিদ্যা তাঁদের কাছে ধরা-ছোঁয়া দেবে না। একথার সত্যতা সম্বন্ধে তুমি নিজেই ত বেশ উপলব্ধি করে নিয়েছ;—আদর্শ ব্যক্তির সংস্পর্শে একদিনমাত্র এসেই তোমার মন তৎক্ষণাৎ আদর্শকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে অন্তরের মধ্যে আঁকড়ে ধরে ফেলেছে। বাস্তবিকই আজ আমার বড় আনন্দ হ'ল তোমার সকল বিষয়ে উন্নতি দেখে। তোমার নিজের ঘরটি নূতন করে সাজিয়েছ শুনলেম, চল একবার দেখে আসি।

সাবিত্রীদেবী অতি বিনয়সহকারে তাঁহাকে ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসীমহারাজ দেখিলেন, যে ঘরটি পূর্ব্বে ছিল ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি, সেইটি আজ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভক্তনির্ম্মিত নির্জন দেবালয়ের মত পবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ঘরের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে মেঝের উপর দুইটি পাশাপাশি চৌকির মধ্যে বৃহৎটিতে তম্বুরা রক্ষিত আছে এবং তদপেক্ষা ছোটটির উপর মহাদেব ও সরস্বতীদেবীর মূর্ত্তিদ্বয় সঙ্গীত গ্রন্থাবলী পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। চৌকিগুলির চারিপার্শ্বে পূজার পুষ্প সুন্দরভাবে প্রদান করা হইয়াছে। ধূপ, ধুনা ও চন্দনের সৌরভে গৃহটি আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে।

আরও দেখিলেন, উত্তরদিকের দেওয়ালের নিম্নে আর একটি চৌকির উপর তাঁহার স্বর্গতা মাতৃদেবীর প্রতিকৃতিতে অনুরূপভাবে পূজা করা

হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে দেওয়ালগাত্রে সন্থাম্বিত কয়েকটি ভাবপ্রকাশক সঙ্গীতের আলেখ্য শোভা পাইতেছে। এই চিত্রগুলির মধ্যে কোনটিতে আছে অরণ্যবেষ্টিত পর্ব্বতগাত্র হইতে বেগে শিলার উপর আছড়াইয়া স্রোতঃস্বিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার তটের নিকটস্থ বৃক্ষতলে মৃগচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া এক সাধক বীণাযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতের দ্বারা ভগবৎ আরাধনা করিতেছেন, সেই সঙ্গীতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকটি মৃগ গায়ক-ঋষির দুইপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্থিরকর্ণে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া শ্রবণ করিতেছে এবং সম্মুখে একটি ময়ুর পুচ্ছ মেলিয়া সেই গানের ছন্দে নৃত্য করিতেছে। এই চিত্রটির তলদেশে একটি কবিতা লিখিত আছে। তাহার কথাগুলি এইরূপ :—

গিরি ঝরণার ধারে শিলা'পরি বসিয়া
প্রভাতে বীণা হাতে যোগী গায় 'যোগিয়া'।
শুনে তথা আসে যত ময়ুর ও মৃগদল
পাখিকুল গাহেনা কণ্ঠ হ'ল বিকল
কুসুম ফুটিল সব সুর পরশ পাইয়া।
এইত সঙ্গীত! যার ভাষাহীন সুর-তাল
বিশ্ব মোহিত করে চলিয়াছে চিরকাল,
কিইবা লভিনু তার এ জীবন ভরিয়া॥

আর একটি চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে,—পার্ব্বতারণ্যের তলদেশে একটি পর্ণ-কুটিরের দাওয়ায় বসিয়া সুরের ঋষি একটি ঋষিকন্যাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছেন। আর একটি চিত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,— নির্জনস্থানে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ছোট একটি ফুলের বাগানে বেদীর উপর উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণযৌবনা একটি যোগিনী তম্বুরা বাজাইয়া

ভাবে বিভোর হইয়া গান করিতেছেন। বৃক্ষোপরি পক্ষিকুল মুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে এবং বৃক্ষশাখার ঘনপল্লবের মধ্য দিয়া সূর্য্যদেবের কিরণ সেই সাধিকার মুখ মণ্ডলে পতিত হওয়ায় গোলাপী গণ্ডে রক্তাভার দীপ্তি ফুটিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

আর একটিতে দেখিলেন,—উপবন মধ্যে উন্মুক্ত আকাশ তলে সুচিক্কণ শ্যামল তৃণময় সুপরিসর স্থানটির মধ্যস্থলে সঙ্গীতগুরু বসিয়া ক্রোড়ের উপর তম্বুরাটিকে রক্ষা করিয়া কয়েকটি ব্রহ্মচারীশিষ্যকে সঙ্গীত সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। তাহার কিয়ৎদূরে কুটিরের আঙ্গিনায় গুরুগৃহিনী পূজার পুষ্প চয়ন করিতেছেন এবং এক পার্শ্বে একটি হৃষ্টপুষ্টা গাভী দণ্ডায়মানা থাকিয়া নিজ বৎসের গাত্র লেহন করিতেছে।

পূজার স্থানের উপরের দেওয়াল গাত্রে সাবিত্রীদেবীর হস্তলিখিত একটি গান সুন্দরভাবে বাঁধান অবস্থায় ঝুলান আছে। সেই গানটি সন্ন্যাসীমহারাজ পড়িতে লাগিলেন,—

আসিতেছি গেয়ে যে কয়টি রাগ রাগিনী
বৃথা গাওয়া হ'ল মন যে তোমাতে রাখিনি।
তাইত রয়েছি তোমার বহু দূরে, পড়িয়া রহিনু অন্ধকার পুরে,
কণ্ঠে আমার হয়নি সাধনা, সে সুর তুলিতে পারিনি!
বৃথা গাওয়া হ'ল মন যে তোমাতে রাখিনি।
বুঝিনু এখন যদি হ'ত ঠিক গাওয়া, তাহলে হইত এতদিনে মোর পাওয়া,
সুরের মাঝারে তোমার রূপ যে আঁকিনি,
বৃথা গাওয়া হ'ল মন যে তোমাতে রাখিনি।

এখন আমি চেতন পেয়েছি ভালো, আঁধারে রেখো না দেখাও তোমার আলো,
এতদিন যাহা মূঢ়ের মত ভাবিনি,
বৃথা গাওয়া হ'ল মন যে তোমাতে রাখিনি।

এই গানটি পড়িয়া এবং অঙ্কিত চিত্রসমূহ দেখিয়া সন্ন্যাসীজীর মন তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। সাবিত্রীদেবীর মাথায় পরম স্নেহভরে হাত রাখিয়া হৃষ্টচিত্তে ঘর হইতে সকলের সঙ্গে বহির্গত হইলেন।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—বাবা, আপনারা হলঘরে বসুন, আমি জ্যেঠা-মশায়ের জন্যে জলখাবার নিয়ে আসি।

সাবিত্রীদেবী চলিয়া যাইলে পর সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—আমি উপস্থিত সঙ্গীতসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সমূহের যে সকল সিদ্ধান্ত করে রেখেছি সে সব কথা জানাবার জন্যেই আজ আপনার কাছে এসেছি। আমি এক একটি করে বলে যাই আপনি মন দিয়ে শুনে বিচার করে দেখুন আমার ইচ্ছে কার্য্যকরী হবে কিনা।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আপনার বক্তব্যের পূর্ব্বে আমার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত সমূহ আপনাকে জানাবার প্রয়োজন মনে করছি। আপনার ঐকান্তিক কামনার সঙ্গে আমার কামনাও অনেকখানি মিলে যাবে মনে হয়; তাই আমি কতটুকু কি করতে পেরেছি আপনাকে আগে নিবেদন করছি শুনুন। সেদিন আপনাদের ওখান হতে আসবার পথে সাবিত্রী আমাকে বলল,—"বাবা! সঙ্গীতসাধকজীর পরিকল্পিত আদর্শ শিক্ষাশ্রম যাতে শীগ্‌গীর্ স্থাপিত হ'তে পারে তার জন্যে সর্ব্বতোভাবে তুমি সাহায্য ও সহায়তা কর। সত্যই যদি আমাদের দেশে যথার্থভাবে সঙ্গীতের প্রচার ও ভবিষ্যতের জন্যে সঙ্গীতজ্ঞ তৈরী করতে হয় তাহলে এ রকম ভাবে আশ্রমে শিক্ষা ও সাধনা ব্যতিরেকে

ইহার মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে মনে করিনা। আমার আজ বেশ জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে যে, আমাদের দেশে সঙ্গীতজ্ঞরা সঙ্গীতকে নিছক্ ব্যবসার সামগ্রী মনে করে' কেবল সুরের কসরত্ ও গর্ব্বিতভাব নিয়ে সঙ্গীতের অধ্যাত্মরূপ ধ্যান করতে ভুলে গেছেন। কেবল অর্থ ও নামের ডাকটাকেই সবচেয়ে বড় করে দেখেছেন। অবশ্য দু একজন হয়ত নীরব সাধক আছেন। যাই হ'ক, তুমি বাবা এর জন্যে যতদূর সাধ্য দান কর। আমার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। আজ আমার সবেরই পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।"

আমি তাকে এর উত্তরে বলেছিলেম, মা! তুই বলবার আগেই আমি মনে মনে ঐরূপ সঙ্কল্প করে রেখেছি। আমার কথা শুনে মেয়েটা আমার গলা জড়িয়ে কেঁদে ফেলে বলেছিল,—"বাবা, তুমি সত্যই সঙ্গীতকে চিরকাল অন্তর দিয়ে ভালবাস বলেই তাই তোমার মুখে এই কথা শুনলেম।"

সন্ন্যাসীমহারাজ এইরূপ কথা শ্রবণ পূর্ব্বক মুগ্ধ হইয়া জমিদার-মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

জমিদারমহাশয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—সাধকজী যেখানে আছেন সেই অঞ্চলের সমস্ত জমির মালিকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি একদিন তাঁর কাছে গিয়ে এবং সমস্ত কথা বলে ঐ স্থানের বিস্তৃতাঞ্চল একশত একরের বেশী জমি সামান্যমাত্র খাজনায় এবং দশহাজার টাকা সেলামি দিয়ে বায়নাপত্র পাকা কাগজে করে এসেছি। এখন জায়গাটা কার নামে রেজিষ্টারী হবে সেটা আপনি ও সাধকজী বল্লেই পাকা করে নেবো। আশ্রম কি ভাবে তৈরী হবে তার সম্বন্ধে আমি মোটামুটি একটা প্ল্যান করে রেখেছি। আপনারা সকলে দেখবেন ঐ প্ল্যান অনুযায়ী করলে ভাল হবে কিনা।

এই আলোচনার মাঝে সাবিত্রীদেবী জলখাবার লইয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ উহা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, ভগবান এত শীগ্‌গীর্‌ আমার ও সাধকজীর বাসনা পূর্ণ করবেন এ ভাবতেই পারি নি। মনে মনে আপনার উপর অনেকখানিই ভরসা রেখেছিলেম কিন্তু আপনি যে এমনভাবে এতখানি অগ্রসর হবেন তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল।

জমিদারমহাশয় বলিলেন,—এ আশা ও আকাঙ্ক্ষা শুধু ত আপনার ও সাধকজীর দু'জনের নয় মহারাজজী! ওই কামনা একজন মহাত্মা-প্রবীণসঙ্গীতগুণীর অর্থাৎ সাধকজীরগুরুদেবের, সাবিত্রীর, শক্তিরাণীর, সঙ্গীতের প্রাণধর্ম্মের ও জাতির কল্যাণকামিদের এবং আমার নিজের।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—সে কথা খুবই সত্য। আপনি কার নামে জায়গা ও আশ্রম রেজিষ্টারী হবে বলছিলেন নয়? আমার মনে হয় কয়েকজন যথার্থ ব্যক্তিকে ট্রাষ্টিভুক্ত করে' তাঁদের নামে ও পরিচালনায় আশ্রমটির দায়িত্ব অর্পিত হ'লে ভাল হয়। উপস্থিত আমি পাঁচজনের নাম বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি, যথা,—সাধকজীর গুরুদেব এবং সাধকজী, দুই—আপনি, তিন—সাবিত্রীদেবী, চার ও শক্তিরাণী, এই পাঁচজন।

জমিদারমহাশয় বলিলেন,—আপনি দেখছি শিবরহিত যজ্ঞ করছেন অর্থাৎ নিজেকে বাদ দিচ্ছেন। সকলের পুরোভাগে ট্রাষ্টির মধ্যে থেকে এবং আশ্রমের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব ও পরিচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। এই সমস্ত আলোচনা অবিলম্বেই সাধকজীর কাছে গিয়ে করলে ভাল হয়। কাজ আরম্ভ করতে বেশী দেরী করা ভাল নয়; কবে যাব বলুন? সেদিন আমি একজন কনট্রাক্টর ও ইঞ্জিনীয়ারকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

সন্ন্যাসীজী অতি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,—"শুভস্য শীঘ্রম্।" পরশুই আপনারা যাবার তাহলে ব্যবস্থা করুন, আমি কাল মঠে চলে যাই। আমি যে বিষয়ের আলোচনার জন্যে এসেছিলেম তার আর এখন প্রয়োজন নাই। যে ফললাভের জন্যে বহির্গত হওয়ার আবশ্যক মনে করেছিলেম, সেই ফলের বৃক্ষ প্রোথিত হয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হবার সম্ভাবনা যখন এসে গেছে তখন এরপর তার ফলের স্বাদ ও রসাকর্ষণে সমস্তই একে একে এসে যাবে।

এই সব কথাবার্ত্তার সময় সাবিত্রীদেবী সেখানে ছিলেন না। তিনি রন্ধনশালায় গিয়া ইঁহাদের জন্য রন্ধনাদির তদারক্ করিতে-ছিলেন। সাবিত্রীদেবী এখন প্রত্যহ পিতার জন্য দুই একটি দ্রব্য নিজ হস্তে রন্ধন করেন। বেলা বারটা বাজিতে বিলম্ব নাই দেখিয়া উপরে আসিয়া উভয়কে স্নানাদি সারিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন উভয়ে উঠিয়া স্নানের নিমিত্ত উদ্যানসরোবরে চলিলেন। স্নানাদির পর আহার সমাপন করিয়া উভয়ের বিশ্রামের মধ্য দিয়া সঙ্গীত ও আশ্রম সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা হইতে লাগিল।

সাবিত্রীদেবীর তৃতীয় প্রহরে গান সাধনার নিয়মিত সময় চারিটা পর্য্যন্ত। সেই সময় পর্য্যন্ত সাধনা করিয়া ইঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাবা! আজ জ্যেঠামশায় আছেন, চল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এই সময় মহেশতলায় সেই যন্ত্রীসাধুকে দর্শন করে আসি।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—যন্ত্রী সাধু কি রকম?

জমিদারমহাশয় বলিলেন,—এখান হ'তে প্রায় দু মাইল দূরে পাকা রাস্তার আধ মাইল তফাতে একটি ছোট জঙ্গলের পার্শ্বে বহুকালের তৈরী এক শিবমন্দির আছে। শুনা যায় ঐ মন্দির প্রায় হাজারবছর

পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়েছিল। পরে কোন এক সময়ে আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ সামনে ছোট একটি ইঁটের তৈরী নাটমন্দির করিয়ে দিয়েছিলেন। দুইটিই আজ বহুকাল হতে প্রায় ভগ্নাবস্থায় ছিল। মন্দিরমধ্যে শিবলিঙ্গটি ঠিকই ছিলেন। অনেককাল হতে পূজাও বন্ধ হয়ে গেছল। হঠাৎ আমার একদিন বড়ই ইচ্ছে হয়ে পড়ল মহেশতলার ঐ মন্দিরটির সংস্কার করে ৺মহেশবাবার পূজাদির বন্দোবস্ত করে দিই। মনে এই বাসনা নিয়ে সেখানে একদিন গিয়ে দেখি সেই ভগ্ন নাটমন্দিরটির মাঝখানে কম্বলাসনে বসে একটি সাধু সেতার বাজাচ্ছেন। আমি পিছন হতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনলেম। তাঁর বাজনা আমার খুবই ভাল লাগল। মনে হল বড়দরের শিল্পীদের বাজনার মত তাঁর হাত ত বটেই উপরন্তু স্থান ও পরিবেশের মাহাত্ম্যের গুণে তাঁর বাজনার সুর আমার মনে এক অপূর্বভাবের সৃষ্টি করে দিল। ভাবলেম, বাবা ৺মহেশের বোধহয় এতকাল পরে সঙ্গীত শোনবার ইচ্ছে হওয়ায় এই ভক্তশিল্পীটিকে টেনে এনেছেন। সাধুটির চুল, দাড়ির দীর্ঘত্ব বেশী নয় এবং মুখখানি যৌবন মাখান ও উজ্জ্বল, দেখে বেশী বয়স হয়েছে বলে মনে হ'ল না। যাই হ'ক তারপর বাজনা থামলে পর তাঁর নিকটে যেতেই তিনি হঠাৎ আমাকে দেখে চম্‌কে উঠলেন এবং উঠে দাঁড়ালেন। আমি পরম শ্রদ্ধাযুক্তভাবে বসতে বলে' তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেম। তিনি বল্লেন,—"আমি অনেকদিন হ'তে এই রকম একটি নির্জ্জন দেবালয় খুঁজছিলেম। অনেক জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শেষে বাবা ৺বিশ্বনাথ তাঁর কাছে টেনে এনেছেন। সত্যই এই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জঙ্গলের পার্শ্বে বিল্ববৃক্ষে সমাকীর্ণ বৃহৎ দীঘির উপর বাবার এই মন্দিরটির নির্জ্জন মনোরম শোভা আমার মন প্রাণ আকৃষ্ট করে রেখেছে।"

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেম,—আহারাদি কি করেন? তিনি বল্লেন,—"প্রাতঃকালে ৺বাবার পূজা করে তিন চারিটি বিল্বপত্র খেয়ে একঘটি জল খেয়ে নিই। আর আমার সমস্ত দিন কিছু খাবার দরকার হয় না, এইরূপ খাদ্যের দ্বারা ক্ষুধা নিবারণের ও দেহকে সুস্থভাবে রাখবার উপায়টি আমাকে একজন সাধু বলেছিলেন। তারপর রাত্রের জন্য ঐ অদূরে যে কয়েকঘর গরীবজাতির বাস আছে, তাদের দিয়ে সহর থেকে আটা ও কিছু আলু আনিয়ে নিয়ে দু চারটে রুটি তৈরী করে ৺বাবাকে নিবেদন করে প্রসাদ নিই।"

সাধুটির কাছে এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা গম্ভীরভাবে এসে গেল। আমি ফিরে এসে তার পরদিনই মন্দির সংস্কারের কাজে বহুলোক লাগিয়ে দিই এবং মন্দিরের নিকটে একটি বটবৃক্ষের তলে সাধুর জন্যে করগেটের ছাউনী দিয়ে ছোট্ট একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়ে দিয়েছি। পরে আমার সরকারমহাশয়কে বলে ব্যবস্থা করিয়েছি, প্রত্যেক সপ্তাহে পূজার জন্যে আতপচাল, চিনি, বাতাসা, দুগ্ধ এবং সাধুর জন্যে ঐ চাল, আটা, ঘি ইত্যাদি প্রয়োজন মত দ্রব্য পাঠাবার জন্যে। সাবিত্রীকে সেখানে একদিন নিয়ে যাব স্থির করে-ছিলেম। বেশ ভালই হ'ল চলুন এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া যাক। মা সাবিত্রী! তুই প্রস্তুত হয়ে নে এবং তোর নিতাইকাকাকে গাড়ীটা বের করতে বল। সন্ন্যাসীজী 'নিতাইকাকা' নাম শুনিয়া মনে মনে করিলেন, ইহাদের বংশ কত মহত্বেপূর্ণ। ড্রাইভার, বেয়ারা, রাঁধুনী, চাকরাণী ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া মানুষের অন্তরে আঘাত দেন না, এবং তাহাদের ছোট ভাবেন না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে মোটরে গিয়া উঠিলেন, এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেলেন। মোটরের শব্দ শুনিয়া নবীনসাধু কুটির হইতে

বাহির হইয়া তাঁহাদের সকলকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। মোটর হইতে নামিয়া সকলে সাধুকে সম্মান জ্ঞাপন পূর্ব্বক মন্দিরের নিকট যাইয়া বাবা ৺মহেশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। কিছুক্ষণ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—স্থানটি কি সুন্দর ও মনোরম; মনে হয় না এখান ছেড়ে কোথাও আর যাই। জমীদারমহাশয়ের ভৃত্য নাটমন্দিরের ভিতর একটি বৃহৎ কম্বলাসন বিছাইয়া রাখিয়াছিল, সকলে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার উপর উপবেশন করিলেন। জমিদার-মহাশয় যন্ত্রীসাধুর কাছে সন্ন্যাসীমহারাজের পরিচয় প্রদান করিলে পর সমস্ত শুনিয়া সাধু পরম শ্রদ্ধার সহিত সন্ন্যাসীজীকে নমস্কার নিবেদন করিলেন।

প্রতিনমস্কার জ্ঞাপন করিয়া সন্ন্যাসীজী সাধুকে বলিলেন,—আজ আমরা বেশীক্ষণ বোসবার অবকাশ পাব না, আপনি যদি দয়া করে' একটু সেতার শোনান তাহলে বড়ই কৃতার্থ হব।

সাধুবাবা করজোড়ে বলিলেন,—আপনাদের শোনাবার মত বাজনা আমি কিছুই জানি না, তবে আপনারা অনুগ্রহ করে শুনতে চাচ্ছেন তাই যতটুকু জানি ততটুকু আপনাদের শোনান আমার কর্ত্তব্য মনে করি। এই বলিয়া তিনি কুটির হইতে তাঁহার কাছোওয়া গঠনের মধ্যাকৃতির সেতারটি আনয়ন করিয়া সুর বাঁধিতে বসিলেন। সকলের অনুমতি লইয়া এবং বাবা ৺মহেশকে প্রণাম করিয়া 'সাঁঝগিরি' রাগের আলাপ সুরু করিলেন।

সাধুবাবার হাতের সুমধুর রসাল টিপ্ ও টানের উপর সাবলীল গতি ও স্থিতি এবং রাগরূপ প্রকাশের উপর নিবিড়ভাব ও সুন্দর দক্ষতা দৃষ্টে সকলে আশ্চর্য্য ও মোহিত হইয়া গেলেন। সুরশিল্পীসাধুবাবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ আলাপের বহুবিধ ক্রিয়া দেখাইয়া

বাজনা সমাধা করিলেন এবং নতমস্তকে হাত দুইটি জোড় করিয়া বাবা-৺মহেশের দিকে চাহিয়া মনে মনে কি যেন প্রার্থনা করিলেন।

বাজনা থামিয়া যাইলে পর সকলে পরম তৃপ্তির সহিত সাধুর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আপনি দেখছি একজন দক্ষশিল্পী, শুধু তাই নয়; আপনি 'সাঁঝগিরি' রাগের প্রকাশ যেরূপ সবিস্তারে দেখালেন ঐরূপ ভাবে আমি আর কারো কাছে শুনিনি। আপনার শিক্ষা খুব বড় ঘরানায় মনে হচ্ছে এবং আপনি যেরূপ পদ্ধতিমূলক আলাপের চতুরঙ্গ ক্রিয়াসকল দেখালেন তাতে আপনি যে গুণী যন্ত্রীর কাছে শিক্ষা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই ধ্রুপদেও বিশেষ অধিকারী। অর্থাৎ আপনার গুরুদেবের ঘরানা গান এবং যন্ত্র উভয়েরই। তা ছাড়া ত্রিবেণী, সাঁঝগিরি, গৌরী, শ্রী, ধ্যানশ্রী প্রভৃতি দিবা চতুর্থপ্রহরের নিকট-সম্পর্কযুক্ত ঐ রাগগুলির পরস্পরের পৃথকত্ব রক্ষা করে রাগদক্ষতা প্রকাশ করা ধ্রুপদী ঘরানা ছাড়া সম্ভব হয় না। আপনি বলুন আমার এ-কথা ঠিক কিনা?

যন্ত্রীসাধু বলিলেন,—আপনার কথা সমস্তই যথার্থভাবে সত্য বলে আমারও বিশ্বাস। আমার গুরুদেবের ঘরানা আসলে কণ্ঠসঙ্গীতের; তন্মধ্যে প্রধানতম ধ্রুপদের। তারপর গুরুদেবের জেঠামহাশয়ের দ্বারা তাঁদের ঘরানায় যন্ত্রেরও বিশেষভাবে চর্চ্চা বাড়ে। তিনি একজন বিখ্যাত ধ্রুপদী ও বীণকার ছিলেন। আমার গুরুদেব কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে সুরবাহার ও সেতারে বিশেষভাবে দখলকার ও গুণী।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আপনার অঙ্গুলি চালনার নিয়ম প্রণালী দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলেম যে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অঙ্গুলি চালনার পদ্ধতি বীণ বাজনার অনুরূপ। এই পদ্ধতি অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে আগাগোড়া স্বরসমূহ উৎপন্ন করে; কোনরূপে সুরের সূত্র জড়িয়ে

যায় না। আপনি যে ঝালারমধ্যে বহুপ্রকারের কৌশল দেখালেন তা কেবল এই পদ্ধতিতে বাজানর দ্বারাই সম্ভব হয়। আমি মহীশূরে দু' একজন বিখ্যাতবীণকারের বাজনা শুনেছি, তাঁরাও এইরূপ কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা ঝঙ্কারের তারে বহুপ্রকার ঝালার কৌশল দেখিয়েছিলেন। আপনার এই পদ্ধতির বাজনা আমার বড়ই ভাল লাগল। বেশীর ভাগ শিল্পীদের সেতার বাদনে দেখা যায় যে, প্রধান তারের সঙ্গে অন্য তারে আঘাতের স্পর্শ লেগে এমন একটা ঝন্ঝনানি শব্দ উৎপন্ন হয়, যেন মনেহয় সুরের গতিসুন্দর স্রোতধারার উপর আঁচড় কেটে ঐ অবাঞ্ছিত শব্দ রূপান্বিত সৌন্দর্য্যকে আঘাত করে' চলে এবং শ্রোতার মনে রাগের রূপ-রস পানে তিক্ততার সৃষ্টি করে; বিশেষতঃ যখন দুন চৌদুনের ক্রিয়াসমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। আর একটা জিনিষ, এই পদ্ধতির বাজনায় জোড়াতালি দিয়ে তান ইত্যাদি অল্প সাধনায় দেখাবার উপায় নেই। তার উপর আবার অচল ঠাটের কুড়ি পর্দ্দায় বাজান, আরো ভীষণ শক্ত।

জমিদারমহাশয় বলিলেন,—এঁর বাজনার মধ্যে আর একটা লক্ষ্য করবার আছে, যা' সবচেয়ে বড়; তা এই যে, রাগ রচনার মধ্যে সেই পরমবস্তুর ধ্যানে যেন ইনি ডুবে গেছলেন মনে হল এবং আমাদেরও যেন সেইদিকে শিল্পী নিয়ে চলেছিলেন। অবশ্য এর প্রধান কারণ হতে পারে স্থানের মাহাত্ম্য। এই বাজনা যদি মাইকের সামনে বহু লোকের কাছে হ'ত কিংবা দরবারে বিলাস সামগ্রীর মধ্যে বসে হ'ত তাহলে আমার মনে হয় এ জিনিষ সেখানে প্রকাশ পেত না এবং শিল্পীসাধককেও আমাদের এমন করে ভাবে আকুল করত না। এতেই আমরা বুঝতে পারি যে, সঙ্গীতের কোথায় ছিল স্থান, আর আজ আমরা তাকে কোথায় টেনে এনেছি।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—সত্য, খুবই সত্য একথা। এইজন্যেই ত আমি সঙ্গীতসাধকের কাছে যথার্থ সঙ্গীত শোনবার জন্যে এমন করে আগ্রহান্বিত থাকি।

সাধুবাবার দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আপনি কোথায় সেতার শিক্ষা করেছিলেন এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছেন জানতে পারি কি? আর একটা অনুরোধ, আপনার পরিচয়ও একটু দান করুন; অবশ্য যদি বিশেষ বাধা না থাকে।

সাধুবাবা বিনীতভাবে বলিলেন,—আমার শিক্ষা বাংলার এক বিখ্যাত ঘরানা গুণীর কাছে। আমি বাল্যকাল হতে প্রায় পনর বছর সেখানে ছিলাম। আমাদের বংশে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রতি বরাবরই সকলের বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমার মাতামহও একজন নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আমার পিতা সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে অনেক বৎসর হতে একস্থানে টোলের অধ্যাপক হয়ে আছেন। যাই হ'ক, দুই কুল হ'তে সঙ্গীতের প্রভাব শক্তির মহিমার গুণেই বোধহয় বাল্যকাল হ'তে আমার সঙ্গীতের প্রতি খুব আগ্রহ আসে। দেশের চতুষ্পার্শ্বে যেখানেই গানের আসর হ'ত সেখানে আমি লোকের সঙ্গে শুনতে যেতেম। এইরূপ ভাবে ক্রমশঃই সঙ্গীতের প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে চলে এবং শেখবার জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকে। যখন আমার দশ এগার বছর বয়েস, তখন লোকমুখে আমার এই সঙ্গীতগুরুর খুব সুনাম শুনে আমাদের গ্রাম হ'তে বহুদূরে তাঁর বাসস্থান সেই সহরের উদ্দেশ্যে একদিন কাউকে না জানিয়ে নিরুদ্দেশের মত বেরিয়ে পড়লেম। চারদিন পায়ে হেঁটে সেখানে পৌছে গুরুদেবের বাড়ীতে চাকরের কাজ পেলেম অনেক প্রার্থনার পর। সেইদিন হ'তে সেই বাড়ীতে যখনই গানবাজনা হত এবং ছাত্ররা শিখতে আসত তখন আমি কাজের

মধ্যেও কাণ খাড়া করে শুনতেম এবং মনে মনে গুন্‌গুন্‌ করে অনুকরণ করবার চেষ্টা করতেম। এরকম ভাবে দু'বছর গত হবার পরও যখন শেখবার কোন উপায় খুঁজে পেলেম না, তখন তাঁদের মন আমার প্রতি সদয় হবার জন্যে স্বইচ্ছায় তাঁদের রান্না করারও ভার নিলেম। এরকম ভাবে কিছুদিন যাবার পর ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করলেম। ওস্তাদজী আমার সঙ্গীত শিক্ষার ঐকান্তিক বাসনা বুঝতে পারলেন। তারপর থেকে কৃপাপরবশ হয়ে অল্প অল্প করে সা, রে, গা, মা, শেখাতে লাগলেন। শুনে শুনে যে আমি অনেক গান শিখে ফেলেছি সেকথা কাউকে জানাইনি। সময় করে নিয়ে মাঠের নির্জন-স্থানে বসে সেগুলো প্রতিদিন সাধতাম। শিষ্যরা যে সময় গান শিখতে আসত সে সময় আমি পূর্ব্বে হতে সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে নিয়ে দরজার আড়ালে থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করতেম এবং সেতারের উপর আঙ্গুল চালানর নিয়মগুলো লক্ষ্য করতেম। একদিন গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে একটি সেতার নিয়ে হস্তপাঠ কচ্ছি এমন সময় তিনি এসে পড়ে আমার বাজনার কায়দা দেখে বাড়ীর ভেতর চলে যান। সেইদিন রাত্রে আমাকে বললেন,—"তুই সেতার শিখতে চাস্‌ ত ঐ সেতারটা নিয়ে বাজাবি, আমি তোকে কতকগুলো হাত সাধবার নিয়ম আজ দেখিয়ে দিই। তবে গানের চর্চ্চা ছেড়ে দিস্‌নে; ভাল যন্ত্রী হতে হলে ভাল গায়ক হতে হয়, বুঝলি? তোর যে রকম বুদ্ধি আছে তাতে তুই দুটোকেই শিগ্‌গীর্‌ আয়ত্তে আনতে পারবি।" এই বলিয়া সেদিন সাধনার নিয়ম কৌশল অনেকগুলি দেখিয়ে দিলেন। রাত্রে সকলের খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে আমি খেয়ে নিয়ে প্রত্যহ চার ঘণ্টা করে সাধতে লাগলেম। গুরুদেব আমাকে স্নেহাদর করতেন কিনা তা কোনদিনই ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে শিক্ষাদানে তিনি

কারো প্রতি কোনদিন বিরক্ত হননি ও কার্পণ্য করতেন না। এজন্যে যোগ্যতা বা পাত্রাপাত্র কোনদিনই বিচার করেননি; যে যা চাইত তিনি তাই শিখিয়ে দিতেন। তাঁর এরকম উদার মনের জন্যে আমার খুব সুবিধা হয়েছিল। কারণ আমি কোনদিনই ত মনের ইচ্ছা জানান উচিত মনে করিনি, কিন্তু ছাত্ররা বড় বড় জিনিষ ফরমাস্ করে শিখতে চাইত বলে আমারও সেগুলো শুনে শুনে শেখা হয়ে যেত। কিছুকাল পরে ভীষণ অসুবিধায় আমাকে পড়তে হল। গুরুদেবের ছেলেরা যতই বড় হতে লাগলেন ততই তাঁরা আমার প্রতি ভীষণ অত্যাচারী ও হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে লাগলেন। নানারকম ভাবে তাঁরা আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এ বিষয় নিয়ে আমি কোনদিনই গুরুদেব বা গুরুমাকে অভিযোগ করিনি। যাই হ'ক, নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্যে সব কিছু সহ্য করে আরও কিছুকাল শিক্ষা ও সাধনা করে নিলেম। গুরুভাইদের ব্যবহারে মন আমার ক্রমশঃই খুব ভারাক্রান্ত হতে লাগল। তাঁরাও গান বাজনা করেন; তাই কেবলি মনে হত, স্বরব্রহ্মের সাধনা করে' মানুষের মন কি করে কুটিল ও হিংসাপরায়ণ হতে পারে? ওই দোষগুলো নিয়ে এ বিদ্যার চর্চ্চা কেন তারা করতে যায়? এই সমস্ত বেদনাকর চিন্তা আমার মনের মধ্যে আলোড়িত হতে হতে অন্তরে ভয় এসে গেল যে, বোধহয় সংসারের মধ্যে থাকলেই মানুষ নিজের স্বার্থের জন্যে এই সমস্ত দোষগুলোকে ত্যাগ করতে পারে না। যাই হ'ক এইসব দেখে ও অভিজ্ঞতা পেয়ে আমার সংসারের উপর বিতৃষ্ণা এসে গেল। তাই একদিন ভগবানের নাম স্মরণ করে' এই পথে বেরিয়ে পড়লেম। মনে মনে সঙ্কল্প করলেম যে, এই ব্রহ্মবিদ্যা আজকাল যখন হিংসুটে বিদ্যায় পরিণত হয়েছে তখন আর আমি এ বিদ্যার ব্যবসা কোনদিনই

করব না এবং সেইদিন এও প্রতিজ্ঞা করলেম যে, আমার দ্বারা যেন কোনদিন গুরুভাইদের কোনরূপ সুনাম, পদমর্য্যাদা ও অন্য কোনরকম ক্ষতি না হয়। সেই প্রতিজ্ঞার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমি কোনদিনই লোকালয়ে গীতবাদ্য করি না। তারপর থেকে আজ প্রায় সাত আট বছর নানা স্থানে ভ্রমণ করে' সম্প্রতি এই মনোরম স্থানটিতে থাকবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। জমিদারমহাশয় অনুগ্রহ করে এই দেবালয়টিতে থাকতে দিয়ে এবং সকল রকম সুব্যবস্থা করে দিয়ে আমার বহুদিনের মনোবঞ্ছা পূর্ণ করে কৃতার্থ করেছেন। আমি এখন পরম সুখে আছি। দেবাদিদেবমহেশ্বরের চরণতলে পড়ে থাকতে পেয়েছি এবং তাঁর চরণে আমার অতি সামান্য শক্তির যৎকিঞ্চিৎ সুরের ঝঙ্কার নিবেদন করতে পাচ্ছি, এরচেয়ে আমার আর কোন কামনা নেই।

জমিদারমহাশয় যন্ত্রীসাধুকে বলিলেন,—আপনার মত ব্যক্তির প্রতি সামান্য কিছু কর্ত্তব্য পালন করতে পেয়েছি বলে আমি নিজকে ধন্য মনে করেছি; ভগবান আপনাকে যথার্থ পথেই নিয়ে এসেছেন। বর্ত্তমান সঙ্গীতসংসারের পঙ্কিলপথে না হেঁটে সেখান থেকে স'রে এসে আপনি সুরের পবিত্র ভাগীরথী-তীরে বিচরণ কর্চ্ছেন; তাছাড়া এই সরলতা নিয়ে আপনি ঐ কুটীল ব্যবসার পথে নামলেও বিশেষ কিছু করতে পারতেন বলে মনে হয় না। কারণ, আমাদের দেশে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিক্ষা, সাধনা ও উপযুক্ত অধিকার এ-গুলোর দাবীকে বাদ দিয়ে ষোল আনা ভাগ্যবিধাতার উপর নির্ভর করে চলতে হবে। ঐ বিধাতাটি আবার যেমন তেমন নন্; উনি বড় ঢাকের ভক্ত। তাই বলছি, আপনি ঢাকের দেশ থেকে সরে' এসে ভালই করেছেন। তবে জানবেন আপনার এতবড় সাধনা কখনই বৃথা যাবেনা। এর পুরস্কার ভগবান আপনাকে দিবেনই।

সন্ন্যাসীমহারাজ সাধুবাবাকে বলিলেন,—আপনার জীবনের ও গুণের পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েছি। সত্যই আপনি একজন সঙ্গীতের আদর্শ পূজারী। ভগবান আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেনই। আজ আমরা এখন তাহলে উঠি; আবার এরূপ সৌভাগ্য-লাভের জন্যে অন্তরে খুব ইচ্ছুক হয়ে রইলেম।

এই বলিয়া সাধুবাবাকে সকলে গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়া পরে বাবা ৺মহেশকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক সেইদিনকার মত বিদায় লইলেন।

যাইতে যাইতে সন্ন্যাসীমহারাজ বলিতে লাগিলেন,—সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জাতির কল্যাণের জন্যে মানুষ যদি কোন মহৎ সঙ্কল্পে ব্রতী হয় তাহলে ভগবান সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সব রকম উপায়ই করে দেন। আশ্রমের জন্যে একজন উপযুক্ত যন্ত্রীর কথা চিন্তা করছিলেম, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বাবা ৺মহেশ্বর যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিকে এনে রেখে দিয়েছেন। কি আশ্চর্য্য দেখুন, এজন্যেই এতদিন পরে আপনার মন্দিরের সংস্কার কার্য্যের কথা মনে পড়ে গেছল। আমরা যখন নিজের বুদ্ধিতে ধরতে পারি, তখনই তাঁর মহিমা উপলব্ধি করি। আর যে পর্য্যন্ত বড় রকম একটা অনুভব বা প্রত্যক্ষ লাভ না আসে সে পর্য্যন্ত আমরা তাঁকে ভুলে থেকে নিজের ক্ষমতাকেই বড় করে দেখি। আমরা এটুকু বুঝতে চেষ্টা করি না যে, তাঁর মহিমা, প্রকাশ ও কর্তৃত্ব সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বসময় বিরাজ করছে; সত্যকারের মানুষের উপর করুণা করবার জন্যে তাঁর দৃষ্টি যেমন সর্ব্বদা প্রসারিত হয়ে আছে তেমনি আবার অন্যায়কারীর প্রতি শাস্তি দিতেও তাঁর কালবিলম্ব হয় না। মানুষ যদি সেই পরমব্রহ্মস্বরূপ সত্যকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে' চলে তাহলে কোন কার্য্যই অসিদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না।

এই কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী জমিদারবাড়ীর ফটকের সামনে আসিয়া পৌছিয়া গেল।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

মাণিক যখন একরকম নিরুদ্দেশের মতই দেশ থেকে ভিন্নগ্রামের একটি যুবকের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহারা প্রথমতঃ গিয়া উঠে রাণীগঞ্জঅঞ্চলের একটি কোলিয়ারীতে। সেখানে গিয়া উভয়ে খাদের নীচে কয়লা কাটার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যায়। কুলীবস্তীর একপ্রান্তের একটি ছোট্ট ঘর তাহারা দুইজনে পায়, এবং সেখানেই উভয়ে একত্রে বাস করিতে থাকে।

কোলিয়ারীগুলির কুলি-মজুর বস্তীর অবস্থা ও তাহার মধ্যে যে সমস্ত নারকীয় দৃশ্য বিদ্যমান আছে তাহার বর্ণনা করা এস্থলে অনাবশ্যক। ওই সব জায়গায় যাহারা কাজ করিতে আসে তাহাদের মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগ ব্যক্তিরই নৈতিক অধঃপতন ঘটিতে বিলম্ব হয় না। কুলি মজুরদিগকে খাটান ও হাজিরা ইত্যাদি কার্য্যের জন্য পল্লীঅঞ্চল হইতে যে সকল সামান্য লেখাপড়া জানা ভদ্রবংশের ছেলেরা এইস্থলে চাকরী করিতে আসে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে আসে এই কুলীবস্তীতে রাত্রিকালে বিচরণ করিতে। কুলি ও মজুরদের মধ্যে পুরুষ, নারী সকলকেই এই প্রভুদের কাছে অনেক বিষয়েই তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের চারিত্রীকাদি অত্যাচার নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল ও অসহায় এই জাতিদের অনুপায় হইয়া সহ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ গা সওয়া হইয়া যায় এবং তখন তাহাদের মধ্যেও অনেকে উল্লাস মত্ততায় যোগ দিয়া নৈশকালকে বীভৎস নরকে পরিণত করে।

কর্ম্মে নিযুক্ত পল্লীর ভদ্রসন্তানেরা ওই সমস্ত কুলি মজুরের কাছে

দস্তরি ও হাজিরা প্রভৃতি নানা পদ্ধতির দ্বারা বেশ দুই পয়সা শুধু হস্তগতই করে না অনেকে তাহার সঙ্গে কুলিরমণীদিগকেও হস্তগত করে। এইরূপ নানা কার্য্যের দ্বারা তাহারা নিজেদের জীবন অত্যাচারে বিপন্ন করিতে থাকে। বর্ত্তমান যুগে দুর্ভাগা বাঙ্গালী সন্তানদের যে কত রকম ভাবেই ক্ষতি হইতেছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যাহাই হউক এখন মাণিকের কোলিয়ারীতে কিছুকাল থাকিবার পর আর একটি খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু জুটিয়া গেল। এই বন্ধুটি হইল শক্তিরাণীর মামাত ভাই। আজ সে বৎসরাবধি এই কোলিয়ারীতে কাজ করিতেছে; তাহার ডাক নাম পচাই। এই পচাইএর প্রভাবে পড়িয়া মাণিক ও তাহার বন্ধু পটল উভয়েই অল্প অল্প করিয়া সুরাপানাদি দোষ ধরিল।

একদিন যখন এই তিন বন্ধুতে রাত্রিকালে সুরাপান করিতে লাগিল তখন হঠাৎ কথার ছলে পচাই বলিল, ছাখ্ ভাই, আমার পিসির খুব ভাল ছাখতে একটা মেঁয়া আছে। তার এখনও বিয়া হয় নাই। মাণিকের যেমন সুন্দর চেয়ারা তেমনি যদি ঐ সুঁদরী মেঁয়াটার সঁঘে উয়ার বিয়া হয় তাহলে বেশ মানাবেক এবং মাণিকের সঁঘে আমার সম্মন্দটাও খুব ঘন হঁয়ে উঠবেক। তাছাড়া রাত্যে চাটের মাঁস রাঁধাবারও খুব সুবিদা হঁবেক্। শুনেছি কোন্ একটা সাধু সেখানে আস্তে বাঁসা গেড়ে বসেঁছে এবং বুনটাকে গান শিখাঁচ্চে। ভালুই হবেক আমরা এখানে খুব তার গান শুনব। ওঃ কি মজাটাই না আমাদের তখন হঁবেক্। আমার এখনই ফুর্ত্তিতে নাচতে ইচ্ছা কচ্ছে।

এই বলিয়া পচাইচন্দ্র নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মাণিক ও পটল তাহার সঙ্গে আনন্দে নৃত্য সুরু করিল এবং গাহিতে লাগিল :—

পচাই দাদার সুন্দরী বুন্ আসবে যেদিন ঘঁরে
হাঁড়ি ধরে 'পচাই মদ' খাব পেট্‌টি ভঁরে………।

নাচিতে নাচিতে ক্ষণেক পরে যখন পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেল তখন তিনজনে বসিয়া পড়িল। মাণিক ও পটলচন্দ্র বলিল,—পচাই দাদা! তাহলে আমাদের কবে তোর পিসির মেঁয়াকে দেখাবি বল?

পচাই বলিল,—বেশত, আসছে রোববার ছুটির দিন রেলে করে সেখানে যাঁওয়া যাক। আমি পিসিদের ওখানে আজ পাঁচ ছ'বছর যাই নাই। অনেকদিন পরে যাওয়ার জন্যে তারা খুব খুঁসী হবেক। তার উপর আদরীর জন্যে ভাল বর যখন লিয়ে যাচ্ছি তখন ত কথাই নাই। বাবার মুখে শুনেচি আদরী এখন বেশ বড় হইচে। তবে সে নাকি এখন সেই সাধুটার পাল্লায় পড়ে সাধুনী সেঁজে থাকে। যাই হ'ক, মাণিককে দেখলে তার ওসব বুজরুকী আর থাকবেক নাই। সাধুটা লিশ্চয়ই তাকে তুক্‌তাক্ করেছে। আর পিসি-পিস্যাও এক লম্বরের বোকা, তা নাহলে অতবড় মেঁয়েটাকে একটা চুল-দাড়ি-পরা ভণ্ড সাধুর কাছে যাত্যে দেয়? যাই হ'ক মাণিককে দেখলে তারা লিশ্চয়ই জামাই করবার ইচ্ছা করবেক।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর যথাদিনে সেই রবিবারে তাহারা আদরীদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। পচাইচন্দ্র পথিমধ্যে শরীর ও মনটাকে একটু চাঙ্গা করিয়া লইয়াছিল। বহুদিন পরে ভাইপোকে দেখিয়া শক্তি-রাণীর মা খুব খুসী হইল এবং পচাইএর কাছে তাহার বন্ধু দুইটির পরিচয় পাইয়া খুব আদর আপ্যায়ন করিল। শক্তিরাণীর পিতা আহারের জোগাড়ের জন্ম নিকটবর্ত্তি গ্রামে রওনা হইয়া গেল।

মধ্যাহ্নে সঙ্গীতসাধকের ওখান হইতে বাড়ীতে আসিয়া হঠাৎ তিনটি যুবককে দেখিয়া শক্তিরাণী খুবই আশ্চর্য্য হইল। মাণিক ও পটল শক্তি-রাণীর অপূর্ব্ব চেহারা দেখিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে ভেবাকান্তের মত তাহার দিকে

হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহা দৃষ্টে শক্তিরাণী তাহাদের প্রতি ভ্রূকুটি করিয়া ঘৃণাভরে সরিয়া গেল।

পচাইচন্দ্র শক্তিরাণীর কাছে যাইয়া বলিল,—আদরি! তুই আমায় চিনতে লাচ্ছ্‌স? আমি পচাই, তোর দাদা। তুই এখন বেশ বড় হইচুস রে! এবং দেখতেও বেশটি হইচুস্!

পচাইএর মুখ থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ পাইয়া ও কথাবার্ত্তার ধরণ দেখিয়া শক্তিরাণী সরোষে বলিল,—তোমাকে চিনব না কেন, কিন্তু চেহারা সম্বন্ধে তুমি দাদা হয়ে ওকথা কি করে বললে? ছিঃ,—তারপর ঐ দুটো জানোয়ারকে এখানে কি জন্যে এনেছ শুনি?

পচাইচন্দ্র বলিল,—তুই আমার অমন ভাল সাঙ্গাত দুটিকে জানোয়ার বল্‌লি! সাধুনী সাজ্যে যে দেখছি তুই ভারি ভদ্দর মানুষ হেঁয়ে গেছুস্। ঐ যে সুন্দর কুঁকড়ান চুলআওলা ছেল্যাটিকে দেখলি ঐটির সঁঘে তোর বিয়া দিব বলে আন্যেছি এবং তাই তোকে দ্যাখবার জন্যে ওরা আসেঁ্যছে। পিসি ও পিস্তার সঁঘে এই লিয়ে কথা কঁয়েছি, তারা বলেছে, তোর মত হলে তাদের অমত হবেক নাই। আমি তাদের বুঝায়েঁ বলেছি যে, এমন চাঁদের মত ছেল্যাকে দেখে তোর আবার মত হবেক নাই! তাছাড়া তোকে ঐ যে ভণ্ড সাধুটা তুক্‌তাক্ করে রাখ্যেছে তার কাছ থেঁকে উদ্ধার করে মাণিকের সঁঘে বিয়া দিয়ে কোলিয়ারীতে লিয়ে যাবই।

শক্তিরাণী পচাইএর এইরূপ কথা শুনিয়া পুচ্ছমর্দ্দিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,—মামাত ভাই বলে তোমাকে বেশী করে অপমান করতে চাইনা; নচেৎ তুমি আমার প্রভুজীর সম্বন্ধে যেকথা উচ্চারণ করলে তার প্রতিফল দিতাম তোমার মুখে ঝ্যাটা গুঁজে। তোমরা এক্ষুনি বেরিয়ে যাও এ বাড়ী থেকে।

শক্তিরাণীর জোরগলার আওয়াজ শুনিয়া তাহার মা 'কি হল? কি হল?' বলিয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়া শক্তিরাণীর অবস্থার চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। শক্তিরাণীকে এরূপ ক্রোধান্বিতা মূর্ত্তিতে কখনও কেহ দেখে নাই।

শক্তিরাণী বলিল,—মা! তুমি এদের যাহোক দুটো খাইয়ে বিদেয় করে দাও। আর একটা কথা জেনে রাখ, আমার বিয়ে-টিয়ের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই তোমরা কখন কর' না। আমি এখন ঠাকুরস্থানে চললাম। যে অপরাধজনক কথা কানে শুনলাম, তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এই লোকগুলো চলে গেলে পর আমাকে খবর দিবে, তারপর আসব। এই বলিয়া শক্তিরাণী দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শক্তিরাণীরমা ও পচাইচন্দ্র প্রভৃতি সকলে হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাণিক এই ব্যাপারে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল, শক্তিরাণীরমা পচাইকে ও তাহার বন্ধুকে বলিল,—তোমরা কিছু মনে করনা বাবা, ও ভীষণ একগুঁয়ে মেয়ে। তোমরা এবেলা খাওয়া দাওয়া কর, তারপর বরং ওবেলা যেও।

পচাইচন্দ্র তাহার পিসিকে রাগভরে বলিল,—তোমার মেঁয়া যেরকম ভাবে আমাদের অপমান করে গেল তারপরেও কি আমাদের এক মিনিট এখানে থাকা উচিত মনে কর? চল মাণিক আমরা চলে যাই। এই বলিয়া তিনজনে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শক্তিরাণীরমা ক্ষোভে, দুঃখে ও লজ্জায় তাহাদের গমন পথের দিকে তাকাইয়া রহিল, কোন কথাই আর বলিতে পারিল না॥

* * * * *

লক্ষ্মী সেইদিন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সহায়তায় বাসে চড়িয়া ধানবাদ

সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে পৌছিয়া সহরের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, "কি করিব, উপস্থিত কোথায় যাইব এবং কি উপায়ে স্বামীর সন্ধান পাইব ?" ইত্যাদি।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় এখন তাহার সহরে একা বিচরণ করিতে ভয় পাইতে লাগিল। যাহাই হউক, সে মনে মনে স্থির করিল, "সহরের মধ্যে থাকা চলিবে না; একটু নির্জন পল্লী খুঁজিয়া সেইখানে যাওয়া যাক্।" এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া চলিতে চলিতে অনেকদূর আসিয়া ক্লান্তি বশতঃ রাস্তার ধারে একটি অশ্বথ বৃক্ষের তলে বাঁধান বেদীর উপর বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ বসিয়া অনেকটা ক্লান্তি দূর হইলে পর মনে মনে ভাবিল,—"একটা গান গাহিলে লোকজন নিশ্চয়ই আসিবে, তখনসেই সমস্ত লোকজনদের মধ্যে যাঁহার কাছে সাহায্য লওয়া উপযুক্ত মনে করিব তাঁহার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিব।" এই ভাবিয়া একতারাটির সুর বাঁধিয়া স্বরচিত নিম্নলিখিত গানটি গ্রাম্য সুরে গাহিতে আরম্ভ করিল :—

বাসা মোর ভেঙ্গে গেছে কালবৈশাখীর নিঠুর ঝড়ে
অদৃষ্ট নিয়তির শাপ পড়ল ভীষণ আমার 'পরে।
পিতামাতার পক্ষপুট কেড়ে করল তাঁদের লুট
ঘুরে বেড়াই একাকিনী নূতন বাসা বাঁধার তরে।
মণিহারা ফণীর মত খুঁজব কোথা অবিরত
দাও দেখিয়ে দয়াল ঠাকুর রেখোনা আর আঁধার করে'॥

লক্ষ্মীর সুমধুরকণ্ঠ শুনিবামাত্র চতুষ্পার্শ্বের স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতি বহু লোক জড় হইয়া গেল। লক্ষ্মী গাহিতেছে আর তাহার গণ্ডবহিয়া দর দর ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। তাহা দৃষ্টে ও তাহার অপূর্ব্ব কণ্ঠের করুণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলের মন দ্রবীভূত হইয়া গেল। সেইস্থানের বিশেষ পরিচিত ও মাননীয় একবৃদ্ধবৈষ্ণববাবাজী সেই

সময় ওই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন ; তিনিও লক্ষ্মীর গানে আকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। ইনি একজন এই অঞ্চলের বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া। লক্ষ্মীর ঐ গানটি শেষ হইয়া যাইলে পর অতি করুণ ও মমতাযুক্ত বাক্যে বৃদ্ধবাবাজী কহিলেন,—মা লক্ষ্মী! তুমি কীর্ত্তন গান যদি জান তাহলে একখানি গাওত মা ?

লক্ষ্মী তখন কীর্ত্তনের সুরে এই গানটি গাইতে লাগিল :—

শ্যাম দরশনে মথুরা গমনে
আকুল করিল মন
একদা শ্রীরাধা মানিল না বাধা
ছাড়িল বৃন্দাবন।
আলুথালু বেশ মাথে রুক্ষ কেশ
যেন পাগলিনী পারা
চলিত চরণ ক্ষত বিক্ষত
রক্তের বহে ধারা।
সব ক্লেশ সয়ে ডাকে র'য়ে র'য়ে
কোথা হে মনমোহন
ভাবি নাই প্রভু ছেড়ে যাবে কভু
কাঁদিয়া যাবে জীবন।
এইরূপ ভাবে কৃষ্ণময় ভাবে
ছুটিয়া চলিছে প্যারি
যত চরাচর কাঁদে ঝর্ ঝর্
রাধার দুঃখ হেরি।
কহে কিঙ্করে যে পিরীতি করে
বিরহে দহিবে প্রাণ

পাবেনা কাছেতে চিরকাল চিতে
যাবে করি তাঁর ধ্যান ॥

লক্ষ্মীর প্রাণমাতান অপূর্ব্বকণ্ঠের শ্রীরাধার বিরহাকুল বর্ণনযুক্ত কীর্ত্তন গানটি শুনিয়া বৈষ্ণববাবাজী ভাবে এমন বিভোর হইয়া গেলেন, যে তাঁহার মনে হইতে লাগিল বুঝি স্বয়ং শ্রীরাধা যেন গান গাহিয়া সেইরূপভাবে মথুরায় যাইতেছেন। লক্ষ্মীর উপর তাঁহার ভক্তিও সেইরূপ ভাবে আসিয়া গেল। গান থামিয়া যাইলে পরও তিনি নিজেকে কিছুক্ষণ প্রকৃতস্থ করিতে পারিলেন না; চোখ দিয়া কেবল তাঁহার জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। লক্ষ্মী তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল মানুষটিকে! তাই গান শেষ করিয়া বৃদ্ধবাবাজীর পায়ের কাছে বসিয়া ডাকিল—বাবা!

বৈষ্ণববাবাজী চক্ষু মেলিয়া আকুলভাবে লক্ষ্মীর হাত দুইটি পরম আদরে ধরিয়া বলিলেন,—ওরে তুই কে রে? তুই কি আমার সেই আরাধনার ধন শ্রীরাধা আবার মানুষ রূপ ধারণ করে এই ধরাতে প্রেমের বন্যায় মানুষকে ভাসিয়ে ধন্য, পবিত্র ও মুক্ত করতে এসেছিস?

এই বলিয়া ভাবে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে উপস্থিত সমস্ত লোকই অভিভূত হইয়া গেল এবং তাহাদেরও চোখের জল রোধ হইল না।

লক্ষ্মী অতি বিনীতভাবে বলিল,—বাবা! আমি অতি নীচজাতির সামান্যা নারী। আপনি পরম ধাম্মিক, ভাবুক ও প্রেমিক, তাই এরকম আপনহারা হয়ে পড়েছেন। আমার উপর পরমারাধ্যার নাম উচ্চারণ করে আমাকে অপরাধিনী করবেন না বাবা!

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—না—না—তুই নিজেকে এমনভাবে ছোট জাত মনে করিস না। হ্যাঁ-মা! যে এমন ভক্তিভাবে পরমভাবের রচনা ও

সুর কণ্ঠে প্রকাশ করে' মানুষের প্রেমাশ্রু বর্ষণ করাতে পারে তার মধ্যে কি জাতের ছোট বড়ত্বের ব্যবধান থাকে? কারো জাতি নিয়ে বিচার করা জন্ম ও দেহ নিয়ে নয় রে পাগ্‌লী! কর্ম্ম, ধর্ম্ম, সাধনা, জ্ঞান, ভক্তি, পবিত্রতা ও প্রেম এইগুলি নিয়েই হয় মানুষের যথার্থ স্থানের বিচার। ঐগুলি যাদের মধ্যে থাকে তারাই হ'ল যথার্থ মানুষ এবং সকল জাতের উর্দ্ধে তাদের হয় স্থান। তোকে দেখে আমার শ্রদ্ধা কেন এল বল দেখি? তোর মধ্যে সেই পরমবস্তুটি আছে বলেই ত আমি সাক্ষাৎ শ্রীরাধার মত তোকে মনে করতে পারলাম। তোকে দেখলে কার না মনে হবে যে তুই একটি পরম সত্যের পুজারিণী ও পবিত্রা মেয়ে! যাক্ এখন বল্‌ত মা, তুই কোথা হতে আসছিস্ এবং কেনই বা তোর এ বেশ ও এরূপ পাগলিনীর মত অবস্থা?

লক্ষ্মী তাহার জীবনের সমস্ত পরিচয় ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিল। সেই সময় লোকজন সকল যে যাহার কার্য্যে চলিয়া গেল; কেবল দুই একজন স্ত্রীলোক ও কয়েকটি শিশু অদূরে তখনও অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বৃদ্ধ বৈষ্ণববাবাজী সমস্ত কথা শুনিয়া প্রগাঢ় স্নেহ ও মমতাযুক্ত হইয়া বলিলেন,—মা তুই আমার বাড়ীতে চল; আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেহ সংসারে নাই। তুই সেখানে তাঁর কাছে নিজের মেয়ের মত স্নেহাদরে থাকবি। দিনকাল বড় খারাপ মা, তোর এ অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান নিরাপদ হবে না। আমার বহু শিষ্য আছে, তাদের দিয়ে তোর আরাধ্যস্বামীর জন্যে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করাব এবং আমি নিজেও যতদূর সাধ্য চেষ্টা করব। তোর কোন চিন্তা নাই, ভগবান তোর মঙ্গল করবেনই; তুই শান্ত ও সুস্থির হয়ে আমার বাড়ীতে থাকবি চল। আর একটা কথা, তোর এই মাত্র কীর্ত্তন

গান শুনে আমার মনে হচ্ছে যে আমার জানা কীর্ত্তন গানগুলি তোকে শেখাব। আমার গানের বহু শিষ্য আছে বটে কিন্তু এখন বুঝছি আমার গানগুলি তোর কাছেই যথার্থভাবে রক্ষা পাবে।

গানের পরমভক্তালক্ষ্মী কৃতার্থ হৃদয়ে বলিল,—বাবা! আমার মনের যেরূপ অবস্থা তাতে করে কি আমি এখন অত বড় কঠিন গান মনযোগ দিয়ে শিখ্‌তে পারব?

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—মা, তোর এই সময়ই ত কীর্ত্তন শেখবার প্রকৃত সময়। গোষ্ঠলীলা, মান, বিরহ, মাথুর প্রভৃতির লীলাকীর্ত্তন যখন তোকে শেখাব তখন তুই-ই প্রকৃত ভাববিভোর হয়ে গাইতে পারবি এবং আমাকেও সেই ভাবের ঘোরে মাতওয়ারা করে দিতে পারবি। তোর গানের ভাবময়স্বরে আকাশ, বাতাস শ্রীরাধার বিরহে কাঁদতে থাকবে; আমিও লীলাময়ের লীলামাহাত্ম্যে আপন হারা হয়ে সেই ক্রন্দনের সঙ্গে ক্রন্দন মিশাব। লক্ষ্মীমাআমার, এবার চল্‌ আমার ঘরে, আমাকে ধন্য করবি। এমন ধরণের কথাগুলো শুনে এ-বুড়োকে পাগল মনে করিস না মা; তবে মা আমি সত্যই শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তনের ভাবে পাগল হয়ে আছি। জানি না, যাঁরা গান করেন তাঁদের সকলেরই এ-গান ভাল লাগে কিনা। আমার মনে হয় আমাদের দেশের সকল জাতির সকল মানুষের জন্যে এর মত প্রয়োজনীয় সঙ্গীত আর নাই। আমাকে একজন বড় গায়ক বলেছিলেন যে,—"যিনি যত বড়ই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে অধিকারী হোন না কেন, তিনি যদি কীর্ত্তন গানের কিছুও চর্চ্চা করেন তাহলে আমার মনে হয় অন্ততঃ জীবনের শেষ সময়েও ঐ গানই ভাবে আকুল করে কাঁদাবে ও আত্মাকে সত্যকারের তৃপ্তিদান করবে।"

বৈষ্ণববাবাজীর এই সমস্ত সারগর্ভ বাক্যগুলি শুনিতে শুনিতে লক্ষ্মীর মন বহু উর্দ্ধের দিকে চলিয়া গেল।

উভয়ে চলিতে চলিতে গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলে পর বৈষ্ণববাবাজী তাঁহার গৃহিণীকে দরজা খুলিয়া দিবার জন্ম ডাকিলেন। গৃহিণী দরজা খুলিয়া স্বামীর সহিত পরম স্নেহাকর্ষিণী মেয়েটিকে দেখিয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

বৈষ্ণববাবাজী তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন,—মেয়েটিকে আদর করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে চল।

গৃহিণীর হস্ত প্রসারিত হইয়াই ছিল। বলিবামাত্র পরম আদরের সহিত গৃহের ভিতর লইয়া গেলেন এবং হাত মুখ ধুইবার জন্য জলরক্ষার স্থান দেখাইয়া দিয়া লক্ষ্মীর জন্ম খাবারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী হাত মুখ ধুইয়া বৈষ্ণবপত্নীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কাছটিতে বসিল। বৈষ্ণবগৃহিণী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চিবুকে হাত দিয়া চুমো খাইয়া বলিলেন,—মা, তুই এইখানটিতে আসনে বোস, আমি ভাত নিয়ে আসছি। এই বলিয়া থালায় করিয়া আতপান্ন এবং কিছু ব্যঞ্জন ও একবাটি দুগ্ধ আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—খাও মা লক্ষ্মী আমার।

লক্ষ্মী বলিল,—বেলা অনেক হয়েছে, বাবার বোধহয় খাওয়া হয়নি এবং আপনারও তাহলে হয়নি। আপনারা আগে খেয়ে নিন্, তারপরে আমি আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করব।

বৈষ্ণবগৃহিণী বলিলেন,—পাগ্‌লী মেয়ে, তা কি হয়। তুই যে আজ থেকে আমার মেয়ে হলি রে! তোকে আগে না খাইয়ে কি আমরা খেতে পারি? তুই খেতে বোস্, আমি ওঁকেও তোর কাছে খেতে

দিচ্ছি। আমরা ত মাছটাছ খাই না, নিরামিষ খাই, তোর খেতে কষ্ট হবে, নয় রে ?

লক্ষ্মী বলিল,—না মা, আমার কিছু কষ্ট হবে না। আমিও জন্মাবধি নিরামিষ খেয়ে আসছি। বাবার ধারণা ছিল, খাদ্যের গুণাগুণের উপর মানুষেরও গুণাগুণ অনেকখানি নির্ভর করে। তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন যে, নিরামিষ দ্রব্য আহারের দ্বারা মানুষের মন শান্তভাবাপন্ন হয় এবং তাব দ্বারা সাত্ত্বিক ভাব আসে। আমিষ দ্রব্য মানুষকে ক্রোধী করে, উত্তেজিত করে এবং নীতিভ্রষ্টও করে দিতে পারে। তিনি আমাকে ছেলেবেলায় উপমা দিয়ে বলেছিলেন, "ত্যাখ্, যে সকল জীবজন্তু নিরামিষাশী, তারা কত শান্ত প্রকৃতির, এবং সহ্যশীল ও কর্ম্মে কষ্টসহিষ্ণু;—যেমন হাতী, গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি। আর যারা আমিষাশী,—যেমন সিংহ, বাঘ, শেয়াল, সাপ ইত্যাদি, এরা ত্যাখ্ কত হিংস্র হয় এবং ধূর্ত্ত, চঞ্চল, অস্থিরচিত্ত ও হত্যাকারী হয়। সুতরাং মানুষেরও খাদ্যের উপর অনেকখানি রীতিনীতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে।" আমার বাবা ও মা তাঁরাও কখন আমিষ জিনিষ খেতেন না।

বৈষ্ণববাবাজী ও তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"পিতামাতা ভাল না হইলে কি এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে পারে ?"

বৈষ্ণববাবাজী খাইতে খাইতে তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্মীর জীবন বৃত্তান্তের পরিচয় যাহা লক্ষ্মীর কাছে শুনিয়াছিলেন তাহা সমস্ত বলিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে চোখ মুছিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মীকে কোলের কাছটিতে লওয়ার মত করিয়া লইয়া বসিলেন। লক্ষ্মীর চোখে জল আসিতেছে দেখিয়া নিজ অঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া কর্ত্তাকে

বলিলেন,—এখন এসকল কথা থাক, পরে শুনব। আগে মেয়েটার খাওয়া হয়ে যাক।

লক্ষ্মী খাইতে খাইতে বলিল,—আমার অদৃষ্টে কি এত আদর যত্ন সহ্য হবে মা! আমি যে বড়ই অভাগিনী।

বৈষ্ণবগৃহিণী লক্ষ্মীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—খুব সহ্য হবে মা, তুমি যে সত্যই লক্ষ্মীর মত। তোমাকে যে দেখবে সেই স্বয়ং লক্ষ্মীর মত ভেবে আদরযত্ন ও শ্রদ্ধা করবে। তুমি নারীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার বাপ-মায়ের রাখা নাম যথার্থ হ'ক—এই ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি। তুমি নিজের বাপ-মা হারিয়েছ বটে কিন্তু কত বাপ-মা তোমার মত সন্তান পাবার জন্যে কামনা করছে। তুমিও সকলকে নিজের বাপমায়ের মত দেখতে শিখেছ, একি কম তপস্যার ফল! সর্ব্বদা সেই শ্রীহরিকে স্মরণ রাখবে তাহলে সব কামনাই পূর্ণ হবে॥

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সেই তার পরদিন প্রাতে সন্ন্যাসীমহারাজ জমীদারমহাশয়ের বাটি হইতে রওনা হইয়া মঠে ফিরিয়া আসিয়া আশ্রম তৈয়ারী সম্বন্ধে জমীদার-মহাশয়ের দান ও ব্যবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে পত্র দ্বারা লিখিয়া সঙ্গীতসাধকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাতে এ কথাও লিখিয়া জানাইলেন যে, "আগামী কল্য বেলা ৩টার মধ্যে জমীদারমহাশয় প্রভৃতি আমরা সকলে আপনার ওখানে গিয়া পৌছিব; সেই সময় শঙ্করাণীকেও থাকিতে বলিবেন।" তাহার পর বহুস্থান হইতে যে সকল চিঠি-পত্রাদি আসিয়াছে সেইগুলি পড়িতে পড়িতে একটি খাম খুলিয়া দেখিলেন যে, সেই নূতন প্রতিষ্ঠিত শাখার সেবা কর্ম্মী তাঁহাদের কার্য্যাদির বিবরণী প্রদান করিয়া পরিশেষে হরিজনকন্যা—লক্ষ্মীর বিষয় সবিস্তারে লিখিয়া তাহার নিরুদ্দেশের কথা ও সুন্দর গঠনাকৃতির পরিচয় দিয়া সন্ন্যাসীমহারাজের কাছে এই বলিয়া সবিনয় অনুরোধ করিয়াছেন,— "যদি মেয়েটির কোন সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইলে আপনি তাহার সংবাদ আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। ঐ কন্যাটিরদেশের দুইটি মানুষ বিশেষ করিয়া তাহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও দুঃখে কাতর হইয়া আছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কোন সন্ধান এ পর্য্যন্ত তাহারা করিতে পারে নাই। এই স্বামী—স্ত্রী মানুষ দুইটি অতি সৎচরিত্র, সজ্জন, পরোপকারী এবং দয়ার্দ্রচিত্ত।"

সন্ন্যাসীমহারাজ পত্রে যতদূর লক্ষ্মীমেয়েটির পরিচয় জানিতে পারিলেন তাহাতে তিনি বিশেষ ভাবে আশ্চর্য্য হইলেন এবং মনে মনে তাহার সন্ধান রাখিবার জন্য সঙ্কল্প করিলেন।

তৎপরদিবস যথাসময়ে মোটরে করিয়া জমীদার মহাশয় সাবিত্রী-দেবী, একজন ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্‌টর্ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীমহারাজ সকলকে অভিবাদন ও সাবিত্রীদেবীকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এবং সকলের কাছে তিনিও যথোচিত শ্রদ্ধা পাইয়া এবং সাবিত্রীদেবীর প্রণাম গ্রহণ করিয়া সকলকে সঙ্গীতসাধকের নিকট লইয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে সাবিত্রীদেবী সন্ন্যাসীমহারাজের কানে কানে বলিলেন,—"আজ প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা হয়ে গেলে পর সাধকজীকে অনুরোধ করবেন, যেন তিনি দয়া করে আমাদের একটু গান শোনান।"

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—নিশ্চয়ই বলব, আমারও অনেকদিন তাঁর গান শোনা হয়নি এবং শক্তিরাণী কেমন গাচ্ছে তাও কোনদিন কাণে শোনা হয়নি। আজ উভয়েরই গান শোনবার আকাঙ্খা রইল।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সকলে কুটির সমীপে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীতসাধক ইহাদের আগমন নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি কুটির হইতে নামিয়া আসিয়া সকলকে সসম্মানে অভ্যর্থনাসহকারে কুটিরের দাওয়ায় বসাইলেন।

শক্তিরাণী পূর্ব্বেই দূর হইতে দেখিতে পাইয়া দৌড়াইয়া ইহাদের কাছে গিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে সন্ন্যাসীজীকে জমীদার-মহাশয়কে, সাবিত্রীদেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম এবং অন্য দুই জনকে নত হইয়া নমস্কার জানাইল।

সাবিত্রীদেবীও শক্তিরাণীকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতের কাছে আসিতেছে—এইরূপ ভাবে তাঁহার মনের মধ্যে আনন্দের উচ্ছল বেগ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই দুইটি নারীর এইরূপ অপরূপ নিবিড় অন্তরঙ্গ ভাব দর্শনে সকলের মন মুগ্ধ হইয়া গেল।

ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্‌টর্‌মহাশয় শক্তিরাণীকে দেখিয়া বিস্ময়ে গভীর

ভাবযুক্ত হইয়া মনে করিলেন "যেন শ্রীদুর্গা কিরাতিনীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সামনে অবতীর্ণা হইলেন। তাঁহারা একসময় দেখিয়াছিলেন একজন বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা একখানি পটে হর-পার্ব্বতী অর্জ্জুনকে ছদ্মবেশে পরীক্ষা করিবার জন্য কিরাত-কিরাতিণী রূপ ধারণ করিয়াছেন। পার্ব্বতীর সেই রূপ ধারণের মূর্ত্তিটি এমন অপূর্ব্ব ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তাহাতেই শিল্পী বিখ্যাত নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজ শক্তিরাণীকে দেখিয়া তাঁহাদের সেই মুখ সেই গঠন ও ভঙ্গীটি হুবহু মনে পড়িয়া গিয়া অন্তরে বিশেষভাবে ভক্তি আসিয়া গেল। তাঁহাদের যেন মনে হইতে লাগিল কতকগুলি বিল্বপত্র ও জবাপুষ্প আনিয়া তাহাকে পূজা করি।" বর্ত্তমানে শক্তিরাণীর রূপের মধ্যে এম্‌নি এক অপূর্ব্ব ভক্তি আকর্ষণকারী পবিত্রভাব উজ্জ্বল হইয়া আছে।

সাবিত্রীদেবী আজ আর মনের মধ্যে কোনরূপ সঙ্কোচ না রাখিয়া সঙ্গীতসাধকের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রণাম করিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ শক্তিরাণীকে সাবিত্রীদেবীর বর্ত্তমান অবস্থা সমস্ত জানাইলেন।

শক্তিরাণী বলিল,—আমি দিদিরাণীকে দেখেই বুঝে নিয়েছি যে, তিনি আদর্শকে গভীরভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। আমি জানি দিদিরাণীর নামের সার্থকতা আসবেই এবং সঙ্গীতেও তিনি একজন আদর্শা নারী হবেন।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—আর তুমি?

শক্তিরাণী বলিল,—আমি হব আপনাদের সেবিকা, সঙ্গীতে ও কর্ম্মে।

সাবিত্রীদেবী শক্তিরাণীকে কোলের কাছে নিবিড়ভাবে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—তুমি আমার আদর্শময়ী প্রতিমা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা ও নিবৃত্তি।

উপস্থিত সকলেই এই নারী দুইটির মধ্যে একাত্মভাব দেখিয়া ও

উচ্চস্তরের কথাগুলি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ইহার পর আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন সন্ন্যাসীমহারাজ। তিনি সঙ্গীতসাধককে বলিলেন,—আপনাকে পূর্ব্বে সমস্ত কথা জানিয়েছি, এখন কিরকম ভাবে আশ্রম তৈরী হবে সেইজন্যেই জমীদারমহাশয় আমাদের নিয়ে এসেছেন। ইনি এ সম্বন্ধে একটা নক্সা এঁকেও এনেছেন। এখন এই সমস্ত বিষয় আলোচিত হ'ক।

ইঞ্জিনীয়ার ও কনট্রাক্টরমহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—আগে আমরা সকলে জায়গাটা ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখে আসি। তারপর নক্সা দেখে কিরূপভাবে আশ্রমের ঘর তৈরি হবে তা ঠিক করা যাবে।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—সেই ভাল কথা, চলুন যাওয়া যাক। এই বলিয়া সকলের সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—আমি ও শক্তি এখানে থেকে গান-বাজনা বিষয়ের আলোচনা করি, আপনারা ঘুরে আসুন।

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—সেই ভাল, আপনারা দুটিতে মিলে আলাপ আলোচনা করুন, আমরা ঘুরে আসি। এই বলিয়া তাঁহারা চারজন বাহির হইয়া গিয়া বহুক্ষণ করিয়া স্থান নিরূপণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে তখন সাবিত্রীদেবী ও শক্তিরাণীর মধ্যে নানাবিধ কথার পর শক্তিরাণী বলিল,—দিদিরাণী! আপনি আজ এইসময় আমাকে একটু দয়া করে গান শোনান। আমার তম্বুরাটি এখানেই আছে, নিয়ে আসি।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—নিয়ে আয়, আজ আমার এমনভাবে তোকে একা পেয়ে সুযোগ সুবিধা যখন ভাগ্যে ঘটে গেল তখন এ সুযোগ আমি কি ছাড়তে পারি! আমার সাধনা ঠিক পথে চল্‌ছে কিনা তা তোর কাছে আমার জেনে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে। আমার দোষ ত্রুটিগুলি কিন্তু সংশোধন করে দিস্ বোন্।

শক্তিরাণী বলিল,—দিদিরাণী আপনি কি বলছেন? আমি আপনার পরীক্ষক হব? আপনি অন্তরে যে গুরুকে লাভ করেছেন তাঁর কৃপায় আপনার কোনই অভাব থাকবে না। তাঁর সাধনার সমস্ত শক্তি আপনার সাধনার মধ্যে দিয়ে কণ্ঠে প্রকাশ হতে থাকবে।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—দেখ্ শক্তি! তুই বোন্ আমাকে অত বড় বড় কথা শোনাসনে, তাহলে আমি হয়ত আবার নেমে পড়ব। আমার এখনও সর্ব্বদা ভয় করে পাছে আবার না মতিভ্রম আসে!

শক্তিরাণী বলিলেন,—দিদিরাণী! সে ভয় আপনাকে করতে হবে না, সোনার সঙ্গে সোহাগা মিশ্রিত হলে সোনার সমস্ত কালিমা দূর হয়ে তার খাঁটি রূপ আরো উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে।

ছদ্ম ভৎর্সনারস্বরে সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—আবার ঐ সব কথা! যা ভাই তম্বুরাটি নিয়ে আয়।

শক্তিরাণী খুব আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া তম্বুরাটি আনিয়া সাবিত্রীদেবীর কোলের কাছে রক্ষা করিল।

সাবিত্রীদেবী তম্বুরাটিকে মস্তকে ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং গুরুকে ও নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাদের প্রণাম করিয়া তম্বুরার সুর বাঁধিয়া বলিলেন,—আমি একটি পূরবী রাগের চৌতাল গাচ্ছি, তুইও বোধহয় এ গানটি জানিস্। আমি স্থায়ী অংশটি গাইলে পর তুইও ঐ অংশটি গাইবি কেমন? তাহলে আমি আমার ভুল ত্রুটিগুলো বুঝতে পারব।

এই বলিয়া পূরবীর এই ধ্রুপদটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

"সূরজ বংশ নমো গুরু ইষ্ট
হমারে দশরথসুত রাজারাম।......"

গানটি উভয়ে ছাড়্ ও ধরতাই ভাবে গাওয়াকালিন সন্ন্যাসীমহারাজ

প্রভৃতি সকলে কুটিরের নিকট আসিবামাত্র গান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সকলেই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

গানটি শেষ হইয়া যাইলে পর সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—বাঃ—বাঃ কি চমৎকার যে লাগল তা বলে বুঝান যায় না। কে যে কম বেশী তা বুঝা যাচ্ছিল না, তবে মনে হচ্ছিল শক্তিরাণীর কণ্ঠ যেন আরো উচ্চস্তরের ভাব ও দরদে ভরা। মীড় ও টানগুলি সে যখন তুলছিল তখন আমার ভিতরের প্রাণবস্তুকেও যেন আনন্দে আলোড়িত করে দিচ্ছিল। সাবিত্রীর এরপর যদি সময় সময় সাধকজীর গান শোনবার সুযোগ হয় তাহলে যা-যা অভাব আছে তা পূরণ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করি।

এদিকে সাবিত্রীদেবী গান শেষ করিয়া শক্তিরাণীর গলা জড়াইয়া আদরের স্বরে বলিলেন,—তোর গানের দুরত্বের ছোঁয়া পেতে আমাকে এখনও বহুকাল তপস্যা করে যেতে হবে। তুই আর আমি ঠিক যেন গুরু শিষ্যের মত অবস্থায় আছি।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাধকজী প্রভৃতি সকলে তাহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রীদেবীর শেষের কথাগুলি শুনিয়া জমীদারমহাশয় ও সন্ন্যাসীজী পরিতোষ লাভ করিলেন।

সাধকজী সকলকে বিনয় সহকারে বলিলেন,—আপনাদের চা খাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু আমার এখানে সে ব্যবস্থার কোনই আয়োজন নেই, এ জন্যে মনে বড় দুঃখ হচ্ছে। যাই হ'ক শক্তিরাণী আপনাদের জন্যে সরবত্ ও কিছু ছানা তৈরি করে এনে রেখেছে, যদি আপনারা অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন তাহলে সে ও আমি উভয়েই খুব খুসী হব।

জমীদারমহাশয় আনন্দের সহিত বলিলেন,—খুব ভাল জিনিষ আমাদের জন্যে করে রাখা হয়েছে। এ সময় সরবত্ই উৎকৃষ্ট পানীয়

এবং ছানা উৎকৃষ্ট সন্দেশেরই জনক। কাজেই দুইটিই উপযুক্ত খাদ্য। অন্যান্য সকলেও এই কথার সমর্থন জানাইয়া আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

শক্তিরাণী তাহাদের পল্লী হইতে পাথরের বড় বড় বাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল; তাহাতে করিয়া সুমিষ্ট ও অম্লস্বাদযুক্ত স্থানীয় জংলী পিয়ালফলের সরবত্ ও শালপত্রে করিয়া ছানা এবং নূতন আখের গুড় সকলকে পরম ভক্তি সহকারে পরিবেশন করিল।

সকলে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু সরবত্ পান করিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে তাহার খুব প্রশংসা করিলেন।

জমীদারমহাশয় বলিলেন, জংলী ফলের যে এমন সুন্দর সরবত্ হয় তা আমার ধারণা ছিল না।

ইঞ্জিনিয়ারমহাশয় বলিলেন,—সত্যই উপাদেয়, তাছাড়া ছানাটিও অতি লোভনীয়। দেশী গাইএর খাঁটি দুধ হতে তৈরি হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল যেন সুগন্ধযুক্ত মাখম খাচ্ছি, তাছাড়া যিনি আমাদের দিলেন তাঁর হাতের স্পর্শ পেয়ে খাদ্য দুইটিকে পরম পবিত্র করে দিয়েছিল এবং আমাদের অন্তরকেও।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—এ কথাটির মত যথার্থ উপমা আর নেই।

কণ্ট্রাক্টরমহাশয় বলিলেন,—সত্যই এরূপ জিনিষ খেলে মনে হয় যেন শরীর রক্ষার জন্যে কিছু খেলেম। আমাদের রুচির এমন বিকৃতি ঘটেছে যে, চা, বিস্কুট, চপ, কাটলেট ও দোকানের দ্রব্য প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর খাদ্যগুলির পরিণাম বুঝেও বদ্অভ্যাসের দরুণ ওগুলোর প্রভাবে পড়ে আমরা শরীরের সর্ব্বনাশ করে যাচ্ছি। মুড়ি, গুড়, চিড়ে, দুধ, নারকেল, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি প্রধান খাদ্যগুলি উপেক্ষিত হয়ে এখন ঐগুলিই ভদ্র খাদ্যরূপে সভ্যতা ও লৌকিকতার আদরের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিমন্ত্রিত লোকজনকে দালদা, ভেজিটেবল্ নামীয় ভীষণ কালান্তক বস্তুটির দ্বারা লুচি

করে খাইয়ে অসুখ ধরাব তবুও ভাত, ডাল, সুক্তো, চচ্চড়ি, ডাল্না, পায়েস প্রভৃতি রান্না খাইয়ে লোকজনের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চলবে না ; তাহলে কর্ম্ম কর্ত্তার ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মান সম্মানে আঘাত লাগবে। কি মানসিক বিকার যে আমাদের মধ্যে জন্মেছে তা বলে শেষ করা যায় না। আমার মনে হয় সত্যকারের জাতির মঙ্গল করতে হলে সর্ব্বাগ্রে দেশ থেকে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যগুলির উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। যাই হ'ক আসুন এখন আমরা জমীদারমহাশয়ের অঙ্কিত নক্সাটি কিরূপ হয়েছে দেখি।

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—আমি পূর্ব্বাহ্নে একটা অনুরোধ জানিয়ে রাখছি এই যে, আশ্রমটি তৈরি হয় ঠিক যেন আশ্রমের মত করেই। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সৃষ্ট বস্তুকে অহেতুক এনে শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলির মধ্যে যেন কোনরূপ আয়াস আনয়ন না করে।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আপনার উদ্দেশ্য ও কামনাকে আমি অনেকখানি উপলব্ধি করতে পেরেছি বলে মনে করি, এবং আমারও সেইরূপ মনের বাসনা আছে, তাই প্ল্যান ও নক্সাটা সেই ধরনেই অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছি। আপনাদের বুঝিয়ে দিই, তারপর ভাল মন্দ আপনারা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন।

এই বলিয়া জমীদারমহাশয় নক্সাখানি খুলিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—এই বিরাট সম ও অসমতল ক্ষেত্রের উপর উত্তর সীমানায় কিছু অংশ বাদ রেখে সুদীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে দুইটি কুটির হবে। একটি হবে বৃহৎ তিন কামরা বিশিষ্ট, আর একটি হবে তদপেক্ষা ছোট দুই কামরা বিশিষ্ট। এই দুইটি কুটিরের পশ্চাৎদিকের অনেকখানি জায়গায় নানাবিধ ফল ও শাক সব্জীর বাগান হবে এবং সামনে থাকবে ফুলের বাগান। এই দুইটি কুটিরের মধ্যে বৃহৎটিতে থাকবেন সাধকজীর গুরুদেব

এবং দ্বিতীয়টিতে থাকবেন আমাদের সাধকজী। তারপর গুরুদেবের কুটিরের দুই পার্শ্বের সম্মুখবর্ত্তী দশটি করিয়া একক বাসের উপযোগী কুটির নির্ম্মিত হবে। এই কুটির গুলিতেও অনুরূপভাবে কিছু ফল ও ফুলের বাগান থাকবে। মধ্যের বিস্তৃত খোলা জায়গা শ্যামলতৃণে আবৃত করে রাখতে হবে। এই কুড়িটি কুটির হবে নারীশিক্ষার্থিনীদের জন্যে। এঁদের তত্ত্বাবধানের ভার সাধকজীর গুরুদেব ও গুরুমায়ের উপর অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। এই মহিলা বিভাগের চতুষ্পার্শ্ব পাকা ইঁটের প্রাচীর দিয়ে তৈরি হবে। এই ঘেরার মধ্যেই থাকবে রন্ধনশালা, ভাঁড়ার ঘর, স্নানের ঘর, ইন্দারা এবং সেনিটারী শৌচাগার ইত্যাদি। ঠিক এইরূপ ভাবে সাধকজীর দুই পার্শ্বে দশটি করে কুড়িটি কুটির তৈরি হবে ছাত্রদের জন্য এবং প্রত্যেক কুটিরটি আলাদাভাবে উচু করে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া থাকবে এবং তাতে মেহদী গাছ দিয়ে ঘিরে আড়াল করে দেওয়া হবে। এই কুটির গুলির চতুর্দ্দিকে ইঁটের প্রাচীর দেওয়ার আবশ্যক মনে করি না। তারপর অন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় গৃহ মহিলা বিভাগের মতই হবে। কেবল এর মধ্যস্থলের বিরাট জায়গাটিতে একটি সুন্দর সরোবর তৈরি করা হবে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে লাল কাঁকর দিয়ে রাস্তা তৈরি হবে। তারপর এই দেখুন, পশ্চিম ও পূর্ব্বাংশে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পাঁচটি করে ঐ রকমভাবে ফল ও ফুলের বাগানের মধ্যে দুই কামরা যুক্ত শিক্ষাগুরুদের জন্যে কুটির নির্ম্মিত হবে এবং তৎসঙ্গে থাকবে প্রত্যেকটীর জন্যে রন্ধনশালা, ছোট ইন্দারা, স্নানেরঘর ও সেনিটারী শৌচাগার ইত্যাদি। এইগুলির প্রত্যেকটির চতুর্দ্দিকে খানিকটা উঁচু করে ইটের প্রাচীর থাকবে। প্রত্যেক কুটির নির্ম্মিত হবে মাটির দেয়াল দিয়ে ও খড়ের ছাউনীর দ্বারা এবং তার চতুর্দ্দিকে কাঠের খুঁটির সাহায্যে বারাণ্ডা থাকবে, কারণ তা না হলে বর্ষায় জলের ঝাট পেয়ে দেয়ালকে

গলিয়ে দেবে। তা ছাড়া চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডার মত থাকলে ঘোরা ফেরার মধ্যে প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে মনকে প্রফুল্ল রাখবে এবং কুটিরগুলি দেখতেও সুন্দর হবে। গুরুদেবের দুই পার্শ্বে কুটিরের শেষ মধ্যস্থলে একটি বিরাট আকারে ফটক্ তৈরী করা হবে এবং তার কিছুদূরে একটি বড় আকারে খড়ের ছাউনীযুক্ত আটচালা নির্ম্মিত হবে। সেখানে প্রয়োজন মত সঙ্গীতের অধিবেশন, আসর এবং প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় উপাসনা হবে। আশ্রমের প্রান্তে একটি বড় রকম গো-শালা করতে হবে তাতে অন্ততঃ কুড়িটি গাই এবং দু একটি বৃষ রাখতে হবে। এই হ'ল আমার আশ্রম তৈরির জন্য মোটামুটি প্ল্যান। তাছাড়া এই ক্ষুদ্র নদীটির উপর একটি সেতু তৈরী করাতে হবে, এবং এখান হ'তে মঠ পর্য্যন্ত একটি চওড়া লালকাঁকরে বাঁধান রাস্তা তৈরী হবে। এরপর অন্যান্য লোকজনের থাকবার জন্যে হয়ত আরো দু চারটে কুটির করবার প্রয়োজন হবে। যাই হ'ক এখন আপনারা এই প্ল্যানের বিষয় বিবেচনা করে দেখুন।

সাধকজী, সন্ন্যাসীমহারাজ এবং অন্যান্য সকলেই বলিলেন,—অতি উত্তম পরিকল্পনা হয়েছে। এর উপর আমাদের কিছু বলবার নেই। খুব আদর্শযুক্তই আপনি নক্সাটি তৈরী করেছেন।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—কিন্তু এ যে বিরাট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, কি করে হয়ে উঠবে তাই ভাবছি!

জমীদারমহাশয় সবিনয়ে করজোড়ে বলিলেন,—আপনাদের কিছু ভাবতে হবেনা, ভগবান সমস্তই করিয়ে দেবেন। আমার নিকট তাঁর রাখা গচ্ছিত ধন তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ীই ব্যয় হবে। এই সমস্ত তৈরীর জন্যে খরচ যা পড়বে তাছাড়া আরো দু লক্ষ টাকা আশ্রম খরচ চালানর জন্যে দিতে পারব বলে মনে করে রেখেছি।

ইহা শুনিয়া সাবিত্রীদেবী ব্যতিরেকে অন্যান্য সকলে অবাক হইয়া

গেলেন। সন্ন্যাসীমহারাজের ও সাধকজীর জমীদারমহাশয়ের উপর শ্রদ্ধায় চক্ষে জল আসিয়া গেল। সাধকজী অতি শ্রদ্ধাযুক্তভাবে জমীদারমহাশয়কে বলিলেন,—আমার যে টুকু বাসনা ছিল তার বহু উর্দ্ধে আপনি প্রকৃত আশ্রমের উপযোগী করে নক্সা তৈরী করেছেন। আপনার এতদূর আদর্শজ্ঞান ও দূরদর্শিতা আছে তা আমি বুঝতে পারিনি; যে কথা বলে আপনাকে আমি সতর্ক করতে গেছলেম সেটা স্মরণ হয়ে ভীষণ লজ্জা অনুভব করছি।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—এ জন্যে আপনার লজ্জা করবার কিছু নেই। বরং সর্ব্বদা আমাদের প্রতি সৎ উপদেশ দেবার আপনার অধিকার আছে এবং তাতে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হবে।

কণ্ট্রাক্টরমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া জমীদারমহাশয় বলিলেন,— তাহলে আপনি এবার আমাকে একটা শীগ্‌গীর্‌ মধ্যে হিসেব দেবেন এরূপ আশ্রম তৈরির জন্যে কিরূপ খরচ পড়বে এবং উপস্থিত আপনার কত টাকা লাগবে তাও জানাবেন। ইঞ্জিনীয়ার বাবু! আপনিও আপনার এক্সিয়ারের তৈরী জিনিষগুলোর খরচেরও একটা হিসেব জানাবেন। মোটের উপর আগামী সপ্তাহ থেকে যাতে করে আপনাদের কাজ আরম্ভ হয় তার জন্য আপনারা প্রস্তুত হন। বিলম্বে ভাল কাজে বহু বিঘ্ন এসে পড়ে। আমার ইচ্ছে, আগামী ঝুলনপূর্ণিমার দিন আশ্রমের উদ্বোধন হোক। আমি পোবৃশুর মধ্যে পাকা লেখা পড়ার কাজ সেরে নিচ্ছি।

তারপর জমীদারমহাশয় সন্ন্যাসীজীকে বলিলেন,—মহারাজজী! এরপর আপনার যা, যা, কর্ত্তব্য আছে সেগুলো অল্প অল্প করে আরম্ভ করে দিন। আমার মনে হয় আশ্রম তৈরী হতে আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা প্রভৃতির সমস্ত নিয়ম তালিকা তৈরী

করে নিতে হবে এবং এই প্রদেশের সরকারকে এবং চতুর্দ্দিকে নিয়মিত-ভাবে ও সংবাদপত্রের মারফত্ জানাতে হবে।
সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—সমস্ত পরিকল্পনাই আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। উপস্থিত আমাদের একটা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে এই যে, গুরুদেবকে সমস্ত বিষয় জানিয়ে, তাঁর কাছে শিক্ষার নিয়মাবলী ও আশ্রমের আদর্শ সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এই কথা শুনিয়া জমীদারমহাশয় ও সাধকজী বলিলেন,—এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও কর্ত্তব্যের কথা। তাঁর উপদেশ ছাড়া কিছু হতেই পারে না। পরে জমীদারমহাশয় বলিলেন,—তাহলে শীগ্গীর্ মধ্যে সকলে চলুন তাঁর কাছে যাওয়া যাক।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—বাবা! আমিও যাব তাঁদের দর্শন করতে। এতকাল সেখানে ছিলেম, অথচ এত বড় গুণীমহাত্মাকে আমরা চিন্‌বার চেষ্টাও করিনি। শক্তিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

শক্তিরাণী বলিল,—দিদিরাণী, প্রভুজী যাচ্ছেন, সুতরাং তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাকে এই কুটির রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সকাল সন্ধ্যায় কতকগুলি কর্ত্তব্যকর্ম্ম আছে; সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালান এবং গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে পূজাপাঠ আছে। সুতরাং আমার কি করে যাওয়া চলবে বলুন? এজন্যে কিছু মনে করবেন না দিদি।

ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্রাক্টর্‌মহাশয় জমীদার মহাশয়কে বলিলেন,—আমাদের তাহলে এখন বিদায় দিন, এই ট্রেনে চলে যাই; আপনার সঙ্গে কবে দেখা করব?

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—যদি সম্ভবপর হয় তাহলে কাল বিকেলে সমস্ত হিসেব পত্র নিয়ে আসবেন। আর এক কাজ করুন, মঠ পর্য্যন্ত গিয়ে সেখান হতে আমার মোটরে করে আপনারা ষ্টেশনে চলে যান;

অতটা পথ আপনাদের কষ্ট করে হাঁটতে হবে না।

তাঁহারা "যে আজ্ঞে," বলিয়া সকলকে প্রীতি নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ সাধকজীকে বলিলেন,—আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলল। প্রকৃত সাধনার ফল কত শীঘ্র লাভ হয় তারই শিক্ষা আজ আমরা পেলেম। আমাদের আজ আনন্দের দিন। সুতরাং আপনি এখন আমাদের একটু গান শোনান। এখানে এখন বেসমঝ্‌দার কেউ নেই বোধ হয়। এই বলিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ একটু রসিকতার হাসি হাসিলেন। সঙ্গীতসাধক অতি আনন্দিত চিত্তে হাস্য সহকারে উত্তর দিলেন,—বেগায়কের কাছে বেসমঝ্‌দার্ থাকলে দোষের হয় না। এই বলিয়া শক্তিরাণীকে বলিলেন,—আমার তম্বুরাটি গুরুদেবকে প্রণাম করে নিয়ে এস। বলা মাত্র শক্তিরাণী তম্বুরাটি আনিয়া সাধকজীর হস্তে প্রদান করিল।

সাধকজী সুর বাঁধিয়া গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ রাগ আমার মুখে শুনলে অন্ততঃ কিছুও আপনাদের ইচ্ছে পূরণ হয়ে ভাল লাগতে পারে তাই দয়া করে বলুন।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—যখন অনুমতি দান করলেন, তখন আমার ইচ্ছে আপনি অনুগ্রহ করে "বসন্তরাগ" শোনান। এখন চৈত্রের প্রথম, কাজেই বসন্তরাগই বেশী ভাল লাগবে।

সাধক প্রসন্নচিত্তে বসন্তরাগের আলাপ আরম্ভ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা রাগের আলাপ ও পরে একটি চৌতাল এবং দ্রুতগতিতে সুরফাঁকতাল তালের গমকী গান গাহিয়া শেষ করিলেন। গানের সময় আঙ্গিনার উপর একটি ময়ুর পুচ্ছ মেলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল ও গান থামিয়া যাইলে পর কয়েকটি কোকিল কুহু কুহু রবে চতুর্দ্দিক

ভরিয়া দিল এবং ফুলের সৌরভে সমস্ত স্থানটি আমোদিত করিল।

গান যে বন্ধ হইয়া গিয়াছে ইহা বুঝিতে অনেকক্ষণ যাবৎ কাহারও বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল না। তাহার পর স্বপ্নোত্থিতের মত সকলে যেন জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নয়নে তখনও সঙ্গীতের ভাবে প্রেমাশ্রু পড়িতেছিল।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—ধন্য আপনার পবিত্র সাধনা ও একাগ্রতা এবং গুরুর কৃপা। সঙ্গীতের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে আপনি ব্রতী হয়েছেন। সে ব্রত আপনার যথাযথ ভাবেই উদ্‌যাপন হবে। সঙ্গীতাশ্রম রূপ মহৎ কার্য্যের জন্যে ভগবান যে আমাকে এই দিকে মতি গতি ও প্রেরণা দিলেন তার জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও কৃতার্থ মনে করছি। সত্যই আমার পিতৃপুরুষদের পুণ্যের জোরেই আজ আমার এত বড় একটা কল্যাণকর কার্য্যে কিছু করবার জন্যে জ্ঞান ও বুদ্ধি এসে গেছে। এখন রাগ সম্বন্ধে একটা কথা নিবেদন করি; আপনি যে ভাবে বসন্তরাগ গাইলেন অর্থাৎ এইরূপ প্রাচীন ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিমূলক এবং এত বড় বলিষ্ঠ ও সুন্দর বসন্তকালের উপযোগীভাবযুক্তরাগকে বর্জ্জন করে' আজকাল অনেক সঙ্গীতজ্ঞ এই রাগকে প্রকাশ করেন পরজ্ রাগের সহিত আপনার এই বিশুদ্ধ বসন্তের শুদ্ধ মধ্যমটিকে মাঝে মাঝে লাগিয়ে এক "জগাখিচুড়ী" করে। আমি একজন দেশের বর্ত্তমান নাম করা গায়ককে জিজ্ঞেস করে বলেছিলেম,—"আচ্ছা ছয়টি যে প্রধান রাগ আছে অথবা যে গুলিকে আমরা প্রধান রাগ বলি, সেগুলি কি সালঙ্ক বা সঙ্কীর্ণ শ্রেণীর হতে পারে? আপনারা যে ভাবে এই বসন্ত গাচ্ছেন তাকে ত মিশ্রণ ছাড়া খাটি রাগ বলা চলে না। তাছাড়া এর প্রাচীন ধ্রুপদ আপনাদের জানা আছে কি? তাহলে দয়া করে আমাকে দু চার খানা শোনান। আর একটা কথা রাগরূপ অঙ্কনের জন্যে দুটো স্বরকে

প্রধান দুটো অঙ্গের মূল হিসেবে গ্রহণ করবার নিয়ম আছে অর্থাৎ যে দুটো স্বর অন্য সমস্ত স্বরকে পরিচালিত করে' রাগরূপ উৎপাদন করে, কোন্ সে দুটো স্বরকে আপনারা এই রাগ অঙ্কনে গ্রহণ করেছেন বলুন? দেখতে পাচ্ছি, আপনারা আরোহণে মধ্যম ও পঞ্চম স্বর ব্যবহার করছেন না, সুতরাং ও দুটো স্বর বাদী, সংবাদী হতেই পারেনা। আর গান্ধার নিষাদকেও বাদী, সংবাদী রূপে ধার্য্য করতে পারেন না। কারণ আপনাদের রাগ প্রকাশের সময় ও দুটি স্বরের বেশী প্রকাশ শক্তি নেই, অধিক ব্যবহারে ভয় আছে, পাছে একেবারে পরজের মত হয়ে পড়ে বলে'। তাহলে কি এই বুঝব যে এতবড় একটা রাগের রূপরক্ষা সম্বন্ধে আপনারা কোনরূপ নিয়ম সঙ্গত ব্যবস্থা মানতে চান না? তা যদি না চান তাহলে আপনাদের দোহাই দিয়ে এরপরে ক্রমশঃ সমস্ত রাগের উপরেই অজ্ঞলোকেরা যথেচ্ছাচার ব্যবহার করবে। আপনারা যদি বলেন, শুনতে ভাল লাগে বলে গাই; তাহলে সে কথা তারাও বলবে। কাজেই নিয়ম, রীতি, নীতি, বিজ্ঞান ও ব্যাকরণকে মেনে চলতেই হবে এত বড় বিরাট বস্তুকে যথার্থভাবে রক্ষা করতে হলে। বেশত আপনাদের যদি ঐ রকম স্বরের রূপকে ভাল লাগে তাহলে আপনারা ওর নাম দিন 'পরজ-বসন্ত'।" আমার এইসমস্ত কথা শুনে শেষে তিনি আমার মন্তব্য ও যুক্তি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিলেন। এখন আপনি বলুন আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি?

জমীদারমহাশয়ের রাগরূপের উপর বিচারের যথার্থ শক্তি দেখিয়া সাধকজী অত্যন্ত খুসী হইয়া মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—আপনি অতি যুক্তিপূর্ণ কথাই বলেছিলেন। প্রত্যেক রাগের পৃথক পৃথক রূপ যথার্থভাবে কি উপায়ে রক্ষা পেতে পারে তার সম্বন্ধে আমরা যদি একটু নিজের বুদ্ধির দ্বারা স্থির চিত্তে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিচার বিবেচনা

করে দেখি তাহলে সমস্তই পরিষ্কারভাবে উপলব্ধিতে এসে যাবে। এর জন্যে অপরের নির্দ্দেশের উপর মুখ চেয়ে থাকবার আবশ্যক করে না। আমাদের আশ্রমের শিক্ষায় ব্যবস্থায় গুরুদেবের পরামর্শ মত বিচার বিবেচনা করে' যাবতীয় রাগের নিয়ম, বিধি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ যুক্তি দেখিয়ে স্থিরীকৃত করে নিতে হবে।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—এবং তাকে আমরা সর্ব্বভারতীয় পাঠ্যতালিকা রূপে ভারতীয় উচ্চাঙ্গরাগসঙ্গীতের জন্যে প্রতিপন্ন করব। এখন আজকার মত আমরা সকলে বিদায় হই। গুরুদেবের ওখানে যাবার দিন কবে ধার্য্য হবে তা আগে তাঁকে জানিয়ে ঠিক করে নিতে হবে, কি বলেন ?

সঙ্গীতসাধক বলিলেন, —খুব যুক্তিসঙ্গত কথা। আপনারা সমস্ত ঠিক করে আমাকে জানাবেন। ওঁদের চরণ দর্শন করবার জন্যে আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়। কিন্তু এতদিন সঙ্কল্পবদ্ধ থাকার দরুণ সে আকুল আগ্রহকে বহু যত্নে চেপে রেখেছিলেম। আজ গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে, ভগবানের দয়ায় এবং আপনাদের উদার মহত্ত্বের কৃপায় আমার গুরুদেব ও গুরুমায়ের শ্রীচরণ দর্শন করবার সুযোগ হ'ল।

সন্ন্যাসীমহারাজ সাধকজীর স্কন্ধে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে হস্ত রক্ষা করিলেন। জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আমাদের টেনে এনে কেন ঈশ্বরের কাছে অপরাধী কচ্ছেন! আমরা কে? কেবল তাঁর নির্দ্দেশ-পালক মাত্র নই কি? তিনি আমাদের কর্ত্তব্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা প্রভৃতি গুণগুলি মানুষরূপে সৃষ্টি করে' তার মধ্যে দান করেছেন। সে গুলি যদি আমরা যথাযথভাবে সৎব্যবহার না করি তাহলে যে তাঁর কাছে আমরা ভীষণ অপরাধী হব! তিনি কি তাহলে আমাদের আর এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠাবেন? তাছাড়া এ জন্মেই কি আমরা

সত্যকারের শান্তি ও তৃপ্তি পাব ?

এই কথার সমাপ্তির পর সকলে যখন উঠিয়া পড়িলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

সাবিত্রীদেবী সাধকজীকে প্রণাম করিলেন। পরে শক্তিরাণীকে নিবিড় বন্ধনে হস্তের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—তোমার মা, বাবা ও সাধকজীর অনুমতি নিয়ে তোমাকে যদি আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাই তাহলে যাবে ত ?

শক্তিরাণী সবিনয় সম্মতি জানাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আপনাদের আর আমাদের সঙ্গে কষ্ট করে আসতে হবে না।

তারপর সকলে কুটির হইতে ধীরপদ বিক্ষেপে মনে পরম আনন্দ লইয়া চলিলেন।

নদীর এপারে শক্তিরাণী ও সাধকজী দাঁড়াইয়া রহিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল।

সাবিত্রীদেবী দুই চারিপদ অগ্রসর হইতে থাকেন আর শক্তিরাণীর দিকে ফিরিয়া তাকাইতে থাকেন। দৃষ্টি পথের শেষ সময়ে উভয়ে হস্ত উত্তোলন করিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে পচাইচন্দ্র সেইদিন নিজেকে ভীষণ অপমানিত মনে করিয়া সক্রোধে বন্ধুদিগকে লইয়া কোলিয়ারীতে চলিয়া আসিল। এই ঘটনায় সে বন্ধুদের কাছে অত্যন্ত লজ্জিতও হইয়া পড়িল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল ইহার প্রতিশোধ আদরীকে দিতেই হইবে। মাণিক ও তাহার বন্ধু পটলরামও বিশেষ ভাবে অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

দুই একদিন পরে, পটল পচাইকে বলিল,—ভাই তোর আগে থাকতে ভাল করে জান্যে শুন্যে তারপর তোর পিসির কাছে আমাদের লিয়ে যাওয়া কর্ত্তব্য ছিল। যাই হ'ক মাণিকের যা অবস্থা তাতে মনে হচ্চে যেন তোর পিসির মেয়্যাকে দেখে উয়ার ভীষণ মায়া হঁয়ে গেছে এবং সেই থেকে কেমন যেন মনমরা হঁয়ে আছে। সত্যি ভাই অমন চমস্কার দ্যেখতে মেয়্যামানুষ আমি কখনও দেখি নাই। তার সেইদিনকার ত্যেজাল চেয়ারাটা কেবলি মনে পড়ছে। সে সময় যেন তাকে আরো বেশী করে সুন্দর দেখাচ্ছিল। যাই হ'ক এখন মান্‌ক্যার অবস্থা কি হবেক বল্‌ দেখি ?

পচাই বলিল,—কুছ্‌ পরওয়া নাই ; আমি সব ঠিক করে দিবো। যেমন কর্যে হোঁক মাণিককে উয়াকে পাঁইয়েঁ দিবুই। তখন দ্যাখে লিব আদরীর কত তেঁজ থাকে। মেঁয়ামানুষের যে কতটা দ্যেমাক তা আমার জানতে বাকী নাই। মুখিও আমার উপর খুব তেঁজ দেখাঁয়েছিল। এখানে আস্যে যেদিন তাকে দেখ্‌লাই সেদিন হতে তার উপর আমার মন পড়ে থাকত, কিন্তু কি উপাঁয়েঁ তাকে বশে আনব সেই চিন্তা গুলাই কেবল করতে লাগলম। শেষে একদিন তার মায়ের ভীষণ বেমারে কদিন

ধরে খুব সাহার্য্য করতে করতে তখন ওর মনটা আমার উপর কিছু পড়ল। তারপর কর্‌মশ যাত্যে আসতে সে আমার ইস্তিরিই হঁয়ে গেল। এখন তার আমার উপর মায়া ও ভক্তি দ্যেখে কে? লেশার ঘোরে আমি যে তাকে অত গালাগালি করি ও এক এক সময় মারও লাগায়েঁ দেই কিন্তু সে সবই সহ্য করে এবং শান্ত হবার জন্তে আমাকে কত রকম ভাবে ভুলায় ও মিষ্টি কথা বলে। কি বলব ভাই! একদিন ভীষণ লেশার ঘোরে তার বুকে লাথি মার‍্যে তাড়াতেও গেছলাই কিন্তু তখন সে আমার পা দুটা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল,—"তুই আমার যে দিন ধরম্ লিয়েচুস সেই দিন থেকেই তোকে আমি স্বুয়ামী বলে, দেব্‌তা বলে মেনে লিয়েছি। এখন তুই আমার ইহকালের ও পরকালের যা কিছু সব; তোর সেবা, যত্ন, আদর করাই এখন আমার ধর্ম্ম। আমাকে খুন করে ফেল্লেও তোকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাত্যে লারব।" সেদিন তার কথাগুলা শুনে মনটা বড্ড খারাপ হঁয়ে গ্যেছ্‌ল। লেশা ছুটে গেলে পর তার কাছে ক্ষেমা চাঁয়ে সেইদিন থেকে সত্যিকিরার আদর যত্ন করি। বাস্তবিক ভাই এই পাজি জিনিষটা খাল্যে কোনরূপ কাণ্ড জ্ঞিয়ান থাকে নাই; মানুষের লিজের আসল মূর্ত্তি ও মতি গতি সেই সময় যেন ভীষণ ভাবে চাড়া দিয়ে উঠে, কিন্তু ঐ জিনিষটা একবার খাতে ধরলে আর তাকে ছাড়াও খুব শক্ত হঁয়ে পড়ে। দিনের বেলায় মনে হয় দুর্‌কর আর ও পাপ জিনিষটা খাব নাই; কিন্তু সন্ধ্যা হলেই যেন ঐটা চুম্বুক হয়, আর আমরা লুআ হঁয়ে যেয়ে তার টানে মামার দোকানে হড়্‌হড়্ করে ঢুকে যাই। মুখির কথা আর একটা তোদের বলি,—একদিন হঁয়েছে কি, আমি তোদের এখানে আছি সে সময় কয়লা খাদের বড় বাবু লেশা করে মুখির কাছে যায়েঁ খারাপ বিষয়ের কথা বলে। এই না শুনে মুখি বাবুকে অ্যাইসা ঝাটা পিটা করেছিল যে বাবু পড়ে গঁগাতে থাকে। সে সময়

আমি যাঁয়ে পড়ে সেবা শুস্রূষা করে বাবুকে বাড়ীতে পৌছায়েঁ দিয়ে আসি। বাবুরা ভাবন, আমাদের মেঁয়াদের ইজ্জত বলে বুঝি কোন জিনিষ নাই। তাই সকলের উপরই এই রকম অত্যাচার করতে সাহস করেন। আমরা ছোট জাত হই আর যাই হই না কেন ভদ্দ বাবুদের মত ঘরে বৌ থাকতেও পাঁচটা দিকে নজর দেই নাই। যাক্ গা, ভদ্দ বাবুদের বাড়ীর কথা আমাদের ছোট মুখে না বলাই ভাল। এখন শুন, পিসির মেয়্যাঁটাকে ভণ্ড সাধুটার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করা নিজেদের জাতির মেঁয়া বলে বিশেষ কত্তব্য আছে। যেমন করে হোঁক তাকে তার কাছ থেকে সরায়েঁ নিয়ে আসতেই হবেক্ এবং মাণিকের সঙ্গে তার বিয়া দিবুই। আমি মনে মনে উপায় সব ঠাউরে রাখেঁছি। তোদের কোন চিন্তা নাই। আমি তোদের যা যা কত্তে বলব সেইটুকু কঁরে আমাকে সাহার্য্য করিস্ বুঝলি? মাণিক বলিল,—দেখ ভাই! জোর জবরদস্তি করে মেঁয়াছেলে আনা ভাল নয়। আমার মনে হয় জোর করতে গেলে কেবল তার ক্ষতি করাই হবে, আমারও কোন লাভ হবে না। ভাল ভাবে যদি পারিস ত বরং চেষ্টা কর।

পচাই বলিল,—দেখ্ তোর মত এমন মেঁদাকাটা ভিতু মানুষ আর কখন দেখি নাই। তোর তাহলে উয়াকে বিয়া করবার ইচ্ছা নাই বল? মাণিক বলিল,—না না ভাই, যেমন করে হ'ক আমার সঙ্গে বিয়া দিবার চেষ্টা কর। তবে দেখবি ভাই যেন হিতে বিপরীত না হয়। যে কোন উপায়ের জন্যে যেন তার উপর কোনরূপ অত্যাচার না হয়।

আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবেক, এই কথা বলিয়া উপস্থিত পচাই চলিয়া গেল।

মাণিকের দিদিমা ও দাদা মহাশয় সহরের এক ধনী ও শিক্ষিত বংশে চাকর ও চাকরাণীর কাজ করিত। মাণিকের মা সেইখানেই জন্ম গ্রহণ

করিয়াছিল। তাহার পর সে বাল্যকাল হইতে সেই মনিববংশের শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে পাওয়ায় এবং তাহাকে সেই পরিবারের সকলে স্নেহাদর করায় তাহার জীবনের ভাব ধারা অনেকটা সভ্য সমাজের অনুরূপ হইয়াছিল এবং কথাবার্ত্তাও বলিতে শিখিয়াছিল অনেকখানি মার্জ্জিত ভাবে। এইজন্য মাণিকেরও বাল্যকাল হইতে তাহার মাতার মত করিয়া কথা বলা অভ্যাস হইয়াছিল।

মাণিক চন্দ্র এখানকার সংসর্গ দোষে স্বভাবকে বশে রাখিতে পারে নাই সত্য, তত্রাচ তাহার অন্তরের মধ্যে পিতৃ ও মাতৃদত্ত ভাল মন্দ দুইটী স্রোতের ধারা প্রবাহিত থাকার দরুণ ঐ দুইটার গতিবেগ তাহার মনকে দুইদিকেই টানিতে থাকিল। পিতৃধারার স্রোত তাহার মনকে যখন টানিয়া লইয়া যায় তখন সেই স্রোতের বেগ বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারে না, মাতৃধারার পবিত্রতা তাহাকে টানিয়া লইতে আকর্ষণ করে। এই জন্য মন্দ কার্য্য করিয়া ফেলিয়াই তাহার মনে অনুশোচনা আসে এবং সে তখন মনে করে কে যেন তাহাকে অন্তর হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে, কিন্তু মন্দটার প্রভাব হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্য যে বলিষ্ঠ মনের দরকার, তাহা তাহার শিক্ষা ও সৎসঙ্গ না পাওয়ার দরুণই বোধ হয় নাই; কিংবা বোধ হয় মন্দ চরিত্রের শক্তি এত বেশী যে সৎচরিত্রের শক্তিকে মাঝে মাঝে ছাপাইয়া তাহার নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। যাহাই হউক, মাণিক পিতৃপ্রদত্ত স্বভাবের বশে মন্দটাতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে বটে কিন্তু তবুও তাহার পরিণাম চিন্তাতে শঙ্কিত হয় এবং অন্তরে একটা ভয় আসিয়া গিয়া তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। তাই যখন সে সুরাপান করে তখন পান করিবার পূর্ব্বে ঐ জিনিষটার উপর বিশেষ আগ্রহ থাকে না, বন্ধুদের জেদে খায়। তাহার পর নেশার মাত্রা যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার জীবন সত্ত্বায় পিতার নীতি ও চরিত্রভ্রষ্ট

ক্রিয়া গুলির প্রভাব বর্ত্তিয়া তাহাকে পশুত্বে পরিণত করে। আবার পরের দিন নেশার ঘোর কাটিয়া যাইলে পর মাতৃসত্ত্বার রস প্রভাবে মনুষ্যত্বের গুণ প্রকাশ পাইয়া পূর্ব্ব রাত্রের কৃতকর্ম্মের জন্য সমস্ত দিন অনুশোচনায় মন ভরিয়া থাকে। তখন প্রতিজ্ঞা করে আর কোনদিনই এইরূপ কার্য্য করিবে না।

এই রকম ভাবে তাহার জীবনের পথ পিতা-মাতার দেওয়া স্বভাব চরিত্রের ক্রিয়াগুলি লইয়া চলিতে লাগিল। শক্তিরাণীর সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে তাহার তরফ হইতে কোন অন্যায় হইতেছে ইহা তাহার মনে হইল না। সে মনে করিতে লাগিল,—"আমি ত কোনরূপ জোর্ জবর্-দস্তি দ্বারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহি; আমি তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি ও ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, ইহার মধ্যে দোষ কোথায়!" কিন্তু তবুও যেন মাঝে মাঝে কি একটা অজাস্তিকে তাহার মনের মধ্যে বিবেকের চাবুক মারিয়া অন্তরকে অস্থিরভাবে চম্‌কাইয়া দিতে লাগিল। এই সমস্ত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহার বাল্যকালের কথা মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে তাহার মন কি যেন একটা খুঁজিতে চাহিতেছে অথচ খুঁজিয়া পাইতেছে না। সেই খোঁজার বস্তুটার মধ্যে যেন একটা ধর্ম্ম ও সম্পর্ক আছে বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। এই সমস্ত নানান চিন্তাতে সেইদিন তাহার কয়লাখাদের কার্য্যে যাইতে মন হইল না। সমস্ত দিনটা একটা নির্জ্জন গাছতলায় বসিয়া ঐ ভাবেই কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যার পর পচাই ও পটল তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া জোর করিয়া বস্তীর কুটিরে লইয়া গেল এবং সেইরূপ ভাবে তাহাকে আবার তাহাদের সঙ্গে পানাদি কার্য্যে লিপ্ত করিল।

* * * * *

সেই কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণববাবাজী নিজে ও তাঁহার শিষ্যেরা কয়েকদিন ধরিয়া নানান স্থানে বহুভাবে অনুসন্ধান করিয়াও লক্ষ্মীর স্বামীর কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। এই জন্য লক্ষ্মীর মন খুবই উতলা হইতে লাগিল এবং সে যে কি করিবে তাহারও কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না। পল্লীতে থাকিয়া ইহা যতটা সহজ ও নিজেকে সাহসিনী মনে করিয়াছিল এখন সংসারের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে নামিয়া তাহার সেই ধারণায় ভীতি উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। সহরের আবহাওয়া দেখিয়া তাহার আর এককভাবে কিছু করা সাহসে কুলাইতেছে না। মনের সমস্ত চিন্তাকে বিচার বিবেচনার মধ্যে আনিয়া এখন সে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া মিলন আকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁহার চরণে নিবেদন ও তাঁহাকে ডাকাই সত্য বলিয়া মনকে দৃঢ় করিতে মনস্থ করিয়াছে। লক্ষ্মীদেবী সেই দিন হইতেই এই সিদ্ধান্তকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়া ভগবানের পূজাদি, তাঁহার ধ্যান এবং কীর্ত্তন গানের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করিয়া রাখিল।

বৈষ্ণববাবাজী তাহার এইরূপ মনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে মনে খুবই প্রশংসা করিলেন এবং ক্রমশঃ তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, নৌকাবিলাস পর্য্যন্ত পালা কীর্ত্তন শিখাইলেন। এখন তাহাকে কুঞ্জলীলা ও মান, এই দুইটি লীলাকীর্ত্তন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লক্ষ্মীর একান্ত বাসনানুযায়ী বৈষ্ণববাবাজী একদিন তাহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। কীর্ত্তনের প্রভাবে লক্ষ্মীর মন ক্রমশঃই যেন কৃষ্ণময় হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বামীর জন্য জগৎস্বামীর উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া এবং তাঁহার মধ্য দিয়া সেই প্রেমভাবে বিভোর হইতে লাগিল। বৈষ্ণববাবাজীর প্রতিষ্ঠিত ৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির প্রাত্যহিক পূজা করিয়া লক্ষ্মী যখন সকাল সন্ধ্যায় কীর্ত্তন গান করে তখন বৈষ্ণববাবাজী খোল ও তাঁহার স্ত্রী মন্দিরা বাজাইয়া প্রেমানন্দে মাতিয়া

থাকেন। এই রকমভাবে লক্ষ্মীর জীবনের স্রোতধারা নূতন ভাবে প্রবাহিত হওয়ায় তাহার কামনার তরী কৃষ্ণরূপ সাগরের দিকেই ধাবিত হইতে লাগিল।

* * * * *

এদিকে সেই থেকে মাণিকের মন নানান ভাবে চিন্তার মধ্যে কাটিতে লাগিল। এই দুই তিনদিন ধরিয়া তাহার পক্ষে কাহারও সঙ্গ এমনকি পটলের সঙ্গে বসবাসও অসহ্য মনে হইতে লাগিল। এখন সে একস্থানে বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবিতে থাকে তাহার মায়ের কথা এবং মায়ের অসুখের এবং মৃত্যুর কথা। তৎসঙ্গে মায়ের মৃত্যুর দিনে শ্মশানে মায়ের সখির কথা এবং তাহাকে তাহাদের নিকট থাকিবার অনুরোধের কথাও মনে পড়িতে লাগিল। আর মনে পড়িতে লাগিল সেই দিনের একটি সুন্দর বালিকার কথাও। মাণিক যখন মায়ের মুখাগ্নি করিতেছিল তখন সেই বালিকাটি তাহার সুন্দর মুখখানি লইয়া অশ্রুযুক্ত ঢল ঢল চোখে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। সেই চোখ দুইটি ও কচি মুখখানি এখন সর্ব্বক্ষণ তাহার মনের সামনে ভাসিতে লাগিল। সে ভাবিতে থাকে, এখন সেই মেয়েটি কত বড় হইয়াছে এবং বিবাহ হইয়াছে কি না কে জানে। বিবাহের কথা মনে হইতেই তাহার অন্তরে যেনকি একটা দারুণ বেদনা উপস্থিত হইয়া গেল। তাহার বিষয়ের নানা কথা মনে আসিতে আসিতে চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার সেই বালিকাটিকে যেন কত আপনার বলিয়া মনে হইয়া পচাইএর পিশ্ তোত-ভগিনীর চিন্তা যেন কোথায় সরিয়া গেল। কেন যে তাহার এমন অবস্থা

হইল তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সর্ব্বদা যেন অন্তরে কি একটা শিহরণ আসিয়া তাহাকে ভীষণ অস্থির ও বিচলিত করিয়া দিতে লাগিল। পিতারও কোন সংবাদ সে জানে না। এতদিন পরে তাহার জন্যও মন কেমন করিতে লাগিল এবং তাহাকে দেখিবার জন্য প্রবল আগ্রহ আসিয়া গেল। জ্ঞানবুদ্ধিহীন এই নিরক্ষর মানুষটির অন্তরে হঠাৎ যেন কত কি বিবেচনা ও কর্ত্তব্যের কথা আসিয়া উদয় হইল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; একদিন পটল প্রভৃতি কাহাকেও না জানাইয়া দেশের দিকে রওনা হইয়া গেল এবং সেইদিন হইতে মাণিকের জীবনের মোড় ঘুরিয়া গেল। মাণিকের মনের মধ্যে যে সমস্ত কালিমা ছিল তাহা এতদিনে মায়ের পবিত্র প্রভাবশক্তির স্নিগ্ধ ধারায় ধুইয়া মুছিয়া গেল—এবং সেই ধারায় স্নাত হইয়া মাণিক আজ নবজীবন লাভ করিল। সাধ্বী মায়ের জয় আজ পুত্রের মধ্য দিয়া ঘোষিত হইল।

মাণিক দেশে আসিবামাত্র তাহাকে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গ্রামে আসিয়াই শুনিল, যে ঘরে তাহার মা মারা গিয়াছিল সেই ঘরে তাহার পিতা দুই তিনদিন পড়িয়া থাকিয়া অশেষ যন্ত্রনা পাইয়া ও তাহার মায়ের জন্য সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পুনঃপুনঃ তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া আজ কয়েকদিন হইল মারা গিয়াছে। মাণিক সেই ভগ্ন কুটিরে যাইয়া পিতার এবম্বিধ মৃত্যুর জন্য ভগবানের কাছে তাহার আত্মার শান্তি কামনা জানাইল এবং পিতামাতার জন্য বেদনায় অবিরাম ধারায় তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল। সে আর এই স্থানে স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার মায়ের সেই সখিদের সংবাদ জানিবার জন্য সেখানে তাহার মনকে দ্রুত টানিয়া লইয়া গেল।

দয়ালদাস দূর হইতে দেখিতে পাইয়া মাণিককে চিনিয়া ফেলিল, এবং ছুটিয়া গিয়া পরম স্নেহভরে কোলের কাছে জড়াইয়া বলিল,—কে

রে, মাণিক? ভাই মাণিক ধন্ কখন তোরা এলি? আমার লক্ষ্মী-দিদিকে কেন দেখছি না? সে কি তোদের গ্রামে আছে? তাহলে চল্ ভাই তাকে আগে দেখে আসি। সে চলে যাবার দিন থেকে আমার যেন সব শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, দোকানে খাতালেখার কাজে আর যেতে পারি না। এখন কেমন যেন বুড়ো হয়ে গেছি, কোন কাজেই আর উৎসাহ পাই না। লক্ষ্মী চলে যাওয়াতে আমাদের পাড়াটাও যেন একেবারেই লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে গেছে। তার যে কি একটা পবিত্র শক্তি ছিল সকলকে আনন্দে রাখবার, তা তোকে আর কি বলে জানাব! বল্ ভাই সে কেমন আছে এবং এখন আরো কত বড় হয়েছে?

মাণিক ত দয়ালদাসের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক ও আশ্চর্য্য হইয়া হা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দয়ালদাস ভীষণ ভয় পাইয়া আকুলভাবে বলিল,—কথা কচ্ছিস না কেন ভাই, কি হয়েছে সত্যি করে বল? আমার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে।

মাণিক একে একে তাহার সমস্ত পরিচয় দিয়া বলিল,—আপনি লক্ষ্মীর কথা কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, দয়া করে সমস্ত খুলে আমাকে বলুন। আপনার কথা শুনে আমারও ভিতরটা কি রকম যেন কচ্ছে।

দয়ালদাস আশায় নিরাশ হইয়া অত্যন্ত বেদনাহত চিত্তে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ মাণিকের সঙ্গে লক্ষ্মীর ধর্ম্মবিবাহের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীর পিতামাতার মৃত্যু এবং তাহার দেশ ত্যাগ ও সে যে চিঠিটা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তাহা আনিয়া পড়িয়া শুনাইয়া সমস্ত কথা বলিল। পরে বলিল,—বড়ই ভাবিয়ে দিলি ভাই! তোকে দেখে মনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল যে, ভগবান বুঝি এতদিনে ভাবনার অবসান করলেন। তাইত বলি! আমারই যে বুদ্ধির ভুল হয়ে

গেছে, দিদি এলে আগে আমাদের কাছে না এসে কি থাকতে পারত? ভগবান! তুমি আমার লক্ষ্মী দিদিকে সর্ব্বদা রক্ষা কোরো; আমার আর কোন কামনা নাই। এই বলিয়া দয়ালদাস সজলনয়নে ভগবানের উদ্দেশে করযোড়ে প্রণাম জানাইল।

মাণিক সমস্ত শুনিয়া ভয়াকুল চিত্তে দয়ালদাসকে বলিল,—তাই আমাকে কিছুদিন হতে কিসের আকর্ষণে যেন সর্ব্বদা ভীষণভাবে টান্‌ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এখন বুঝছি, যে টানে ভগবান পর্য্যন্ত টলে যান, সেই টানে মানুষ কি স্থির থাকতে পারে, সে যতই অধম হোক না কেন। আমি চললাম তার খোঁজে, যদি শীগ্‌গীর্ মধ্যে ভগবানের কৃপায় তার দেখা পাই তাহলে সর্ব্বাগ্রে দাদু তোমার কাছে নিয়ে আসব; আর তা না হলে যে পর্য্যন্ত না তার দেখা পাব সে পর্য্যন্ত তার ভালবাসা ধ্যান করে সারা দেশ খুঁজে বেড়াব।

এই বলিয়া দয়ালদাসকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

দয়ালদাস তাহাকে "ফিরে আয় রে ভাই, ফিরে আয় দাদু, কিছু খেয়ে যা" বার বার এই কথা বলিয়া কতকদূর পর্য্যন্ত দৌড়াইয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না। মাণিক যেন ঝড়ের মত গতিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * * *

পচাইচন্দ্র সন্ধ্যায় পটলের কাছে আসিয়া শুনিল যে, মাণিক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার জিনিষপত্র সমস্তই রাখিয়া গিয়াছে। ওধারের

একটা বুড়িকে বলিয়া গিয়াছে, সে এখন শীগ্ গীর্ আসিবে না।

মাণিকের চলিয়া যাওয়াতে পটল কেমন যেন মুস্ড়িয়া গিয়াছে। সেইই মাণিককে এখানে লইয়া আসিয়াছিল এবং সেই অবধি দুইজনে সর্ব্বদা একসঙ্গেই ছিল। আজ তাহার যেন সব ফাঁকা ফাঁকা মনে হইতে লাগিল। পটল পচাইকে মাণিকের চলিয়া যাওয়ার কথা বলিয়া বড়ই দুঃখ করিতে লাগিল।

পচাই বলিল,—আমার বরাবরই মাণিকটার উপর খুব ভ'রসা ছিল্য নাই। উয়ার মতন অমন মুখচরা ও দুর্ব্বল মনের লোক আমি একটাও আর দেখি নাই। যাই হঁ'ক, উয়ার জন্যে আর খামকা ভাব্যে কি করবি বল্, আজ বরং একটু সকাল সকাল আরম্ভ করা যাক্; কারণ তোর মনটা খারাপ আছে কি না। এই বলিয়া পচাইচন্দ্র ঢালিয়া বেশ একপাত্র পটলের হাতে দিয়া বলিল,—সবটুকু চোখ বুঁজে খাঁয়ে লে, দেখবি সব দুখ্যু কত শীগ্ গীর্ চলে গেছে।

মিনিট দুই একের মধ্যেই উভয়ের মনের মধ্যে রং ধরিতে আরম্ভ হইল। এই রং প্রথমতঃ গোলাপী হইয়া তাহার পর আল্কাত্রায় পরিণত হয়।

পচাই বলিল,—দ্যাখ্ পট্লা? মান্ক্যা যখন ভাগ্ল্য তখন তোর সংঘেই আদরীর মিলন ঘটায়েঁ দেই, কি বল?

পটল প্রথমটা এই কথা শুনিয়া খুব উৎফুল্ল হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার সে ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। নিজের চেহারার জন্য মনস্তাপ করিয়া বলিল,—মাণিকের অমন সুন্দর চেয়ারা দেখে তাকেই যখন সে আমল দিলেক নাই তখন আমার এই কুচ্ছিৎ গড়নের চেয়ারাটা তার কি মনে ধরবেঁক? তোর নেশার ঘোরে মাথা খারাপ হঁইছে তাই ও কথা বোল্চুস্।

পচাই আর একপাত্র নিজে টানিয়া এবং পটলকে একপাত্র দিয়া বলিল,—রেখে দে তোর পছন্দ টছন্দর কথা, মেয়াঁ মানুষদের পুরুষের জন্যে আবার পছন্দর কি কথাঁ আছে? পছন্দ যা কিছু সেত আমাদের জন্যে। আমাদের জন্যেই বা কেন বলি; আমাদের জাতের পুরুষদের মেঁয়া মানুষ নিয়ে অত সব পছন্দর গাজন পব্ব নাই, ওটা ভদ্দর সমাজেই আছন।

সত্যি কথা বলতে কি ভাই এরা বিয়ার সম্বন্দর ব্যাপারে ভদ্রঘরের মেঁয়াগুলার ইজ্জতকে যেমনভাবে ছোট করে' দেখেঁ তেমন আমাদের জাত্যের মধ্যে নাই। ইয়াদের বিয়ার কন্যাগুলা যেন মনহারী দকানের খেল্না, যারা যখন দরকার মনে করে তারা তখন লেড়ে চেড়ে দিনকতক মেঁয়াদের ঘরের লোকগুলাকে হায়রাণ করে চলে যায়। অবিশ্যি এর যে খানিকটা কারণ না আছে তা লয়। ভদ্দর সমাজের মেঁয়াদের চেয়ারা দিন্ দিন্ এমন হঁয়ে পড়্ছে যে, তাদের বৌ করে আন্তে আমার মনে হয় তারা ডর পাঁয়। স্বাস্ত, চেয়ারা, পরিপাটি গড়ন, এসব হাজার করা একটার মধ্যেও দেখতে পাবার জো নাই। কন্যা দেখাবার সময় হেজ্লীন, পাউডার, লাল রং তার মুখে লেপে দিয়ে এবং ভাল জামা কাপড় পরায়েঁ ভিতরের দুব্বলকে ও অগড়ন চেয়ারাকে ঢাক্যে দেয়। ইয়াদের এমন বিদ্কুট্যা চেয়ারা দিন দিন কেন হচ্ছে জানুষ, সকাল থেকে সন্ধ্যা তক্ কাঠের উপর বসেঁ্য বসেঁ্য পড়াশুনা করে' এবং সৌখীন খাঁয়ে খাঁয়ে এই রকম হচ্ছে। সহরের ইস্কুল কলেজের ছুটির সময় আমি হাট বাজার করতে যায়েঁ দ্যেখেঁছি, ছোট ছোট মেঁয়াদের পয্যন্ত চোখে চশ্মা। ইয়াঁদের চেয়ারা দেখে মনে হয় আমাদের জাতের একটা মেঁয়ার ক্ষেমতার সংঘে তাদের দশটাতেও লারবেক। আমাদের জাতের মেঁয়াদের কেমন সুন্দর গড়ন্ গাঠন্

বল দেখি, যেন লোহা, তামা ও পিতলে ঢালাই করা। তবুও কত কষ্টের মধ্যে থাকে। না খাটলে খুটলে কখনও শরীর স্বাস্থ কি ভাল থাকে? দেখুস্ নাই, সহরের মধ্যে যে অতগুলা করে' চশ্মার, দাঁত—বাঁধানর ও ডাক্তারদের দকান আছে, সেগুলা চল্‌ছে কাদের লেগে? কেবল ভদ্দ সমাজের লোকদের জন্যে নয় কি? আমাদের জাতের কথা ছাড়েই দে, গেরামের লোকদেরও এখনও ঐ সকলের দরকার হয় নাই। বুড়াকাল তক্ তাদের চশ্মা লিতে বা দাঁত বাঁধাতে হয় নাই। তা হলেই বুঝ্ সহরের ভদ্র মানুষদের শরীরের অবস্তা দিন্ দিন্ কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি আগে কয়েক বছর ধরে সহরের এক বাবুদের বাড়ীতে চাকরের কাজ করেছিলাই। তাই আমি এ সমস্ত দেখেছি ও শুনেছি। সেখানে দিদিমণিদের কাছে খানিকটা লেখাপড়াও শিখে ছিলাই। এদের জাতের বিয়ার ব্যাপারে আর একটা মজার কাণ্ড শুন্,—ছেল্যার বিয়া দিবার যখন দরকার মনে করে তখন তারা মেঁয়ার চেয়ারা খুঁজতে থাকে পরীর মত, তাদের বাড়ীর মেঁয়াদের কাল কুচ্ছিত চেয়ারার কথা বিবেচনায় তখন আসেক নাই। তারা মনে করে, বৌটি হবেক চমস্কার দেখ্‌তে, রংটি হবেক সাদা ধপ্‌ধপ্যা, সুপারি গাছের মত লম্বা হবেক কারণ আজকাল বেঁঠ্যা চেয়ারা চলেক নাই। তারপর সেই মেঁয়াটি জানবে গান, বাজনা, লাচ, লেখাপড়া, সেঁলাই, সংসারের সব কাজ। তারপর আসল্ হচ্ছেন টাকা ও গয়না। আগের গুলা বাড়্‌তির্ দফা অর্থাৎ ফাউ। বৌটি রূপ লিয়েঁ আসবেক, অতসব গুণ লিয়েঁ আসবেক এবং তার সঙ্গে মা বাপকে সব্বশান্ত করে টাকা গয়না লিয়েঁ আসবেক। তারপর যদি আগের জন্মে মহা তপুস্যা করা থাকে তবে শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্য সকল শ্বশুরবাড়ীর লোকগুলার কাছে একটু আদর যত্ন পাবেক। বিয়ার পূব্বে এত সব জিনিষযে শিখে, তার সবই পেরায় শ্বশুরবাড়ীতে

আস্যে গঙ্গাপাণ্ডি হয়েঁ যায়। তবুও বিয়াঁর জন্যে ঐ গুলা শিখতেঁই হবেক। তারপর, তার উপর কিরূপ বিবেচনার পালা সুরু হবেক জানিস ভাই! বিয়ার আগে পয্যন্ত সে যেমন ভাবে মা বাপের কাছে বেটা ছেলাদের মতন সমান নজরে আদর যত্নে ছিল, তার সেই সব অধিকার আর কিছুই থাকবেক নাই, বৌ হলেই তাকে মস্ত বড় বয়েসের মানুষ হতে হবেক। আরো অনেক কথা আছে, আজ আমি লেশার ঘোরে সব গুঁছায়ে বলতে লাচ্ছি, আর একদিন বলব। ভদ্দদের এ রকম সমাজ ও বিচার কেন বল দেখি?

পটল বলিল,—কি জানি ভাই, উসব বড় বড় মানুষদের কথা তারাই জানন্। আমাদের আদার ব্যাপারী হঁয়ে জাহাজের খবর লিবার দরকার লাই। লে এখন রাত হয়ে গেল বাড়ী যা। আর যে কথাটা বল্‌ছিলি, সেটার কোন ববস্তার কথা না বলে বকর্ বকর্ করে লেশাখোরের মত বড়লোকদের কথা লিয়ে সময় লষ্ট করে দিলি।

পচাই বলিল,—রাত তার কুথাই হ'ল? এই ত সবে এখন একটাও বাজন নাই। ইয়ার পর কতগুলা বাজবেক তবে ত রাত হবেক।

পটল বলিল,—ঐই মরেচে, ইয়ারপর তোকে সত্যি সত্যি লেশায় খায়েঁছে, এতক্ষণ তুই খাঁচ্ছিলি।

পচাই বলিল,—কি বল্লি আমার লেশায় খায়েঁছে! এই দ্যেখ্ আমি টন্-টনে ঠিক আছি। আদরীকে ঐ সাধু বেটাটার কাছ থেকে উদ্ধার কত্তেই হবেক; তার জন্যে আমি সব ঠিক করে রাখেঁছি, তুই কেবল আমাকে একটু সাহার্য্য করবি, ব্যাস তাহলেই কাম্‌ফতে। তোর লিজের চেহারার জন্যে চিন্তা করুস না পটল; একবার দুহাতে একহাত হঁয়ে গেঁলেই দেখবি তখন তুই পতি-দ্যেব্‌তা। আমি একজন ভদ্দলোকের বিয়াতে যায়েঁ দ্যেখেছিলাম, বৌটি বেশ দ্যেখতে ও টুক্‌টুক্যা

লাল, আর বটি যেন মাড়োয়ারীদের তেল কলের মাল বওয়া মোষটির মত হয়া, কালো কুচকুচ্যা ও মোটা। কন্যা যদি তার কাঁধ্যে চাপে ত মনে হবেক যেন একটি লাল টিয়াঁপাখী চাপ্যে আছে। বটির গুণের মধ্যে কি-না তিনি লেখাপড়ায় কটা পাঁস করে কেরাণীগিরির চাঁকরী করন। যাক্ গে, তোর কোন চিন্তা নাই; এখন তুই কিছু খাঁয়্যে দাঁয়্যে নাকে সরষার ত্যেল দিয়ে ঘুমা, আমি আবার কাল আসছিত, তখন সব ঠিক করা যাবেক।

এই বলিয়া পচাই টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। পটল চন্দ্র শক্তিরাণীকে পাইবার আশায় সেই চিন্তাতে সমস্ত রাত্রি কাটাইল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতসাধকের গুরুদেব তাঁহাদের গলির মধ্যে কিছুক্ষণ একটি লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া বাড়ীতে আসিলে পর তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁ গো, তুমি কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কচ্ছিলে?

গুরুদেব বলিলেন,—যাদব মুখুয্যে দেশ থেকে এসেছে, তাই তার কাছে দেশের সংবাদ জানছিলেম। নানা কথার মাঝে সিধুর পুত্রবধুটির খুব প্রশংসা করে বলল যে, "বৌটি লেখাপড়া তেমন জানে না বটে কিন্তু বড় বুদ্ধিমতী এবং এমন কর্ত্তব্য ও সেবাপরায়ণা নারী এখন খুব কম

দেখা যায়। সিধু আজ প্রায় দু বছর ধরে পক্ষাঘাত ব্যাধিতে প'ড়েছিল। তার একমাত্র ছেলেটির গত বছর বিয়ে হয়েছে। সেই নববধূটি প্রথম শ্বশুর ঘর করতে আসার দিন কয়েক পরেই সিধু পেটের পীড়া ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। সিধুর সাংসারিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ছেলেটা বাইরে গিয়ে কিছু কিছু কাজ কর্ম্ম করে' যৎসামান্য উপার্জ্জন করে মাত্র। যাদব বলছিল,—মাত্র পনর ষোল বছরের ওই সুন্দরী বৌটি শ্বশুরবাড়ী আসার দিন থেকে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম, রান্না বান্না থেকে সকলের সেবাযত্ন ইত্যাদি সমস্তই করে আসছে। কোন কিছু করবার জন্যে কাউকে বলে দিতে হয় না। বাপের বাড়ী হতে সমস্ত করণীয় শিক্ষাই পেয়ে এসেছে। বৌটা শ্বশুরের কি সেবাই না করেছিল। সিধু মারা যাবার আগে কয়দিন হতে ময়লা ইত্যাদি বহুবার অম্লান বদনে ও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে পরিষ্কার করেছে। ওই অবস্থার মাঝখানে বৌটির বাবা একদিন এসেছিলেন। তাঁর মেয়েটি এই প্রথম এসে অনেক দিন আছে বলে মেয়ের মনস্তুষ্টির জন্য তাকে দু একদিনের মত নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন; বৌটি তা শুনে তার বাবাকে বলেছিল, —"শ্বশুর মহাশয়ের বর্ত্তমান এই অবস্থার ভাবটা কেটে না গেলে আমার একদণ্ড কোথাও যাওয়া চলবেনা বাবা"। মেয়ের এই কথা শুনে পিতা খুব খুসী হয়ে চলে যান।

গুরুদেবপত্নী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,—বৌটি খুব ভাল বংশের ও আদর্শবতী মেয়ে বলতে হবে।

গুরুদেব বলিলেন,—সত্যই তাই; আজকাল এরূপ কর্ত্তব্য পরায়ণা মেয়ে খুব বিরল হয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ সহরে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের বেশীর ভাগ মেয়েদের আজকাল যে রকম রীতিনীতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে করে এখন আর তাদের কাছে এরূপ আদর্শ ও নীতি

গ্রহণযোগ্য হবে বলে আশা করা যাচ্ছে না। দেখে শুনে আমার মনে হয় এ রকম সেবা, পরিচর্য্যা করাকে তারা আদর্শের চক্ষে দেখতে নারাজ হয়ে বরং নাকসিঁটকে বলবে অমন রাঁধুনী ও ঝিগিরি এবং নরক ঘাঁটার কাজ করে আমাদের আদর্শ নারী হয়ে দরকার নেই। আমরা কি মেথর যে ময়লা নিকোব! এরূপ ধরণের মনোভাবের কথা আমি অনেকের মুখে শুনেওছি।

গুরুপত্নী বলিলেন,—দেখ! তুমি বহু জায়গায় যাও, কাজেই বর্ত্তমানের আবহাওয়া বিশেষ রূপেই জান; এবং তোমার এ ধারণা অভিজ্ঞতা প্রসূত হয়েছে দেখে আশঙ্কাযুক্তা হয়ে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যাদের কাছে তুমি এরূপ মতিগতির পরিচয় পেয়েছ, তারা বোধ হয় ভারতীয় নারীদের ভাব, ধারা, কর্ত্তব্য প্রভৃতির কথা ভুলে গেছে কিংবা তাদের সে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হয়নি। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে দেশের শুধু মৃত্তিকাতে কেন, মনে হয় জল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সকলেরই মধ্যে আছে আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য প্রভৃতি সমষ্টিগত শক্তি প্রদানের উৎস এবং সেই সকল শক্তি স্বভাবগত বা প্রকৃতিদত্ত হয়ে মানুষকে আবহমানকাল থেকেই গঠিত করে আসছে। সুতরাং সেই ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে' এখন এসব বোধশক্তিকে হারিয়ে আমরা যদি ঐরূপ কথা বলতে শিখি তাহলে আমাদের ঘোর দুর্দ্দিন এসেছে বলতে হবে। ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে নারী চরিত্রের আদর্শ যেরূপ ভাবে অঙ্কিত হয়ে এসেছে তাকে যদি আমরা মান্য করে না চলি তাহলে আমাদের আর কি রইল!

গুরুদেব মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন,—যাঁরা লেখাপড়া শিখে উচ্চ শিক্ষিতা হ'ন তাঁরা যদি ঐ সকল কষ্টকর বস্তুগুলোকে ত্যাগ করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এতাবধি বঞ্চিত ব্যক্তিগত মর্য্যাদা,

স্বাধীনতা, সুখ, আরাম, বিলাস প্রভৃতিকে আয়ত্তে আনতে চান—তাহ'লে তাঁরা সেইগুলো এখন পেলে বা নিলে অন্যায়ই বা কি করে বলব ?

গুরুপত্নী বলিলেন,—তুমি আগে এই মাত্র দুঃখ করে এক রকম ভাবে কথা বল্‌লে আবার এখন অন্য রকম ভাবে যে কথা বলছ ? আর কেনই বা তবে শেষের কথাগুলো শুনিয়ে আমার মনে দুঃখ দিলে ?

গুরুদেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—না-না তোমাকে আমি কোনরূপ দুঃখ দেবার জন্যে একথা বলিনি। মাঝে মাঝে তোমাদের সম্বন্ধে ঐ দুটো চিন্তা আমার মনে উদয় হয় বলেই আজ তোমার কাছে তার সদুত্তর পাব সেই আশা করেই বললেম। গুরুদেব তাঁহার পত্নীর পৃষ্ঠে আদরভরে হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনশ্চ বলিলেন,—দেখ! এক এক সময় মনে হয়, তুমি না হয় স্বইচ্ছায় উচ্চবংশের ও উচ্চ শিক্ষিতা নারী হয়েও দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগকে বরণ করে নিয়ে এবং ওতেই হয়ত সত্যিকারের তৃপ্তি আছে মনে করে বিবাহ করেছিলে এবং সেই অবধি পরম নিষ্ঠার সহিত সেই আদর্শই গ্রহণ করে আছ এবং থাকবেও চিরকাল; কিন্তু যে সকল উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তা নারী ও জিনিষটাকে তাঁদের মনোমত যুক্তি ও বিচার দেখিয়ে নিতে ইচ্ছুক নন তার জন্যে তাঁদের আমরাই বা কোন্ ন্যায়সঙ্গত যুক্তি দেখিয়ে দোষী করতে যাব বল ?

গুরুপত্নী বলিলেন,—আজ তোমার এসকল কথাগুলোর বিষয়বস্তু ভীষণ ঘোরাল। আমি আমার ক্ষুদ্র বিচার বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি তাতে করে তোমার ঐ সকল কথার প্রত্যেকটির উত্তর সংক্ষেপে চেষ্টা করে দেখি দিতে পারি কিনা এবং তা তোমার মনঃপূত হয় কিনা।

এই বলিয়া গুরুপত্নী বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—দেখ! তুমি প্রথমে ময়লা পরিষ্কারের বিষয় নিয়ে যে কথা বললে, তার উত্তরে আমি এই কথাই বলতে চাই যে, যদি ঐ বৌটি ঐরূপভাবে সেবা, যত্ন প্রভৃতি

কর্ত্তব্য পালন না করে' নিজের আরামে থাকত, তাহলে সকল স্তরের সকল মানুষের কাছেই সে নিন্দনীয়া হত না কি? আজকাল এর অভাব ঘটেছে বলেই ত এই রকম দৃষ্টান্তে লোকের মন সেই সেবা-পরায়ণার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পড়ে। তাহলে এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে ও হয়ে আসছে যে, কর্ত্তব্য পালনের মত মানুষের কাছে আর বড় কিছু নেই। ময়লা কেবল মেথরেই নিকোবে, এরূপ কথা আমরা কি করে ভাবতে পারি। নিজেদের বড় ভেবে আর এক জাতিকে অত্যন্ত ছোট ভাবার মধ্যে যে কত দৈন্য ও অকরুণ মনোভাব প্রকাশ পায় তা কি বলবার আবশ্যক করে? যারা ময়লা পরিষ্কারের কাজ করে আসছে, একসময় আমাদেরই কোন উচ্চ সমাজ নিজেদের স্বার্থের জন্যে নিশ্চয়ই তাদের কোন পূর্ব্বতন বংশধরদের উপর জুলুম করে' অন্যায় অবিচারের দ্বারা ঐ কাজ করিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল এবং সেই থেকেই মনে হয় ঐ রকম একটা জাতের সৃষ্টি হয়ে গেছে। যাই হ'ক আমরা যদি নিজেদের যথার্থ সভ্য ও মনুষ্যত্বের অধিকারী বলে মনে করি তাহলে ঐরূপ কার্য্য করিয়ে একটা জাতির উপর ঘৃণাভাব পোষণ করা ও খারাপ ব্যবহার করে আসা আমাদের পক্ষে ঘোরতর অন্যায় এবং মানুষকে ও রকম কাজ করিয়ে নিয়ে চিরকাল ঘৃণ্যজাতে পরিণত করে রাখা মনুষ্যত্বের ঘোর বিরোধী বলে মনে করি। তারপর আর একটা কথা,—তারা যদি বংশধারায় এবং সেই জাত থেকে আর উদ্ধার পাবার কোন উপায় নেই ভেবে ঐ কাজ পরের জন্যে করে আসতে পারে তাহলে আমরা নিজেদের গুরুজন, আত্মীয় ও স্নেহাস্পদদের প্রয়োজনে ময়লা পরিষ্কার ও সেবাচর্য্যা করাকে যথার্থ কর্ত্তব্যের ও সত্যকারের ধর্ম্মের এবং মনুষ্যত্বের প্রকাশ আছে বলে কেন মনে করব না? এ সম্বন্ধে আর একটা আমার মন্তব্যে জানাচ্ছি,—নারীর কাছে পতির মত শ্রেষ্ঠ ও কাম্য ধন আর

কিছু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা নারীর পতি ঈশ্বরের চেয়েও বড়। নারী সকলকে সব কিছু দিতে পারে না, এমনি কি ঈশ্বরকেও না, কিন্তু পতিকে অদেয় তার কিছু থাকে না। দেহ, মন, প্রাণ সব কিছুই বিবাহের দিন থেকে উৎসর্গ করে দেয়। যিনি নারীর নারীত্ব, মাতৃত্ব এবং সব কিছু অনুভূতিই দান করেন, সেই স্বামীকে কি আমরা নিজের স্বার্থ চিন্তায় ও ভোগ, সুখ, আরাম প্রভৃতি এ সব তুচ্ছ জিনিষ-গুলো নিয়ে বিচার করব? স্বামীকে অবলম্বন করেই আমাদের অন্যান্যের প্রতি সেবা, যত্ন করবার প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তব্য প্রাপ্তি হয়। যখন শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা যত্ন করবার সৌভাগ্য হয় তখন মনের মধ্যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে যে, আমার যিনি ইষ্টদেবতা, যিনি প্রাণ মন, দেহ, সুখ সর্ব্বস্ব, সেই স্বামীকে এঁরা জন্ম দিয়ে মানুষ করে' আমার জন্ম জন্মান্তরের কামনার বস্তুকে দান করেছেন। কাজেই আমি কখন স্বপ্নেও ভাবতে পারি না যে, তাঁদের প্রতি সেবা যত্ন ও কর্ত্তব্য পালনে শৈথিল্য কি করে আসতে পারে। এই রকম ভাবে তাঁর ভাই ভগিনী-গুলিকেও মনে হয় আমার স্বামীর এঁরা এক বৃন্তের ফুল। শুধু কি এই পর্য্যন্তই, তা নয়,—স্বামীর সমস্ত প্রিয়জনের প্রতি আসে একটা মায়া, মমতা, স্নেহ ও কর্ত্তব্যের প্রেরণা। সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে আমাদের বিচরণ করতে ভগবান পাঠিয়েছেন স্বামীরূপ খুঁটিকে অবলম্বন করে তাঁর দেহে বাঁধা থেকে সব কিছু করে যাবার জন্যে। নচেৎ আমি মনে করি আমাদের জন্মের মধ্যে যথার্থ মাহাত্ম্য কিছু থাকে না। একক জীবন যাপন কোন প্রাণীর মধ্যেও নেই। তা হলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, তা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। পুরুষ ও প্রকৃতি কেহই কোন সময় ভিন্ন ভাবে থাকতে পারে না, এই হ'ল সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। সাংসারিক জীবনে প্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করে' গেলে কোন মানুষেরই প্রকৃত সুখ ও কল্যাণ হয় না।

গুরুদেব বলিলেন,—অনেকের মুখে শুনি, তাঁরা বলেন স্বামীর ঘর করতে গিয়ে কি তাদের খেয়াল মেটানর সামগ্রী হয়ে অশেষ দুঃখ, কষ্ট ও নানাবিধ অশান্তিকে জেনে শুনে বরণ করে নিয়ে দুর্গতিকে টেনে আনব ?

গুরুপত্নী বলিলেন,—আমি আগেই এসব প্রশ্নের উত্তরে এক রকম প্রায় সব কথাই বলে গেছি, তত্রাচ আমি তোমার এরূপ বাক্যের উত্তরে জানাচ্ছি যে, যাঁদের এরূপ বিচার বুদ্ধি এসেছে তাঁদের বিয়ে না করাই ভাল।

গুরুদেব বলিলেন,—আজকাল এক শ্রেণীর পুরুষেরা সংসার চালাবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন ও ভালভাবে রোজগার করেও বিবাহ করতে চান না। এর জন্যে তাঁদের অভিভাবক, গুরুজন, ও বন্ধুবান্ধব সবাই অনুরোধ করে করে হার মেনে যান। এর কারণে মনে হয়, তাঁরা বড় পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে থেকে থেকে তারপর পাঁচটা নিয়ে কপ্পাট ভোগ করতে হবে এই আশঙ্কায় ভয় পেয়ে আর সংসার ধর্ম্ম করতে চান না। নিজের সমস্ত বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও কর্ত্তব্যের কথা তাঁদের আর মনেই হয় না। সব কিছু বলিষ্ঠ ও সাহসী মনের জোর হারিয়ে নিজে যেন শিবত্ব প্রাপ্ত হয়ে গেছেন এইরকম মহত্ত্ব দেখিয়ে ভোগ বিলাস ও আয়েস রূপ শ্মশানে মশানের মধ্যে থেকে জীবনটাকে নিয়ে ববম্ ববম্ করে গাল বাজিয়েই কাটিয়ে দেবার ঠিক করে নিয়েছেন। ঐ রকম পথের যাত্রী এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও আজকাল হয়েছেন। এঁরা সব এমন মজবুত্ যুক্তির অবতারণা করেন যেন ঠিক তাসের ঘরের মত। যাক্‌গে এসব কথা, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি,—বর্ত্তমানের লেখা পড়া শিক্ষায় নারীদের সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত আছে তা আমাকে বল।

গুরুপত্নী বলিলেন,—আমার কি অভিমত তা তোমাকে এখন বলতে গেলে তোমার স্নানের ও খাবার অনেক বেলা হয়ে যাবে।

গুরুদেব বলিলেন,—বেলা না হয় আজ একটু হোক্, তোমার কাছে আজ এই সব কথার উত্তর গুলো শুনতে বেশ ভাল লাগছে।

গুরুপত্নী বলিলেন,—আচ্ছা তা হ'লে তুমি জামা টামা ছেড়ে এস, তোমার জন্যে একটু সরবৎ নিয়ে আসি। এই বলিয়া গুরুপত্নী স্বামীর জন্য এক গ্লাস সরবৎ লইয়া আসিয়া তাঁহাকে দিলেন। অতঃপর বলিতে লাগিলেন,—বর্ত্তমানের যে শিক্ষা পদ্ধতি তাকে আমি বিশেষতঃ নারীদের জন্যে উপযোগী মনে করি না। কারণ এই শিক্ষার মোহেতে পড়ে তাঁদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশেরই সব রকম ভাবে শরীর, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশিত লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হ'ব এবং তার অধিকার শক্তিতে উপার্জ্জন করে দুঃখ কষ্ট হতে অব্যাহতি পাব, এই অনির্দ্দিষ্ট আশায় আলেয়ার পেছনে ছোটার মত হয়ে ছেলেদের বাধ্য হয়ে এই শিক্ষা নিতে হচ্ছে এবং তার জন্যে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করে' ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীর স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে' ফেলতে হচ্ছে; তার উপর তার সঙ্গে যদি মেয়েদেরও ঐ রকম ভাবে পাল্লা দিয়ে প্রতিযোগিতা করে যেতে হয় তাহলে এ জাতি আর কদ্দিন টিকবে?

গুরুদেব বলিলেন,—তা হলে কি তুমি বলতে চাও যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে না এবং লেখাপড়া শিখে চাকরী বাকরী করবে না? লেখাপড়া যদি না শেখে তা হলে তারা তোমাদের মত জ্ঞান, বুদ্ধি কি করে লাভ করবে এবং জগৎকে চিনবেই বা কি করে, অর্থাৎ আমাদের নারী সমাজকে তুমি নিজে শিক্ষিতা হয়ে তাদের কি অশিক্ষিতা হয়ে থাকতে বল?

গুরুপত্নী বলিলেন,—আমি লেখাপড়া না শেখবার কথা কি কখনো বলতে পারি? আমি কেবল তোমার প্রশ্নের উত্তরে বর্ত্তমানের লেখাপড়া শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছি মাত্র। আমি মনে

করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলো বাঁধা ধরা বই পড়লে যে জ্ঞান বুদ্ধি হবেই একথা বোধ হয় কেউ বলতে সাহস করবেন না। প্রকৃত জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা, বোধ প্রভৃতি এগুলো মানুষকে জন্মগত কিছু লাভ করে আসতে হয় এবং তারপর জন্মাবধি আদর্শ পরিবেশের ও আবহাওয়ার মধ্যে থেকে অনেক কিছু সঞ্চয় করে নিতে হয়। পরে নিবিষ্টমনে বিদ্যা চর্চ্চার দ্বারা জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সেই লভ্য বস্তুগুলির পুষ্টিসাধন হয়। এইরূপ নিয়মই মানুষকে যথার্থভাবে বড় করে' তুলে বলেই আমার বিশ্বাস। ডিগ্রিটাই বড় কথা নয়; ওতে মানুষকে প্রকৃত ভাবে বড় করে গড়তে যে কত সহায়তা করছে তা তুমি আমি সকলেই অনুভব কচ্ছি। যে বিদ্যা শুধু অর্থকরীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ সেই অর্থরূপ মহালক্ষ্মীকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে দর্শন পাবার মত যে দেশে কোন উপায় নেই, এবং সেই অর্থলক্ষ্মীর অন্বেষণের জন্যেই কেবল মাত্র সরস্বতীর সাহায্য লাভ করবার আবশ্যক থাকে তাহলে কি সত্যই সেই বিদ্যারূপা ও জ্ঞানময়ীঅধিষ্ঠাত্রীদেবীকে অন্তরের মধ্যে বসিয়ে তাঁকে ধ্যান করে যাবার মত অবকাশ থাকে? এবং তাঁর চরণে জ্ঞানের অঞ্জলি দেবার মত ক'টা লোকেরই বা সে সম্বল অর্জ্জিত হয় ও হতে পারে তাই আমি ভাবি। এ জন্যেই আমার মনে হয়, আজকাল আমাদের দেশে প্রকৃত মনীষী ও মনীষার সংখ্যা কমে যাচ্ছে, যা কিছুকাল পূর্ব্বেও ঐ সংখ্যাই বেশী ছিল। এই কথার পর গুরুগৃহিণী একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—অবস্থাদৃষ্টে তাই আমার মনে হয় যে, আমাদের শিক্ষার এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কেবল মাত্র বছর বছর ছেলে মেয়েদের নিয়ে হাজার হাজার শুধু ডিগ্রি উৎপন্ন করেই কর্ত্তব্য সমাধা করে চলেছে। এটা যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ডিগ্রি তৈরীর ফ্যাক্‌টরী মাত্র। সেই ডিগ্রি ছেলে মেয়েদের গায়ে

মাখিয়ে দিয়ে যেন ফ্যাক্‌টী বলছে, যাও তোমরা এবার সংসার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়, গায়ে জল ঢুক্‌বে না, তবে নাকে মুখে ঢুকে হাঁপাতে থাক্‌বে মাত্র। কি বলব! যে শিক্ষায় মানুষের পক্ষে সত্যকারের জীবন ধারণের কোন উপায় নির্দ্দেশিত নেই এবং প্রকৃত ভাবে মানুষ করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে না, সেই শিক্ষাই পুরুষ-নারী উভয়েই সমান তালে গ্রহণ করে চলেছে। এ কি ভীষণ অবস্থা হল!! প্রত্যেক বিদ্যায় প্রকৃত জ্ঞানী ও পণ্ডিত হতে হলে যে কিরূপ নিষ্ঠা পূর্ব্বক ধ্যান ও সাধনা করতে হয় সে কথা তোমাকে বলাই বাহুল্য। কারণ তুমি যে বিদ্যায় জ্ঞানী গুণী হয়েছ তাকে যথার্থ ভাবে অর্জ্জন করতে বহু চিন্তাযুক্ত হয়ে একাগ্র ভাবে সাধনার দরকার হয়েছে এবং এখনও প্রায় সর্ব্বদা সেই সাধনার মধ্যেই ডুবে থাক। তত্রাচ আমি একটি উপমা দিয়ে আগেকার দিনের শিক্ষা ও সাধনা সম্বন্ধে বলছি,—আমার ঠাকুরদা খুব বড় নৈয়ায়িক ও অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর যখন বয়েস একশ পেরিয়ে গেছল তখনও তিনি টোলে বসে শিষ্যদের পরম যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা দেবার সময় কোন বিষয়ের জন্যেও তাঁকে কেহ কখনও পুঁথি খুলতে দেখেনি। যখন ছাত্রদের মুখে মুখে অনেকখানি পাঠ দিতেন তখন যদি কোন ছাত্র বলত যে, "এই শ্লোকগুলি কোন পুঁথিতে আছে তা জান্‌তে পারলে সেই পুঁথি থেকে টুকে রাখতেম্" তখন তিনি বলে দিতেন "অমুক মাচার উপর অমুক জায়গায় এতগুলো পুঁথির নীচে নামাবলী জড়ান যে পুঁথিটি পাবে তার অমুক পৃষ্ঠার শেষে এই শ্লোকগুলি লেখা আছে দেখতে পাবে"। তোমাকেও ত দেখে আসছি ঐরূপ ভাবে শত শত গানকে মুখস্থর মধ্যে রেখেছে। তোমার কাছে যদি কেউ কেউ কোন কোন রাগের ধ্রুপদ শুন্‌তে ইচ্ছে করেন তাহলে তাঁদের বাসনানুযায়ী এক একটা রাগের দশ বারটা করে

নানা তালের গান শুনিয়ে দাও। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত অন্তঃ-দৃষ্টি দিয়ে সাধনায় মানুষ কত গভীর ভাবে তাকে দর্শন করতে পারে এবং সর্ব্বদা মনে রাখতে পারে। আর এখন আমরা যদি কোন কিছু পড়াতে যাই তাহলে সেই কিছুটিকেও বইএর সাহায্য না নিলে চলে না এবং কথায় কথায় অভিধান খুলতে হয়। এমনি আমাদের বিদ্যার উপর দখল, ধ্যান ও চিন্তা। সঙ্গীতবিদ্যাতেও এরূপ অবস্থা আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। চমৎকার ভাব ও কবিত্বপূর্ণ বড় বড় রচনার ধ্রুপদ গানকে মুখস্থ রাখা খুব সাধনা ও চিন্তার দরকার বলে এবং বর্ত্তমানে এই বিদ্যা নিছক অর্থকরী হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে ধ্রুপদ শিক্ষার উপর সংযম হারিয়ে খেয়াল গানের উপরেই বেশী আগ্রহ এসে গেছে। তাও তোমার মুখেই শুনি যে, মাত্র দুচার লাইনের রচনা খেয়াল গানও অনেকে মুখস্থ করে রাখবার আবশ্যক মনে করেন না। সৈঁইয়া, পানিয়া, ফাগুওয়া, কজরা, গজরা ইত্যাদি একটা কথাকে উচ্চারণ করেই চালিয়ে দিচ্ছেন। আবার আজকাল একশ্রেণীর শিক্ষকদের তারও দরকার হয় না। অর্থাৎ রাগ রাগিণীর চর্চ্চার, শিক্ষার ও সাধনার প্রয়োজনের কোন বালাই না রেখে দুচারটে স্বরলিপির বই দিয়েই হার্ম্মোনিয়মের সাহায্যে তাঁদের পয়সা রোজগার হয়ে যাচ্ছে। এঁরাই এখন বেশী করে আমাদের দেশের শিক্ষক হয়ে গেছেন। তাই বলি শুধু পয়সা রোজগারের জন্যে লেখাপড়াই বল আর অন্য বিদ্যাই বল যদি শেখবার দরকার হয় তাহলে সে বিদ্যার উপর সরস্বতীদেবী প্রকৃতভাবে দর্শন দেবার সুযোগ না পেয়ে তিনি কৃপা করে পাঠান তাঁর বাহনটিকে। সে এসে তার উপর বসে ডিম্ব প্রসব করতে থাকে। এইজন্যেই বোধ হয় আজকাল অনেক বিদ্যানিকেতনের ছাত্ররা ৺সরস্বতী মাতার পূজার দিনে তারা প্রতিমা ক্রয়কালীন কুমোরদের গঠিত যে মূর্ত্তির মধ্যে হাঁসের পুচ্ছ

ও গ্রীবা ইত্যাদি ভঙ্গীগুলি বিশেষ বড় করে ঘোরাণ ফিরাণ ভাবে থাকে সেই মূর্ত্তিটিকেই তারা বেশী পছন্দ করে নিয়ে আসে।

গুরুদেব তাঁহার পত্নীর সরস কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং একটু পরে বলিলেন,—মেয়েদের জন্যে কি রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হলে যথার্থ কার্য্যকরী ও উপযোগী হতে পারে বলে তোমার বিশ্বাস ?

গুরুগৃহিণী বলিলেন,—এ সম্বন্ধে আমার কামনা তোমার সঙ্গীত আশ্রমের পরিকল্পনার মতই অনেকটা, অর্থাৎ আমার মনে হয় সহরের প্রত্যেক পল্লীতে এবং গ্রামে গ্রামে ঠিক আশ্রমের আদর্শে ব্রহ্মচারিণীর মত ব্রত গ্রহণ করে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই যথার্থভাবে নারীদের সংসার ধর্ম্ম পালনের উপযোগী জ্ঞান অর্জ্জিত হবে। এই শিক্ষার মধ্যে থাকবে, মাতৃভাষা, সংস্কৃতভাষা, রাষ্ট্রভাষা, গীতা, ধর্ম্মপুরাণ, নীতি ও চরিত্রগঠনমূলক পুস্তক, প্রয়োজনীয় সামান্য ভাবে দেশের ইতিহাস, প্রত্যেকের নিজেদের বংশের ইতিহাস, সামান্য অঙ্কশাস্ত্র, ধর্ম্মসঙ্গীত, পূজাদিরনিয়মপ্রকরণ, গুরুজন, দীনদরিদ্র ও আতুরের সেবা, সন্তান পালন, রান্না, স্ূচীশিল্প, বারব্রত, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। এ বিষয়গুলিকে আট বছরের মধ্যে অর্থাৎ সাত হতে পনেরর মধ্যে সমাধা করে বিবাহিত হতে হবে। প্রত্যেক দিন স্নানাদির পর পূজাপ্রার্থনা করে' তারপর ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। সকলে আসনে বসেই পাঠ অভ্যাস করবে এবং সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করবে। এদের শিক্ষা দিবেন সন্তানবতী উপযুক্তা সধবা কিংবা অভাবে বিধবা জননীরা। যদি উপযুক্তা গুরুমার অভাব হয় তাহলে যথার্থ ধার্ম্মিক, নিষ্ঠাবান উপযুক্ত প্রবীণ ব্যক্তি গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। প্রত্যেক ছাত্রীর অভিভাবকদের ও তাঁদের রীতি, নীতি ও ভাবধারাকে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িয়ে রাখবার জন্যে একান্ত-

ভাবে বাসনা রাখতে হবে। এই হচ্ছে বিশ্বের দরবারে চির সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখবার জন্যে আমাদের ভারতবর্ষের নারীদের আদি ও অন্তকাল পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষার ভাবধারা। একে হারালে আমাদের সব ঐতিহ্যই চলে যাবে।

গুরুদেব বলিলেন,—সবই যথার্থভাবে বুঝলেম, কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা দেখে বলতে হচ্ছে যে, সব মেয়েরা যদি একপথে চলতে না চান্ তাহলে তার কি উপায় আছে ?

গুরুপত্নী বলিলেন,—এক পথে মানে ? সকলকে সংসার ধর্ম্ম পালনের কথা বলছ ?

গুরুদেব বলিলেন,—হাঁ তাই।

গুরুপত্নী বলিলেন,—আমার মনে হয়, শতকরা নিরানব্বই জন অভিভাবকই তাঁদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে দেন চাকরী বা অন্য কিছু করবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়। তাঁদের উদ্দেশ্যই থাকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে শ্বশুর ঘরে পাঠাতে হবে। যাই হ'ক তবুও আমি বলছি যে, যে সকল নারী ভিন্ন ভিন্ন পথকে আশ্রয় করে চলতে চান, তাঁরা সেই পথের অনুযায়ী পূর্ব্ব হতে সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষার মাধ্যমে সেই কল্পিত স্থানে পৌঁছবার জন্যে চলুন, কিন্তু যাঁদের সংসারেই আসতে হবে বলে জানা থাকে ও ইচ্ছা থাকে এবং অভিভাবকদের সেইরূপ সঙ্কল্প থাকে তাঁদের উপর বর্ত্তমানের এই পর্ব্বত প্রমান শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বা তাঁরা নিজে নিয়ে শরীর স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে এবং নারীদেহের প্রকৃতিদত্ত স্বভাবের ক্ষতি সাধন করে করে সৃষ্টির উৎস শক্তিকে দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ করে ফেলতে থাকবেন, এ আমি কোন মতেই উচিত মনে করি না। শেষের দিকটার অবস্থার বিচারে নারীদের পক্ষে ভীষণ অনিষ্ট-কর হচ্ছে। বয়েসের স্বভাবগুণে প্রকৃতিদত্ত নিয়মে যখন প্রত্যেক মাসে

তার ক্রিয়া প্রকাশ পায় তখন তাকে কত নিয়মে ও কত বিশ্রামের মধ্যে থাকবার যে প্রয়োজন হয় তা সকলে জেনে শুনেও শিক্ষার্থিনীদের জন্যে সে নিয়ম পালনের কোনই ব্যবস্থা থাকে না। ঐ অবস্থাতেই দেখা যায় অধিকাংশ মেয়েরা বাসের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে ইস্কুল কলেজে গিয়ে কাঠের বেঞ্চিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়াশুনা করেন। এযে কত বড় অনিষ্ঠকর ও চিন্তার কথা তা বুঝে ও কি আমরা সতর্ক হচ্ছি? আমরা বাল্য বিবাহের ঘোর অপক্ষপাতি বটে কিন্তু অনেক সময় এই সব দেখে শুনে মনে হয় যে, অনেক দিক দিয়েই আগেকার নিয়ম জাতিরপক্ষে মঙ্গলজনক ছিল। আমার মনে হয়, পুরুষ ও নারীর পক্ষে বেশী বয়সে বিয়ে ইষ্টকর না হয়ে বরং অনিষ্টকরই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয় এবং সেই বেশী বয়েসের সৃষ্ট জীবগুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না অর্থাৎ বীর্য্য, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি শক্তিগুলির অনেক অভাব নিয়ে তারা জন্মায়। এর প্রমাণে দেখা যায়, যে জাতিদের মধ্যে এখনও বাল্য বিবাহের অর্থাৎ যথা সময়ে বিবাহের প্রচলন আছে তাদের সন্তান সন্ততিদের স্বাস্থ্য আমাদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তি সামর্থযুক্ত হয়। গাছে যখন ফুল দেখা দেয়, তখন তারা মানুষকে ফলের আগমন বার্ত্তাও জানিয়ে দেয়, এবং প্রকৃতির নিয়মে সেই ফুলের মধ্যে গাছ তার অন্তরের কামনায় রস-রূপ মধু দিয়ে মক্ষিকাদের আকর্ষণ করে শুধু মাত্র ফল জন্মাবার জন্যে। সেই প্রকৃতি দত্ত নিয়মের উপর মানুষ হাত চালিয়ে যদি গাছের ফুলকে ফোটার সময় কেবল ছিড়ে ফেলে দিতে থাকে এবং মনে করে এখন ফল ধরাতে দেবো না, গাছটি আরও অনেক বড় হোক তারপর ফল ধরাব; তাহলে সেই গাছের স্বভাবগত শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে গিয়ে তারপর আর তার কাছে উপযুক্ত ফল পাবার কি আশা করতে পারা যায়, না ততদিন পর্য্যন্ত যথা সময়ের মত আর শক্তি, সামর্থ ও স্বভাবগত উৎপাদনের ইচ্ছা ও কামনা

থাকতে পারে? কাজেই এ রকম অনিয়ম ব্যবস্থার পরিণামের দিকে তাকিয়ে আমাদের দেশের নর নারীদের জন্মে বিশেষ ভাবে চিন্তা করবার আবশ্বক আছে বলে মনে করি।

গুরুদেব বলিলেন,—তুমি এই মাত্র যে সব কথা বল্‌লে সে গুলোকে যথাযথ ভাবে পালন করতে হলে পুরুষ নারী উভয়কেই যথা সময়ে বিবাহ করে সংসারী হতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক সমস্যায় এরূপ ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, তার জন্মে দেশের অধিকাংশ ছেলেদেরই বিবাহ করে ভরণ পোষণ করবার সামর্থ নেই এবং কন্যাদের পিতারাও একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও ঐ দুরবস্থার মধ্যে পড়ে যথা সময়ে পাত্রস্থ করতে পারছেন না। তার উপর ওই প্রধান কারণের সঙ্গে উভয় পক্ষের পছন্দ অপছন্দের ভীষণ ব্যাপার আছে। কাজেই সব কিছুর পরিণাম জেনে শুনেও নিরুপায় হয়ে সন্তানদের পিতা মাতাকে সহ্য করে যেতে হচ্ছে। সুতরাং তুমি, আমি শুধু মুখে বলে এর কি সমাধানে আনব বল?

গুরু গৃহিনী বলিলেন,—সমাধান কি আমরা করতে পারি? এর সমাধানের জন্মে ব্যবস্থা করতে হবে রাষ্ট্রকে। এমন ভাবে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য যে, যাতে করে দেশের ছেলেরা কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যা শিখে প্রত্যেকে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র লাভ করতে পারে। তারপর তাদের বিবাহ করার নিয়ম মেনে চলার জন্যে বাধ্যতামূলক ভাবে আইন থাকবে। এইরূপ সুব্যবস্থার দ্বারাই যুবকদের মন সব দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করবে এবং সমগ্র জাতির কল্যাণের পথ প্রশস্ত করা হবে। আমাদের ভারতীয়দের বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির এখনকার দিনে বেচে থাকবার বয়েসের শেষ ধার্য্য এক রকম প্রায় ষাট্ পর্য্যন্তই সীমা ধরতে হবে। তার মধ্যে শেষের দশটা বছর তেমন ভাবে কারো আর কর্ম্ম শক্তি থাকে না। মোট ষাট

পঞ্চাশকেই এক রকম সীমা ধরে তার মধ্যেই যদি সন্তান সন্ততি মানুষ হল ত হল। সুতরাং মোট এই কয়টি বছরের মধ্যে সংসার ধর্ম্ম করতে হলে সাধারণ ভাবে অর্থ উপার্জ্জনের উপযোগী বিদ্যা শিক্ষার বাবদে কুড়ির অধিক বয়েসকে নষ্ট করে ফেলা কোন ক্রমেই উচিত মনে করি না। কারণ সংসারের অনেক কিছু কর্ত্তব্য পালন করতে হ'লে যত সময়ের প্রয়োজন তা আজকাল আর এই জীবনী শক্তিতে কুলোবে না, কাজেই অন্তত: গোটা তিরিশ বছরও সংসারীদের সময় থাকা অত্যাবশ্যক। আমার বিশ্বাস ঐরূপ ব্যবস্থার দ্বারাই ঐ সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে। নচেৎ এইরূপ ভাবে চলতে থাকলে এই জাতির বড় জোর আর পঞ্চাশ বছরের পর কি যে হবে ও কি যে থাকবে তা ভগবানই জানেন।

গুরুদেব বলিলেন,—সবই বুঝলেম কিন্তু এই চিন্তায় কার যে ঘুম হচ্ছে না তাই দেখতে পাচ্ছি না।

গুরু গৃহিণী বলিলেন,—এত বড় সমস্যার মধ্যে থেকে আমরা যদি সুখে নদ্রা যেতে থাকি তা হলে কি আর বলবার আছে। যাক্ এখন ওঠ, নেয়ে ফেল, আমি খাবার জোগাড় করি গে; নিস্ফল আলোচনায় কেবল তোমার বেলা হয়ে গেল।

গুরুদেব উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন,—আলোচনা হয়ত নিস্ফলই হ'ল কিন্তু বেশ ভাল লাগল।

গুরুগৃহিণী বলিলেন,—এ ভাল লাগায় ত আমার তৃপ্তি নেই, কখন রান্না করেছি সেগুলো এখন তোমার খেতে ভাল লাগলেই বাঁচি।

গুরুদেব তাঁহার পত্নীর মাথায় হাত বুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—খুব ভাল লাগবে, খুব লাগবে, এতকাল তোমার সব গুলোই ভাল লেগে আসছে আর আজ আবার তার ব্যতিক্রম হয়? যতকাল বাঁচব ততকালই ভাল লাগবে। এর জন্যে তুমি কোনদিনই চিন্তা

কোরনা। কতদিন আমার এই দেবীর হাতের শুধু শাক অন্নই অমৃতের মত আস্বাদ পেয়ে পরম তৃপ্তি করে খেয়েছি। যাঁর সাহচর্য্য সর্ব্বদা প্রাণে আনন্দ ও তৃপ্তি আনে তাঁর কৃত কোন কিছু কি মন্দ লাগতে পারে ?

এই বলিয়া প্রেমার্দ্রচক্ষে গুরুদেব স্নানের জন্য আনন্দিত মনে চলিয়া গেলেন। গুরুপত্নী তাঁহার অঞ্চলটির অগ্রভাগ অঙ্গুলি দ্বারা জড়াইতে জড়াইতে তাঁহার শিবতুল্য পতির দিকে ভক্তিশ্রদ্ধাভিভূত নয়নে তাকাইয়া একটি পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন ॥

বিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণদাসবাবাজী বাড়িতে আছ?

কে ও! বাউলঠাকুর নাকি?

হাঁ আমি।

এস এস দাদা,—এই বলিয়া বৈষ্ণববাবাজী দরজা খুলিয়া বলিলেন,—বহুকাল তোমাকে দেখিনি, তোমার কথা প্রায়ই আমাদের আলোচনা হয়। এস বাড়ীর ভিতরে; এতদিন কোথায় ছিলে বলত? লক্ষ্মী মা! কম্বলটা নিয়ে এসে এখানে পেতে দাও।

লক্ষ্মী বৈষ্ণবপত্নীর সহিত রান্নার ব্যবস্থা করিতেছিল, ডাক শুনিয়া কম্বলটা হাতে করিয়া আনিয়া বারাণ্ডায় বিছাইয়া দিল।

বৈষ্ণববাবাজী লক্ষ্মীকে বাউলঠাকুরের পরিচয় দিয়া বলিলেন,—ইনি আমার দাদার মত, পরম প্রেমিক ও ভক্তমানুষ।

লক্ষ্মী ইহা শুনিয়া বাউলঠাকুরকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল। বাউলঠাকুর নিষেধ করিয়া বলিলেন,—মা! আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করি না, প্রণাম নেবার মত আমার যোগ্যতা নেই, ক্ষুদ্র প্রাণীদেরও আমাপেক্ষা বড় বলে মনে করি; কারণ তাদের মধ্যে দেখি আমাদের মত স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, হামবড়ত্ব ও আত্মবঞ্চনা নেই।

লক্ষ্মী বাউলঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়া এক নূতন শিক্ষা লাভ করিল এবং তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,—"কি সুন্দর মুখের জ্যোতি, দীর্ঘ গুম্ফ শ্মশ্রুর মধ্য দিয়া যেন উহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সদানন্দময় মূর্ত্তিখানি দেখিলে শ্রদ্ধা উছলিয়া পড়ে।" লক্ষ্মী অল্পক্ষণ সেই মুখের দিকে তাকাইয়া শ্রদ্ধান্তঃকরণে গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল।

বাউলঠাকুর বৈষ্ণববাবাজীকে বলিলেন,—এমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মত মেয়েটিকে কোথায় পেলে ভাই? আমি ত কৈ কখনও এঁকে দেখিনি! মূর্ত্তিখানি দেখে মনে হল যেন তপস্বিনীর বেশে উমা।

বৈষ্ণববাবাজী লক্ষ্মীর সমস্ত পরিচয় দিয়া বলিলেন,—শুধু কি তাই, আমার যতটুকু কীর্ত্তনগান জানা আছে তা সমস্তই অল্পদিনে লক্ষ্মী আয়ত্ত করে নিয়েছে। সে এমন সুমিষ্ট ও সুন্দরভাবে কীর্ত্তন গায় যে, সেরূপ ভাবে আমি কোনদিনই গাইতে পারিনি ও পারবও না। স্বভাবে ও গুণে লক্ষ্মীমা আমার যেন একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপা নিয়ে জন্মেছে।

বাউলঠাকুর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—বল কি! তুমি অদ্বিতীয় কীর্ত্তনগায়ক হয়ে বলছ তোমার চেয়েও ভাল কীর্ত্তন গায়!! তাহলে ত তাই আমাকে তার কীর্ত্তনগান শোনাতে হবে।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—নিশ্চয়ই শোনাব। লক্ষ্মী শুধু কীর্ত্তনগান কেন, অন্যান্য দেবদেবী বিষয়ক, ধর্ম্মসঙ্গীত, গ্রাম্যসঙ্গীত প্রভৃতিও খুব ভাল গাইতে পারে। ঐসমস্ত গান ও কিছু হালকা ধরণের কীর্ত্তন সে তার পিতার কাছে শিক্ষা করেছিল। তারপর একটা ঘটনা শোন, লক্ষ্মী জানত না যে, বৈষ্ণবের বাড়ীতে শাক্তদের গান গাইতে নেই; তাই সে একদিন একটি শ্যামাসঙ্গীত আপনমনে ভাবে বিভোর হয়ে গাচ্ছিল। আমি সেই গানে আকৃষ্ট হয়ে স্তব্ধভাবে বসে শুনতে লাগলেম। শুনতে শুনতে আমার মন খুব ভাবযুক্ত হয়ে গেল এবং চোখ দিয়ে অনেক জলও গড়িয়ে পড়ল; কিন্তু গানটি শেষ হবার পরক্ষণেই আমার বাড়ীতে ঐরকম গান গাওয়ার জন্যে সংস্কারবশতঃ মনটা কিরূপ অপ্রসন্নভাব হয়ে গেল। তখন অনেকক্ষণ ধরে বিচার দিয়ে মনকে বুঝাতে লাগলেম যে, যে কোন গান শুনে যদি অন্তরের মধ্যে সত্যকারের ভাবভক্তির উদয় হয় তাহলে সে গানের সুর ও ভাবকে অস্বীকার করা

মানে আত্মবঞ্চনা করা। লক্ষ্মীমা আমাকে যেন সেদিন লক্ষ্মীর মত কৃপা করে আমার সমস্ত ভ্রম ঘুচিয়ে দিল এবং মনের কোনে যে গোঁড়ামিটুকু আশ্রয় করেছিল তা মুহূর্ত্তে অপসারিত হয়ে গেল। বুঝলেম যে, প্রেম, ধর্ম্ম ও ভাবমূলক সঙ্গীতের মধ্যে কোনরূপ ভিন্নগোষ্ঠী নেই, সকলের উদ্দেশ্য ও কামনা একই; কেবল সেই একইস্থানে পৌঁছবার পৃথক পৃথক রাস্তা মাত্র, যার যেমনভাবে যে রাস্তা দিয়ে যেতে ভাল লাগে। আমার সেইদিন হতে মনে হয়েছে যে, সাংসারিক জীবনে মানুষের পক্ষে সব রাস্তাই অন্তরের মধ্যে খোলা রাখতে হয় এবং প্রয়োজনানুসারে সেই সকল পথের আলো পেয়ে মনকে আলোকময় করা দরকার। তাছাড়া একথা সেদিন খুবই সত্য বলে মনে হল যে, ধর্ম্ম ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ গোঁড়ামির স্থান থাকা উচিত নয়, তাতে হয় কি আঁকড়ে থাকা বস্তুটাকে রক্ষা করে রাখবার জোর থাকে না, শক্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে গিয়ে পাওয়া বস্তুও শেষে হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই এখন আমি বেশ বুঝেছি যে, নিজের সাধনার ভাববস্তুর সঙ্গে সম্প্রদায়গত ভাববস্তুগুলিকে একত্রে এনে ফেলতে পারলে তবেই ভাবের সমৃদ্ধি লাভ হয়ে মানুষকে শীগ্‌গীর যথার্থস্থানে উপনীত করতে সহায়তা করবে। তবে একটা কথা, ধর্ম্ম ও ভাবচর্চ্চার প্রথম সাধনাকালে একটিকে ধরে থেকে বহুদূর অগ্রসর হবার আবশ্যক করে। প্রথমেই বহুকে ধরাও যায় না এবং তা উচিতও নয় মনে করি। যাই হক, আমি কিন্তু সেইদিন হতে লক্ষ্মীর কাছে সমস্তরকম ভাবের গানই খুব ভাল লাগে বলে মাঝে মাঝে শুনি। তাছাড়া সে প্রত্যেকটি গানই এমন ভাবযুক্ত হয়ে গায় যে, সেকথা তোমাকে কি আর বলব। ওর গান শুনলে আমাদের চোখ ফেটে জল চলে আসে। সঙ্গীতের যে প্রাণধর্ম্ম সেটাকে ও যেন সবই আয়ত্ত করে নিয়েছে।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাউলঠাকুর বলিলেন,—আজ তোমার কাছে বহু তত্ত্বকথা শুনে আমার মনের দ্বার অনেকখানি খুলে গেল। সত্যই আজ আমার সুপ্রভাত। তুমি যে সমন্বয়ের কথা বললে তা যথার্থই বলে আজ আমি অন্তরে বিশেষ করে অনুভব করলেম। তোমার মধ্যে আজ সবচেয়ে বড় জিনিষ দেখে বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দ পেলেম ভাই। সত্যই তুমি মহালক্ষীর কৃপা এতদিনে পেয়েছ তাই তোমার হৃদয়সিংহাসনে কৃষ্ণ-কালী এক হয়ে গেছেন এবং সকল ধর্ম্মের সারকে বুঝেছ। একেই বলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেলে যথাসময়ে তিনি ফল উৎপাদনের ব্যবস্থার জন্যে সমস্ত যোগাযোগই করে দেন। কৃষ্ণ, কালী এ দুটি কে? এবং তার অর্থ ও ভাব কি? সে সম্বন্ধে জ্ঞান দিয়েছেন একজন সাধক কবি। হঠাৎ তাঁর গানটি আজ আমার মনে উদয় হয়ে গেল। তিনি কি বলেছেন তা গেয়ে শোনাচ্ছি;—এই বলিয়া বাউলঠাকুর গাহিতে আরম্ভ করিলেন,—আশা ভৈরবী সুরে—

"শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপ্‌ব আমি শ্যামের নাম
মা হবেন মোর মন্ত্রগুরু ঠাকুর হবেন রাধাশ্যাম।
ডুবে শ্যামা-যমুনাতে খেলব খেলা শ্যামের সাথে
শ্যাম যবে মোরে করবে হেলা মা পুরাবে মনস্কাম।
আমার প্রাণের দেবতার শ্যাম-শ্যামা দুটি তার
সেই দেবতায় ঝঙ্কার দেয় ওঙ্কার উঠে অনিবার।
মহামায়ার মায়ার ডোরে আনব বেঁধে শ্যামকিশোরে
আমি কৈলাসে তাই মাকে ডাকি দেখব সেথা ব্রজধাম॥"

গানের ভাবার্থতে সকলের হৃদয়ের উপর যেন ক্রন্দনরোধের মত শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন উত্থিত হইতে লাগিল। গান শেষ করিয়া বাউলঠাকুর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। বৈষ্ণববাবাজী আকুল ভাবে তাঁহাকে

জড়াইয়া ধরিলেন। ভাবের এ দৃশ্য এক অনির্ব্বচনীয় মুগ্ধকর রূপ ধারণ করিল।

বাউলঠাকুর বলিলেন,—তাই বলি, গানের প্রকৃত মর্ম্মগ্রাহী ও এরূপ ভাবুক না হলে তার পক্ষে গান শোনা যথার্থ হয় না।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—এই গানটি যিনি রচনা করেছেন সেই সাধককবিকে আমি নমস্কার করি। আহা,—কি অপূর্ব্বভাবে গানের মধ্যে দিয়ে চরম তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন! সত্যই মহাশক্তিকে আশ্রয় না করলে কৃষ্ণপ্রেম আসতে পারে না। তাই মনে হয় একই বস্তুর দুটি ভিন্ন রূপ। দুটিকেই একত্রে আনতে পারার চেষ্টার জন্যেই যোগের সাধনা করতে হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বও তাই। সেই মহাশক্তি শ্রীরাধার রূপের মধ্যে থেকে শ্রীকৃষ্ণকে চিনিয়েছেন এবং লীলাময় স্বয়ং শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। মানুষের ঐ দুইটিই অবলম্বন না হলে প্রেমের সাগরে যে ডুবতে পারা যায় না সে কথাই আজ বিশেষ করে উপলব্ধি হয়ে অনেকখানি জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল।

বাউলঠাকুর বলিলেন,—আর একটি ভক্তের রচিত গান শুনবে?

বৈষ্ণববাবাজী সাগ্রহে বলিলেন,—গাও ভাই গাও, আজ যেন আমার অন্তরে আনন্দ নেবার জন্যে হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেছে। সত্যই ভাই এই জন্যেই তোমাকে এত করে মন চায়।

বাউলবাবাজী সুরট রাগে নিম্নলিখিত গানটি গাহিতে লাগিলেন—

"হরি কে জানে মহিমা তোমার
বুদ্ধীন্দ্রিয় অগোচর তুমি বিশ্বাধার।
তুমি রমেশ, উমেশ, তুমি দীনেশ, গণেশ,
তুমি বুদ্ধি নির্ব্বিশেষ বিশেষ নাহি যার,

বাখ্যা মাত্র আখ্যা ভেদ বস্তুতঃ নহ প্রভেদ
হরি হে করহ ছেদ এ ভেদ আমার।
বেদে নাহি পায় অন্ত তোমার ওহে রাধাকান্ত
বেদান্ত তোমারে কয় নিত্য নিরাকার,
সাংখ্যে নাহি সংখ্যা পায়, পাতঞ্জল নিরুপায়
পুরাণে সতত গায় সচ্চিৎ সাকার।
দর্শনে দর্শন তার জ্ঞানে বুঝি সাধ্য কার
কিন্তু ভক্তি দ্বারে তুমি বদ্ধ অনিবার।
যে জনা যেভাবে ভাবে প্রকাশ হও সেইভাবে
ভাবের অভাব ভাবে ভাবনা অপার॥"

গানটি শেষ করিয়া বাউলঠাকুর বলিলেন,—এ গানটি বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামে একজন সুপণ্ডিত, সুগায়ক ও উচ্চস্বরের কথকের মুখে কথকথা পাঠের সময় শুনেছিলেম। তাঁর এমনই সুউচ্চ ও তান-বহুল দরদ মাখান গলা ছিল যে, হাজার হাজার লোক কথকথা ও গান শুনে মোহিত হয়ে যেত। সেদিন তাঁর কথকথা সাঙ্গ হবার পর আমি তাঁর কাছে গিয়ে যখন বললেম যে, প্রভু! আমাকে এরকমভাবের দুচারখানি গান শিখিয়ে দিবেন? তখন তিনি আমার সে কথা শুনে পরম স্নেহে তাঁর বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে তিন চারদিন রেখে আমাকে অনেকগুলি ভক্তিমূলক ও দেহতত্ত্বের গান শিখিয়ে দেন। তাঁর মত ধাম্মিক, দয়ার্দ্রচিত্ত, ভাবুক ও প্রেমিক মানুষ আমি জীবনে খুব কম দেখেছি।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—সত্যই আজকাল প্রকৃত ধাম্মিক ও দয়াবান মানুষ বড়ই দুর্লভ হয়ে পড়েছে। কথকথা, রামায়ণগান প্রভৃতি এগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্যে যে কত উপকার করে আসছিল তা বলে

শেষ করা যায় না। থিয়েটার, সিনেমা এসে মানুষের ভালর দিকে আকর্ষণ সব নষ্ট করে দিল। পূর্ব্বোক্ত গানের একটাতেই মানুষের মনে কত বেশী যে খোরাক যোগায়, তা পাবার পথ প্রায় একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হ'ক এখন বল তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

বাউলঠাকুর বলিলেন,—তোমার কাছে আজ উচ্চমার্গের ভাল ভাল কথা শুনে এমন আত্মহারা হয়ে গেছি যে, তাতে করে এতদিন কোথায় যে ছিলেম তা বল্‌তে সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি যেখানে গেছলেম সেখানেও যা, এখানেও তা; সেদিন এক সঙ্গীতসাধকের আশ্রমে গেছলেম, সেখানেও দেখি এইরূপ মাহাত্ম্য। সেই সাধকের একটি শিষ্যাকে দেখলেম যেন তোমার ঐ লক্ষ্মীমাটির মতই এক অপূর্ব্ব শক্তির প্রতিমূর্ত্তি। সন্ন্যাসীমহারাজ সত্যানন্দজীর কাছে গিয়েও ঠিক যেন এইরূপ ভাবরাজ্যের মধ্যে পৌছি। ভগবানের এইটুকুই আমার প্রতি করুণা। আমি নিজে কিছুই করতে পারলেম না বটে কিন্তু সৎসঙ্গ লাভ ও মহাপুরুষের দর্শন আমার ভাগ্যে তিনি দেন।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—তুমি কি বল্‌ছ! তোমার স্বরূপ আমি বোধহয় কিছু বুঝি। তুমি নিজে কি ক'রে বুঝবে ভাই! আলো জানে না তার উজ্জ্বলতা কত; যারা অন্ধকারে থাকে তারাই জানে।

বাউলঠাকুর অতি লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—তুমি কি কথা আমাকে উদ্দেশ করে বল্‌লে বলত! আমি এখন ভক্তিশিক্ষায় প্রথম অবস্থার বালকদের মত লেখার উপর দাগ বুলিয়ে যাচ্ছি মাত্র। নিজে লিখবার ক্ষমতা তিনি কখন দিবেন জানি না। যাই হ'ক আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বল্‌ছি। কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শন করে শেষে বদ্রীনারায়ণের পথে যাত্রা করেছিলেম; সেখান থেকে ফিরে আজ সকালের ট্রেনে এখানে নেমে স্নান টান সেরে নিয়েই তোমার তীর্থে এসে উপস্থিত হয়েছি।

লক্ষ্মী এই সময় আসন পাতিয়া একটি রেকাবে করিয়া বাড়ীর তৈয়ারী কয়েকটি মিষ্টান্ন ও কিছু ফল রাখিল এবং বাউলঠাকুরকে বলিল,—জেঠামহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে এই সামান্য একটু জলযোগ করুন ; মা পাঠিয়ে দিলেন।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—ওঠ দাদা ওঠ, কিছু সামান্য খেয়ে নাও বেলা হয়েছে।

বাউলঠাকুর উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া রেকাবের উপর হইতে প্রসাদি তুলসীপত্রটি প্রথমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবানকে স্মরণপূর্ব্বক মুখে প্রদান করিলেন।

বৈষ্ণববাবাজী তখন লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিলেন,—মা! তুমি এইসময় একতারাটি নিয়ে এসে আমার বাউলদাদাকে পরমসাধক নীলকণ্ঠের সেই মাতৃরূপের অপূর্ব্ব বর্ণনার গানটি শুনিয়ে দাও ত!

লক্ষ্মী গৃহ হইতে একতারাটি আনিয়া কম্বলাসনের একপ্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক অর্দ্ধোন্মিলীত চক্ষে গান ধরিল,—

"হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার।
তুমি সর্ব্বলীলা প্রকাশিলে, প্রসবিলে ত্রিসংসার।
মায়ের মায়া পুত্রে যত পিতার মায়া নহে তত শাস্ত্র সম্মত
মা কথাটি বদন ভরা তুল্য দিতে নাহি আর।
পিতার কোলে থাকলে ছেলে স্থির মানে না ক্ষুধা পেলে ডাকে মা বলে,
মায়ের কোলে থাকলে ছেলে বাপের কোলে যায় না আর।
মাতৃহীন বালক যারা কি দুঃখে দিন কাটায় তারা জানেন মাতারা,
দীন হীন কাঙালের মত চক্ষে ধারা অনিবার...।"

গানটি শেষ হইয়া যাইবামাত্র বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—মা! তুমি

এরপর প্রেমিকসাধক দাশরথীরায়ের সেই গানটি একবার গেয়ে তোমার বাউল জেঠামহাশয়কে শুনিয়ে দাও।

লক্ষ্মী ভীমপলশ্রী রাগে গানটি গাহিতে আরম্ভ করিল—

"তোরে বড় ভাল বাসি মন
তাইত দিলাম হরিনাম অমূল্য রতন।
যত্ন করে রাখ হৃদয়-মন্দিরে দেখো দেখায়োনা রিপু ছ জনারে,
অন্তে দিতে হবে কর বাঁধবে করে কর দিবাকর সুত যখন।
নিত্য প্রভাতে উঠি শয্যা হতে মুখে নামটি কর উচ্চারণ,
ঐ নামেরি প্রভাবে সকল জ্বালা যাবে আনন্দে রবে মগন।
কেন দগ্ধে আছ ভব ক্ষুধানলে, স্নান করে এস জাহ্নবীর জলে,
ঐ নাম মুখে দিবে তুলে যাবে সকল ভুলে সুখী রবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
হরিনামের গুন কি বলিব আমি যা'তে সদা সুখী শুকদেব গোস্বামী,
তিনি দিলেন দয়া করে এ দাশরথীরে এড়াতে কাল শমন॥"

গানটি শেষ করিয়া লক্ষ্মী বৈষ্ণববাবাজীকে বলিল,—বাবা! আমাকে এখন যেতে কি অনুমতি দিবেন?

বৈষ্ণববাবাজী লক্ষ্মীর মস্তকে গভীর স্নেহযুক্ত হস্ত বুলাইয়া সজল নয়নে বলিলেন,—এস মা আমার।

বাউলঠাকুর পাত্র হইতে যে বস্তুটি খাইবার জন্য হাতে করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মীর গান যতক্ষণ চলিল ততক্ষণ তাঁহার হাতেই থাকিয়া গেল। ভাবে তন্ময় হইয়া লক্ষ্মীর কণ্ঠের সঙ্গীত সুধা আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন। তাহার পর গান শেষ করিয়া লক্ষ্মী চলিয়া যাইবার পর বৈষ্ণববাবাজীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—মেয়েটি সত্যই সব রকমে অপূর্ব্বা। আমার বহু দেশের বহু জায়গায় বহু প্রকারের

গান শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু কোথাও আমি এমন ভাবে সুমধুর কণ্ঠের রসাল গান শুনিনি। তোমার কাছে মেয়েটির সমস্ত পরিচয় পেয়ে মনে হচ্ছে যে সাত্বিক ভাবে জীবন গঠিত হলে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গীত সাধনায় কণ্ঠও সত্যকারের সুমিষ্ট ও সুন্দর হয়। তাই পাখীদের মধ্যেও দেখা যায় যে, যে সকল পাখীদের কণ্ঠ সুমধুর তারা আমিষাশী নয়; কেবল মাত্র ফল ও শস্যাদিই আহার করে থাকে। ভগবান যেন তাদের ঐ জন্যেই নিরামিষাশী প্রাণী করে পাঠিয়েছেন। সঙ্গীত চর্চ্চা করতে গেলে আহারের দিক দিয়ে বিচারের উপরও যে অনেকখানি তা নির্ভর করে এবং সেরূপ ভাবে চলাই যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় ও নির্দ্দেশ তা আমাদের ঐ দিক দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও বুঝে নিতে পারা যায়।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—তোমার এ কথাগুলি খুবই যুক্তিপূর্ণ বলে আমি মানি। যাই হ'ক এখন তুমি এগুলি খেয়ে নাও, তারপর বদ্রীনারায়ণ কিরূপ দর্শন করলে সে সম্বন্ধে একটু বর্ণনা কর।

বাউলঠাকুর জলযোগ সারিয়া বাবাজীর কাছে বসিয়া বলিলেন,—ও জিনিষ বর্ণনা করবার নয় ভাই, চাক্ষুষ দেখবার। তাও আমার মত এ দুটো চোখ নিয়ে নয়। যাত্রা পথের প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যের কথা কি আর বলব! যেন মুনি ঋষিদের বর্ণিত স্বর্গ বলে মনে হয়। তারপর ৺বদ্রীনারায়ণের পশ্চাতে তুষার শুভ্র নগরাজের অপূর্ব্ব লীলায়িত রূপের উপর প্রাতঃকালে তপনদেবের রক্তিম আভা পড়তে থাকায় যেন মনে হতে লাগল রজত কাঞ্চনের ঢেউএর খেলা চলেছে। এরূপ মনহারান শোভার সম্মুখে যখন ৺বদ্রীনারায়ণের স্বর্ণখচিত চূড়ার নীচে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির দূর হতে দর্শন হল তখন আমি ভাই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেম। বহুক্ষণ এক দৃষ্টে সেই দিকে সাশ্রুনয়নে তাকিয়ে

থেকে তারপর যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেম তখন আমার মনের বাসনা গানের ভাষাতে প্রকাশ পেতে চাইল। মুহূর্ত্তেই একতারাটি নিয়ে গানের সঙ্গে কান্না মিশিয়ে গাইতে সুরু করে দিলেম।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—কি গানটি গেয়েছিলে দাদা, সেটি এখন একবার গেয়ে শোনাও না?

বাউলঠাকুর বলিলেন,—আচ্ছা শোনাচ্ছি।

এই বলিয়া তিনি একতারাটি বাজাইয়া বাউলসুরে গাহিতে আরম্ভ করিলেন,—

পৌছতে যে হবে আমায় আমার রাজার রাজধানী,
ঐ দেখা যায় দুর্গতোরণ আর কি আমি কারেও মানি।
সারা জীবন আসছি হেঁটে রাস্তা ধরে গেঁয়ো মেঠে,
মন প্রাণ মোর তথায় রেখে অন্য কিছু নাহি জানি।
বহু পথ ঘুরে ঘুরে দেহ গেছে ভেঙ্গে চুরে গো,
উঠে পড়ে যে করে হ'ক নিয়ে যাব দেহ টানি।
দর্শনী যে কিছুই নাই এখন কেবল ভাবছি তাই,
একতারাটিই দিয়ে বলব ছোঁওয়াও তোমার পা দুখানি॥

গান আরম্ভ হইবার সূত্রপাতেই লক্ষ্মী আবার আসিয়া দাঁড়াইল ঠিক যেন এক ভাবময়ীমূর্ত্তির মত। বৈষ্ণবগৃহিণীও কপাটের আড়ালে আসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

গানটি শেষ হইয়া যাইতেই বৈষ্ণববাবাজী গদগদভাবে বলিলেন,—তুমি তোমার উপযুক্ত গানই সে সময় গেয়েছিলে ভাই। তোমার মুখে বর্ণনা শুনে মন আকুল হচ্ছে সেই অরূপের রূপ দর্শন করতে যাবার জন্যে। ভগবান কি সে মনস্কামনা এ জীবনে পূর্ণ করবেন?

বাউলঠাকুর বলিলেন,—তুমি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা তাঁর প্রেমে মগ্ন

আছ। তার কাছে আর কি আছে ভাই! আমি কেবল হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি মাত্র। তাইত আমি তাঁর চরণে স্থান পেলেম না। মন বলল, শুধু গানের ভাষায় পাওয়ার কথা জোর করে বললেই পাওয়া যায় না, তাঁর প্রেমে একেবারে ডুবে না গেলে সে রত্ন লাভ হবে না। ফিরে আসতে হল আবার সংসারের মাঝে; তাই তোমার মত প্রেমিকের কাছে ছুটে এলেম যদি সেই সাগরে ডুব দেবার অধিকার লাভ হয় এই আশায়।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—বেশ কথা তুমি বলছ! আমিই তোমার কাছে সেই সম্বল পাব বলে প্রত্যাশা করে থাকি, না তুমিই আবার আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছে আশা করছ!! একেই বলে পাওয়ার অন্ত নেই। সত্যই জগৎকে আমরা গুরুময় দেখি। একটু বিচার করে দেখলেই বুঝা যায় যে, সারা জীবন ধরে প্রত্যেক বস্তুর কাছেই শিক্ষা ও জ্ঞান পাবার জিনিষ আছে; একথাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই এবং এক জগৎগুরু ছাড়া নিজেদের কোনদিনই গুরু বলে মনে করা চলেনা। মহাত্মা ঈশ্বরপুরীর কাছে যখন শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা নেবার কামনা জানালেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি কা'কে দীক্ষা দেবো! যাঁর কাছে উপদেশ পাবার জন্যে আমিই ব্যাকুল হয়ে আছি তাঁকে আমি দেবো দীক্ষা!! দয়াময়ের একি লীলা!!!"

তাই বোধহয় বলে গেছেন ঋষিরা,—"শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব।"

আমাকে তুমি প্রেমিক বলছ! তাঁর প্রেম বুঝবার আমার মত ক্ষুদ্রব্যক্তির কি ক্ষমতা আছে ভাই! স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের একটি বাণী মনে পড়ে গেল। তাঁর এক ভক্ত যখন একসময় তাঁকে বলেছিল,—"আপনি প্রেমের অবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীরাধার প্রেম

বিলাবার জন্তে" তখন তিনি অতি কাতর ও ভাবেবিগলিত হয়ে বলেছিলেন,—"তুমি কি বলছ! তাঁকে যথার্থভাবে যাঁরা চিনেছিলেন, সেই গোপীজনকে যাঁরা ভজনা করেন আমি তাঁদেরও ভজনা করবার যোগ্য কিনা তাই জানিনা। সে প্রেমের মর্ম্ম কি বুঝব! আমি কেবল হা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অন্ধকারে কেঁদে বেড়াচ্ছি মাত্র।"

তাই বলি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য যখন একথা বলেছিলেন তখন আমাদের কি বল্ ভরসা আছে ভাই!

এই সমস্ত কথা যখন হইতেছিল তখন হইতে লক্ষ্মী সেইস্থানে ঠিক একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যেন ভক্তিরসের কথাগুলি পরম তৃপ্তির সহিত পান করিতেছিল মনে হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগৃহিণীও তদ্রূপ অবস্থায় অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

বাউলঠাকুর ভাবজড়িত কণ্ঠে বলিলেন,—এই সমস্ত জ্ঞানময় কথা শোনবার জন্তেই আমি তোমার কাছে ছুটে আসি ভাই। এমন সাধু সঙ্গ না হলে কি মানুষের কিছু লাভ হয়।

বৈষ্ণববাবাজী কহিলেন,—তুমি আবার এসব বাক্য বলে আমাকে লজ্জিত করছ! গোপীবল্লভ শ্রীরাধারমণকে আমরা কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনি, কেবল ভাবের জাবর কেটে যাচ্ছি মাত্র।

এই বলিয়া সজল নয়নে বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—মহাপণ্ডিত শ্রীনিবাসআচার্য্য একদিন শ্রীগৌরাঙ্গকে বলেছিলেন,—নিমাই! তুমি অদ্ভুত প্রতিভা নিয়ে অল্পদিনেই সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ হয়েছ এবং সেইজন্তে তোমার টোলে কত নিষ্ঠাবান ছাত্র এসে উপস্থিত হয়েছেন; অথচ শুনতে পেলাম তুমি নাকি তাঁদের পাঠদানে মনোযোগী হচ্ছ না, একি ভাল কথা?" একথা শুনে তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছলছল নেত্রে বলেছিলেন,—"আচার্য্যদেব! আমি ছাত্রদের পড়াব কি, প্রত্যেকটি অক্ষরের

মধ্যেও একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর আমি কিছুই দেখতে পাইনা, কাজেই কি করে আমি তাদের পাঠ দেবো বলুন?" মহাপ্রভুর একথা শুনে আচার্য্যদেব আকুল হয়ে কেঁদে বলেছিলেন,—"নিমাই! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে চিনতে পারি নাই।" এই কথা বলিয়া তিনি সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। জান ভাই! একেই বলে সত্যকারের কৃষ্ণকে ভাবা।

বৈষ্ণববাবাজীর উদাহরণের এই কথা শুনিয়া সকলের চক্ষে দরদর ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—এসব অমৃত কথার আলোচনার শেষ নেই এবং তৃপ্তিরও শেষ নেই। মা লক্ষ্মী! তোমার মাকে বল আমাদের মধ্যাহ্নের আহার দিতে।

বাউলঠাকুর বলিলেন,—আহার করব কি, কথামৃতে সমস্ত দেহ পূর্ণ হয়ে গেছে। খাদ্যগ্রহণের আর স্থান নেই।

বৈষ্ণববাবাজী বলিলেন,—ভাই! এর নিবৃত্তির শক্তি ত আমাদের কাছে বেশীক্ষণ টিকে থাকবে না, জঠরাগ্নি এখনিই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। কাজেই দেহ রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের চলতেই হবে। হাঁ আর একটা কথা,—লক্ষ্মী কেমন কীর্ত্তন গায় তা তোমাকে রাত্রে ঠাকুরের আরতির পর শোনাব। গিন্নি খাবার দিতে দিতে ততক্ষণ লক্ষ্মীর মুখে দুটো সহজ গ্রাম্যগীত শুনে নাও। আমি আগে গ্রাম্যগীত কখনও তেমনভাবে শুনিনি। লক্ষ্মীর মুখে শুনে অবধি আমার মনে হয় এর মধ্যেও বেশ দেশজসুরের স্বভাবগত মনভোলান ও বনজফুলের সৌরভের মত মধু-মিষ্ট ভাবের মাদকতা আছে এবং সেই সুরের মায়ায় মনকে ভাবে উদাসী করে দেয়। মা লক্ষ্মী! তুমি সেই রাধাকৃষ্ণের ভাবোত্তর বর্ণন গান দুটি গাও ত!

লক্ষ্মী বসিয়া পড়িয়া শুধুগলায় গাহিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্মীর এই একটা মহৎ গুণ যে, গাহিতে বলিলে কখনও নানা ছুতা দেখাইয়া ওজর আপত্তি করে না। প্রত্যেকের কথা রক্ষা করা সে পরম পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যাঁহারা সত্যকারের সঙ্গীত জানেন তাঁহাদের এইরূপ কর্ত্তব্যবোধ আসা খুবই স্বাভাবিক হয়।

লক্ষ্মী নিম্নোক্ত গান দুইটি গাহিল।

(১)

* কুড়্‌চি ফুলের মালা গো কুড়্‌চি ফুলের মালা
পরিয়ে দেব আসবে যখন আমার চিকণকালা গো।
সারাদিন গেঁথেছি মোর হাতে
নয়ন জলে ধুয়েছি গো সকল ফুলের পাতে
আমি চুয়া চন্দনে ভরে রেখেছি মোর থালা গো।
এলে পরে বসাব যতনে
পাহাড়ী-ঝরণারজল ঢালিব চরণে গো ঢালিব চরণে
আমি খোঁপা খুলে মুছিয়ে দেব পদতলের মলা গো।
রেখেছি পান বাটাভরে
তাঁর মুখে দেব আমার করে গো
বঁধুর দর্শনে হয় সফল জীবন যায় বিরহ জ্বালা গো॥

(২)

তোমার প্রেমে বাঁধা আমার এ জীবন গো
ওগো সখি প্রেমে বাঁধা আমার এ জীবন।

---

*কুড়্‌চি ফুলের ভাল নাম, কুরঙ্ক পুষ্প। ইহা পশ্চিমবঙ্গের বনভূমির এবং তৎপারিপার্শ্বিক প্রদেশের বনজপুষ্প। ইহা জন্মায়ও যেমন প্রচুর, সৌরভও তেমনি অতি চমৎকার।

তোমার হাতের মালা পরতে সদা ছুটে আমার মন গো।
পড়লে তোমার চোখের জল আমার হৃদয় হয় বিকল গো
তখন সুরহারা হয় বাঁশী, দেখি আঁধার ত্রিভুবন গো।
তুমি মোর সকল আশা, আমার হৃদে তোমার বাসা গো,
তোমায় প্রথম দেখা সেই দিনটি আমার শুভক্ষণ গো।
ভেবো না-ক নিঠুর তোমার প্রিয়
অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করে নিয়ো
তোমার প্রেমের ধার শুধতে নাহি ত্রিভুবনে ধন গো॥

গান দুইটি যতক্ষণ চলিল বৈষ্ণবগৃহিণীর রান্নাঘরে অন্ন সাজাইবার জন্য হাতের থালা হাতেই রহিয়া গেল। গানের সুর ও ভাব যাহাদের ভাল লাগে ও বুঝিবার সামর্থ্য লাভ হয় তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম ভুলাইয়া ত দিবেই, এমনকী যাহাদের ভাব গ্রহণের ক্ষমতা নাই তাহাদিগকেও সুরের মোহিনীমায়ায় আকৃষ্ট করিবে।

বাউলঠাকুর বলিলেন,—গ্রাম্যগীতের মধ্যেও সেই পরম প্রেমলীলার মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়ে আসছে। এই সকল গানের সুরও যেমন সহজ সুন্দর, ভাবও তেমনি সহজ সরল। সব রকম বিশুদ্ধভাবের গান ও সুরই আমাদের চিত্ত পুষ্টির জন্যে রস যোগায়।

এই কথার পরই লক্ষ্মী জানাইল আহার দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যেদিন সঙ্গীতসাধক প্রভৃতি সকলে পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী মহানগরীতে রওনা হইয়া যাইলেন সেইদিন শক্তিরাণী সন্ধ্যায় সঙ্গীতসাধকের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া সঙ্গীতসাধকের গুরুদেবের প্রকৃতিকে আরতি করিয়া তাহার পর তম্বুরা লইয়া সঙ্গীত সাধনা করিতে বসিল। প্রথমতঃ রাত্রি প্রথম প্রহরের একটি রাগের বহুক্ষণ আলাপের পর সেই রাগের কয়েকটি ধ্রুপদ ও খেয়াল গাহিয়া শেষে কাফিরাগের নিম্নলিখিত গান দুইটি গাহিল।

(১)

আরজ্ মেরে প্রভু হম্‌কো না ছোড়ো
তুঝ চরণ পর মেরা কর না তোড়ো।
তুঁহি ভব-সাগর-পার-করণ ধার
মেরা নৌ পুরানী হৈ তুম সাথ জোড়ো।
মৈ অতি দীন তুম্ হো দয়াল
সোহি ভরসামেঁ নহি ডর কাল।
কৈসে কর তুঝ ভজন না জান
করত নিশ দিন সদা নাম গুণ গান
মুঝ্‌কো সম্‌ঝো প্রভু! নাচার বড়ো॥

(২)

বসিয়া আছি একা প্রভু তব পথ চাহি
তুমি বিনা এ জগতে আপন কেহ নাহি।

আসিবে কবে হৃদয়নাথ হইবে মম শুভ প্রভাত
লইয়া যাবে তব পারে চরণ তরী বাহি'
একদিন হবে জানি সত্য মোর পাওয়া
বৃথা নাহি যাবে নিশিদিন পথে চাওয়া।
সেই আশে মন মোর, রহে তব প্রেমে বিভোর
বীনা হাতে সদা তাই তব গান গাহি॥

গান সমাধা করিয়া যথাস্থানে তম্বুরাটি রক্ষাপূর্ব্বক কুটিরে তালা লাগাইয়া যখন শক্তিরাণী গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন কৃষ্ণাপক্ষের রাত্রি প্রায় প্রহর কাল হইয়া গিয়াছে।

শক্তিরাণীকে তাহার পিতামাতা অধিক রাত্রি করিয়া আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। তাহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া তাহাদের তেজস্বী প্রভুভক্ত ও শক্তিরাণীর অতিপ্রিয় শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুরটিকে আশ্রমের দিকে পাঠাইয়া দিল।

শক্তিরাণী আপন মনে একটি গানের সুর আবৃত্তি করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে গৃহের দিকে রওনা হইবার সময় মধ্যপথে অকস্মাৎ তিন চারিজন লোকের দ্বারা আক্রান্ত হইল। সেই লোকগুলা হঠাৎ তাহার পিছন দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রজ্জু ও বস্ত্রের দ্বারা হস্ত পদ ও মুখ বন্ধন করিয়া স্কন্ধে তুলিয়া লইল। শক্তিরাণী কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, তাহাকে এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। সে প্রাণপনে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল উদ্ধার পাইবার জন্য। সেই লোকগুলা তাহাকে লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল; সেই মুহূর্ত্তে ঐ কুকুরটি শক্তিরাণীর বিপদ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ঝড়ের মত দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া একজন বাহকের একটা পা ভীষণ জোরে কামড়াইয়া ধরিল। সেই বাহকটা তখন যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া শক্তিরাণীকে

ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। কুকুরটি তখন আর একজনের উরুদেশ কামড়াইয়া ধরিল। সেই সময় অন্ত আর একটা লোক তাহাকে লাঠির দ্বারা মারিতে উদ্যত হইলে কুকুরটি ঝাঁপাইয়া তাহার গ্রীবাদেশ কামড়াইয়া ধরিল। সেই সময় আর একজন তাহার মস্তকে আঘাত করায় কুকুরটি পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। এই কাণ্ড যখন ঘটিতেছিল তখন বাহকেরা শক্তিরাণীকে ভূতলে নামাইয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরে যখন তাহারা নিরাপদ বুঝিল তখন শক্তিরাণীকে তুলিয়া লইবার জন্ত টর্চের আলো ফেলিবা মাত্র দেখিতে পাইল তিন চারিটি বিষধর সর্প তাহাদের পায়ের কাছে আসিয়া ছোবল মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা তখন ভয়ে প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। বহুদূর পর্য্যন্ত সর্পগুলি তাহাদিগকে তাড়া করিল। শক্তিরাণী অজ্ঞান হইয়া বন্ধন অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

ঈশ্বরের কৃপায় কুকুরটি মস্তকে খুব বেশী আঘাত পায় নাই। সে কিছুক্ষণ পরেই জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া দেখিল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। তখন সে নিজ দন্তের দ্বারা শক্তিরাণীর বন্ধন ছেদন করিয়া দিল। শক্তিরাণী কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান পাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিপদভঞ্জন মধুসূদনের উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল এবং ঈশ্বর প্রেরিত উদ্ধার কর্ত্তা প্রভুভক্ত প্রিয় কুকুরটির গলা জড়াইয়া বলিল,—"তোরা বহু মানুষের চেয়েও অনেক বড়। তোদের মত বিশ্বস্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও বিপদ থেকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করবার মত বোধহয় আর কেহ নাই" এই বলিয়া তাহার মস্তকের উপর কৃতজ্ঞতাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কুকুরটিও মনে মনে ভাবিল,—আমার পরম শ্রদ্ধার ও পালকপাত্রীটি মহাবিপদ হইতে যে রক্ষা পাইল ইহা অপেক্ষা আমার আর কি আনন্দ আছে। তাই সে তখন পরম সন্তোষের সহিত পুচ্ছ

দুলাইতে দুলাইতে আহ্লাদযুক্ত হইয়া শক্তিরাণীর পদতলে লুটাইয়া গড়াইতে লগিল। যেন সে এই বলিতে লাগিল,—আমার জীবনে এমন তৃপ্তি আর কোন দিনও হয় নাই। সে তাহার আঘাতের যন্ত্রনা যেন সবই ভুলিয়া গেল।

তখন শক্তিরাণী পরম আদরে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়া কুকুরটিকে কোলের উপর রক্ষা করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। কুকুরটি তাহার সেই সময়কার আঘাতজনিত দুর্ব্বলদেহটি ও মস্তকটি শক্তিরাণীর দেহের উপর এলাইয়া দিল। শক্তিরাণী তখন তাহার প্রিয় জীবটির একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস পড়া এবং তাহার পৃষ্ঠে এক ফোটা উষ্ণ অশ্রু অনুভব করিয়া কুকুরটির পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে গভীর ভালবাসা জানাইতে লাগিল। আচম্বিতে এত বড় যে একটা শীঘ্র মধ্যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহা গ্রামের কেহই বুঝিতে পারিল না।

কুকুরটি এমনই বুদ্ধিমান যে, সে বুঝিয়া ছিল, চীৎকার করিলে যদি সেই শব্দ অনুশরন করিয়া দস্যুরা তাহাকে মারিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে এই বিপদে সাহায্য করিবার কোন উপায় থাকিবে না। তাই সে তখন তাহার স্বভাবগত চীৎকার করে নাই। এই জন্যই সে অন্ধকারের মধ্য দিয়া দস্যুদের অলক্ষ্যে আক্রমণ করিয়াছিল।

শক্তিরাণী জানিতে পারিল না যে কুকুরটী ছাড়া সর্পগুলিও তাহার এই বিপদ রক্ষায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সুরের মোহিনীমায়ায় তাহারা বহুদিন হইতে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। তাই আশ্রমে গান হইলেই তাহারা স্থির থাকিতে পারে না। অলক্ষ্যে থাকিয়া নিবিষ্ট মনে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে থাকে। আজ যখন শক্তিরাণী গান বন্ধ করিয়া পথিমধ্যে ঐরূপ বিপদের সম্মুখীন হইল, তখন বোধহয় ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই তাহারা ছুটিয়া আসিয়াছিল এবং তাহাদের পরম আনন্দদায়িনীকে

রক্ষা করিয়া দিল। সঙ্গীতের যে কত বড় মাহাত্ম্য ও তাহার প্রভাবে সকল জীবের অন্তরে কিরূপ কর্ত্তব্যের প্রেরণা দান করে তাহা সর্পের মত ক্রুর জাতিরাও এইরূপ কর্য্যের দ্বারা অবুঝ মানুষকে বুঝাইয়া দিল।

* * * * *

সেই বহুদিন পূর্ব্বে দয়াল দাসের নিকট হইতে প্রায় উন্মাদের মত মাণিক মনে মনে কেবল লক্ষ্মীকে ধ্যান করিতে করিতে পদব্রজে হাটিয়া চলিল কোলিয়ারী অঞ্চলের উদ্দেশ্যে। নিকটবর্ত্তী সহরে উপস্থিত হইয়া সেখানের বাসে চড়িয়া কোলিয়ারীর স্থানে নামিয়া পড়িল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা যেন তাহার মনেই নাই। কয়েক দিন ধরিয়া সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিল, কিন্তু কোথাও কাহারও কাছে বিন্দুমাত্র লক্ষ্মীর সংবাদ পাইল না। তখন সে মনে মনে করিল "আমাদের কোলিয়ারীতে যাইলে যদি সেখানে দেখিতে পাই।" এই কথা মনে উদয় হওয়া মাত্র সে একটি বাসে চড়িয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহাদের কুলি-বস্তীতে যাইয়া শুনিল পচাই, পটল এবং আরও দুই একজন বহুদিন হইতে হাঁসপাতালে আছে। তাহারা নাকি রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিল, সেখানের কোন স্থানে জানোয়ারের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে বহু কষ্টে এইখানে পৌঁছিয়া স্থানীয় হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া মাণিক তাহাদিগকে দেখিতে হাঁসপাতাল অভিমুখে চলিল। সেখানে যাইয়া পচাই ও পটলের অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মাণিককে দেখিয়া পচাই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—তুই সত্যিই বুদ্ধিমান এবং আসল মানুষের মত তোর অন্তর ছিল তাই এত বড়

পাপের শাঁস্তি তোকে ভোগ করতে হল নাই। কি অবস্তা আমাদের হঁয়েঁচে একবার চাঁয়ে দ্যেখ্। আমার ঘাঁড়ে কামড়ের ঘা বিষাঁয়ে গেছে। যদি বাঁচ্যে উঠি তবে মুখির জন্তই হয়ত তা ঘটবেক। সে যেরকম আমার জন্তে ভগবানকে দিনরাত ডাকছে এবং আমার সেবা কচ্ছে তাতেই মনে হয় হয়ত ভগবান তার জন্তই আমাকে বাঁচায়ে দিতে পারেন। তারপর ঐ দ্যেখ্ পটল্টার ও আর একজনের একটা করে পা ডাক্তারে কাট্যে দিয়েঁচন। তাদের ঐ পা ছুটা ভীষণ ভাবে বিষাঁয়ে গেছ্লন।

মাণিক অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া বলিল,—ভাই! কি রকম ভাবে এই সমস্ত কাণ্ড ঘটল বল্‌ত?

পচাই বলিল,—আমাদের সেই দুর্ব্বুদ্ধির চক্রান্ত মত একদিন আমি ও পটল আটদশজন লোককে সাঁথে করেঁ একটা ডুলী লিয়ে আদরীকে হরণ কঁরে লিয়ে আসতে গেছলম। পূর্ব্বে লোক পাঠায়েঁ জান্যে লিয়েছিলম যে, হটাৎ সেই সাধুটাও মঠের সন্ন্যাসী কোথায় যেন চলে গেছে; তাই আমরা সেই সুযোগ লিতে গেছলম।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সমস্ত মাণিককে বলিল।

মাণিক শুনিয়া মনে মনে বলিল,—"রাখেন কৃষ্ণ মারে কে,—মারেন কৃষ্ণ রাখে কে।" পরে বলিল,—ভাই পচাই! যা হবার হয়ে গেছে। এখন ভগবানকে ডাক, তিনি সব দুঃখ্যু ঘুচিয়ে দিবেন। তাছাড়া তুই মুখিদির তপস্যার জোরে সেরে উঠ্‌বিই।

পচাই ও পটল বলিল,—ভাই! যদি ভাল হয়েঁ উঠি তাঅলে এখন থাক্যে লৈতন জীবনে লৈতন পথে চলব। অধর্ম্ম ও অন্যায় কাজ কখন করব নাই। এখন তোর খবর কি বল্‌ত? এতদিন কোঁথায় ছিলি, কি কচ্ছিলি? তোর শরীরটাই বা এত কাহিল কেনে?

মাণিক তখন তাহার সেইদিন চলিয়া যাওয়ার পর হইতে যাহা যাহা হইয়াছে তাহা সমস্তই বলিল। লক্ষ্মীর কথা যখন বলিতেছিল তখন তাহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

পচাই ও পটল সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল,—এই মেঁয়াটিকে সত্যিই দেবীদের মত মনে হঁচ্ছে যে রে! তুই মহাভাগ্যবান এবং নিশ্চয়ই ভগবানের খুব কিপা পাঁয়ে জম্মেচুস্, না অলে কি ঐ রকম সতী সাবিত্তীর মত মেঁয়ার স্ব্য়ামী হবার যোগ্যি হঁতিস্। ভগবানের কি অবাক সিষ্টি দ্যেখ্, আমাদের মত ছোট জাতের ঘরেও এমন মেয়ঁার জন্ম দিলেন।

অল্পদূর হইতে ইহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা একজন ডাক্তার শুনিতে-ছিলেন। তিনি কাছে আসিয়া বলিলেন,—তোমরা এর জন্যে আশ্চর্য্য হোচ্ছ কিন্তু আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হচ্ছি না। কারণ ভগবান নিজেই গোয়ালা ঘরে মানুষরূপে লীলা করেছিলেন। তোমাদের মত ঘরেই যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরকম বহু উদাহরণ আছে। বর্ত্তমান যুগে এই সেদিন যে লোকটি সারা দুনিয়াকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, সেই জার্ম্মানীর হিট্‌লার্ জন্মেছিলেন এক ভিস্তিওয়ালার ঘরে বলে শোনা যায়। ভগবান কোন্ স্থানে কার মধ্যে দিয়ে যে, তিনি নিজ মহিমা ও শক্তি প্রচার করেন তা পূর্ব্বে হতে বুঝবার উপায় নেই; যতক্ষণ না আমরা দেখতে ও শুনতে পাই।

এই বলিয়া ডাক্তার নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

মাণিক পটলের কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—দেখ্ দেখি তোর কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। চিরজীবনের মত অকেজো হয়ে গেলি। কেন এমন কাজ করতে গেলি ভাই!

পটল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—মানুষের মতিচ্ছন্ন হলে এই রকমই

তার দুগ্‌গতি হয়। বদ্‌লোকের সংঘে মিঁশে এই ফল পেলাই। আমি এবং ঐ লোকটা দুজনে মিসে পচাইএর বুনের উপর ঝাঁপায়েঁ পড়ে তার হাত মুখ বাঁধ্যে দিয়ে তুলে লিয়ে চলেছিলম বলে তাই ভগবান আমাদের উপরই বেঁশী করে শাঁস্তি দিলেন। সত্যিই এখন মনে হঁচ্ছে মানুষের কোন অন্যায় করা ভগবান সঁইতে লারেন। যারা খুঁব ভাল্‌ এবং ঈশ্বরের উপর সর্ব্বদা ভক্তি রাখ্যেঁ চলে তাদের কেউই খতি কত্তে পারেক নাই। ভগবান তাদের সর্ব্বদা রক্ষা করেন। পা একটা গেল বটে পাপ কত্তে যাওয়ার দরুণ, কিন্তু ভাই তাঁকে ত চিন্‌তে পাল্লাই। কাজেই শাঁস্তি পায়েঁ সত্যিকিরার লাঁভ হঁইচে; বল্‌ ঠিক কি না।

মাণিক বলিল,—এইটুকু যে বুঝ্‌তে পেরেছিস্‌ তাতেই তোর সব কষ্ট ঘুচে যাবে।

তাহার পর মাণিক বলিল,—ভাই, আমি চল্‌লাম। আমার মন ভয়ানক ভাবনার মধ্যে আছে। বহু জায়গায় খুঁজলাম কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন সন্ধানই করে উঠতে পাল্লাম না। জানিনা অদৃষ্টে কি আছে। তবে যতদিন না তার সন্ধান পাচ্ছি ততদিন পর্য্যন্ত আমি দিবারাত্রি খুঁজে বেড়াব। আমার কিছুক্ষণের জন্যও বিশ্রাম থাকবে না।

পটল ও পচাই বলিল,—যাওঁ ভাই। ভগবান যেন তার সংঘে তোমার মিলন ঘটায়েঁ দেন। তবে ভাই সে দেবীকে পাওয়া তোমার জীবনে শক্ত হবেক। তিনি সাধারণ মানুষ হলে হয়ত এতদিন পাঁয়ে যেতিস্‌।

মাণিক বলিল,—দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানকে ডেকে ডেকে আমরণ চেষ্টা করে যাব। এক এক সময় রাত্রে স্বপ্নে শুনি, মা বলছেন,—"ওরে বাছা তুই সেই দেবীর দর্শন পাবি, ভগবানকে ডেকে যা"-

এই কথা বলিয়াই মাণিক অশ্রুসিক্ত নয়নে উদ্‌ভ্রান্তের মত সেইস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব ব্যবস্থামত যথাদিনে সন্ন্যাসীমহারাজ, সঙ্গীতসাধক, জমীদার-মহাশয় ও সাবিত্রীদেবী প্রাতঃকালে মহানগরীর ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িলেন।

জমীদারমহাশয় সঙ্গীতসাধককে বলিলেন,—আপনি ও মহারাজজী গুরুদেবের ওখানে আগমন করুন, আমি ও সাবিত্রী এখন আমাদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে গিয়ে তারপর শীগ্‌গীর্ মধ্যেই গুরুদেবের ওখানে পৌছচ্চি।

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—গুরুদেব আপনাদের তাঁর ওখানে মধ্যাহ্ণ-আহারের জন্তে বিশেষ করে পত্রে লিখে জানিয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের ওই বাসনা পূর্ণ না হলে বড়ই দুঃখিত হবেন।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—তাঁর বাড়ীতে আহার করার সৌভাগ্য কি আমরা ছাড়তে পারি? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা ৯টার মধ্যেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আমিও এখানের দুএকজন বন্ধুর কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিয়েই ঐ সময়ের মধ্যে গিয়ে পড়ব।

তখন সকলে সেই সিদ্ধান্ত মত যে যাঁহার গন্তব্য পথে রওনা হইলেন।

এদিকে সঙ্গীতসাধকের গুরুদেব ও গুরুমা অন্যদিন অপেক্ষা আরও প্রত্যুষে উঠিয়া সর্ব্বদা উন্মুখ চিত্তে নিজ নিজ কার্য্যাদি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আজ মনে হইতে লাগিল প্রত্যেক মুহূর্ত্তই যেন কত বড়। সঙ্গীতসাধক-ভারতীকুমারকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের মন অস্থির হইতে লাগিল। গুরুগৃহিনী সদর দরজায় কান রাখিয়া গৃহের সমস্ত কর্ম্ম সারিয়া বৈঠকখানাটি ভাল করিয়া পরিষ্কার পরিছন্ন করিয়া সত্‌রঞ্চাদি বিছাইয়া রাখিলেন। এই সমস্ত কাজ যখন সারা হইয়া গেল তখন সবে মাত্র অরুণ কিরণে তপনদেব ধরনীর বুকে সুপ্রকাশ হইয়াছেন। গুরুগৃহিনী তাহার পর স্নানাদি সারিয়া আজ একটু সংক্ষেপে পূজাপাঠ সমাধা করিয়া যখন রন্ধনাদির উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন তখন দরজায় স্বল্পাঘাত ও মা বলিয়া ডাকার ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ গুরুদেব ও তিনি দৌড়িয়া আসিয়া দরজা খুলিবা মাত্র তাঁহাদের পরম প্রিয় ভারতীকুমারকে দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে গুরুদেব ক্রোড়ে জড়াইয়া ধরিলেন। গুরুপত্নী তাঁহার পুত্রাধিক ভারতীকুমারের মস্তকে ও গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সঙ্গীতসাধকের মনে হইল সাংসারিক জীবনে প্রকৃত স্নেহাদরের মত এমন আর শ্রেষ্ঠ জিনিষ কিছু নাই। তিনি গুরুদেবের স্নেহের বেষ্টন হইতে ধীরে ধীরে নিজকে মুক্ত করিয়া গুরুদেব ও গুরুমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। গুরুদেব ও গুরুমা আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে দুইজনে তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন।

গুরুদেব শক্তিরাণীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বলিলেন,—বাবা ভারতীকুমার! আর যাঁদের আসবার কথা ছিল তাঁরা কেন এলেন না?

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে এসেছেন এবং একটু পরেই সকলে উপস্থিত হবেন।

গুরুদেব বলিলেন,—বাবা! তুমি এখন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করে কিছু খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম কর। সমস্ত রাত্রি ট্রেনে বোধ হয় ঘুম হয় নি। আমাদেরও কাল রাত্রে ঘুম ধরতেই চায় নি; কেবল মনে হয়েছে কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হবে। আমরা যে কি সহ্য করে এতকাল ছিলেম, তা তোমাকে কি বলব বাবা।

সঙ্গীতসাধক ছল ছল নেত্রে বলিলেন,—ছেলেকে ছেড়ে মা বাপের থাকা যে কিরূপ কষ্টকর হয় তা আপনাদের দেখেই বুঝতে পারি। ভগবানের কৃপায় আপনার আশীর্ব্বাদ সার্থক হতে চলেছে; এরপর থেকে বোধ হয় তিনি আমাকে আপনাদের কাছ ছাড়া করবেন না।

এই সময় একজন লোক হিন্দী ধাঁচায় বাবু বাবু বলিয়া ডাক দিল। গুরুদেব বাহির হইয়া দেখিলেন আবৃদালীর মত পোষাক পরা একজন হিন্দুস্থানী দাঁড়াইয়া আছে। সেই লোকটি এই বাড়ীর ঠিকানা ও মালিকের নাম জানিয়া লইয়া বলিল,—আপনি দয়া করে দরজাটা খুলে রাখুন, আমার প্রভুর পাঠান জিনিষপত্র ট্যাক্সিতে আছে, এক্ষুণি চাকরেরা নিয়ে আসবে। এই বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল। পরক্ষণেই চারিজন বাহকে একবস্তা চাউল, আটা, ঘি, তৈল, প্রচুর তরিতরকারী, দধি, ও মিষ্টান্নাদি আনিয়া উপস্থিত করিল। আবৃদালী তখন একটি বস্ত্রাদি ভর্ত্তি বৃহৎ কাগজের বাক্স গুরুদেবের পায়ের কাছে নামাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—রাইগঞ্জ সহরের জমীদারবাবু আজ সকালে পৌছেই নিজে এই সমস্ত জিনিষ কিনে দিয়ে আমাদের এখানে শীগ্‌গীর্ পৌছে

দিয়ে আসতে বললেন, এবং তিনি বল্‌তে বললেন, শীগ্‌গীরই এখানে তাঁরা এসে পড়বেন। এই কথা বলিয়াই আরদালী বাহকদের লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

গুরুদেব ও তাঁহার পত্নী এতগুলি জিনিষ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। গুরুদেব বলিলেন,—আর অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে! জিনিষগুলো ঘরে তুলে ফেল, আমি চালের বস্তাটা ঘরে তুলে রাখছি। জমীদারমহাশয়কে এখানে গরীবের বাড়ীতে শাক অন্ন গ্রহণের কথা লিখেছিলেম তাই তিনি বোধহয় আমার যৎসামান্যও খরচ করিয়ে দিতে ইচ্ছুক না হয়েই এবং আমার অবস্থা বুঝেই এতগুলো জিনিষ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সময় যে এখন ভালর দিকে আসছে, তার শুভ লক্ষণ সব দিকেই দেখা যাচ্ছে। তবে বড় দেরিতে এল গিন্নি; সত্যকারের সব কিছু জিনিষ দেখে যাবার মত সময়ে আর কুলোবে না।

গুরুপত্নী জিনিষগুলি তুলিতে তুলিতে বলিলেন,—তোমার মত ব্যক্তির শতায়ু যে হবে সে আমি জোর করে বলতে পারি। তবে তখন তোমার সেবা যত্ন যে কে করবে সেই ভাবনাই ভীষণ ভাবে হয়।

গুরুদেব বলিলেন,—তবে আর তুমি দয়া করে আমার শতায়ুর কামনা কর না। আমাকে যদি একশ বছর বাঁচতে হয় তাহলে আমার চেয়ে অন্ততঃ একমিনিটও বেশী তোমাকে বাঁচতে হবে তা বলে দিচ্ছি কিন্তু। যাক্‌গে এখন এসব কথা! কারণ আগে-পিছু নিয়ে আমাদের এই ঝগড়ার শেষ হবে না। এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। গুরুপত্নীও ঐ কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সঙ্গীতসাধক স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজাপাঠ সারিয়া লইলেন। পরে কিছু ফুল লইয়া গুরুদেবের ও গুরুমার চরণে

প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন। ইহা তিনি নিয়মিত ভাবে পূর্ব্বেও করিতেন। প্রত্যহ একটা মালী গুরুদেবের বাড়ীতে অতি প্রত্যূষে ফুল দিয়া যায়।

সঙ্গীতসাধককে গুরুপত্নী বলিলেন,—বাবা তুই এবার আমার কাছটিতে ঐ আসনটা পেতে বোস্, আমি তোর জলখাবার নিয়ে আসি।

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—মা! গুরুদেবের জলযোগ হয়েছে? তিনি বলিলেন,—হাঁ বাবা, তিনি সকালে পূজাপাঠ সেরে ছোলা ও গুড় খেয়ে নিয়েছেন। সঙ্গীতসাধক খাইতে খাইতে আশ্রমের গল্প করিতে লাগিলেন, সেই সময় সদরে উপস্থিত হইলেন সন্ন্যাসীমহারাজ, জমীদার-মহাশয় ও সাবিত্রীদেবী। গুরুদেব তাঁহাদের আগমনের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন; অতি সমাদরে অভ্যর্থনা জানাইয়া সকলকে বসাইলেন। সাবিত্রীদেবী তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইলেন; তাহার পর গুরুদেবের চরণতলে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামি স্বরূপ একখানি একশত টাকার নোট প্রদান করিলেন। গুরুদেব সাবিত্রীদেবীর মস্তকে দুই হস্ত রক্ষা করিয়া গভীরভাবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে বলিলেন,—এ কি ব্যাপার জমীদারবাবু! ভাঁড়ার ভর্ত্তি জিনিষপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার উপর আবার এতগুলি টাকা! এ আমাকে বড় বেশী করা হচ্ছে মনে করে আমি অত্যন্ত লজ্জা অনুভব কচ্ছি। জীবনে যা পাইনি তা শেষ জীবনে হঠাৎ এত পেলে হয়ত সহ্য করতে পারব না। জানেন ত, অতি দুঃখ ও অতি আনন্দের কোনটাই হঠাৎ মানুষের পক্ষে সহ্য করা মুস্কিল।

জমীদারমহাশয় গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—এ আপনি কি কথা বল্‌ছেন! যিনি সঙ্গীতসাধকের মত মানুষ তৈরি করতে পারেন তিনি যে কত উচ্চস্তরের ব্যক্তি তা কি আমরা এখন আর না বুঝ্‌তে

পেরেছি? এখন বরং লজ্জিত হই যে, এ রকম ব্যক্তিকে এতদিন আমরা চিনতে পারিনি। ভিতরের দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই, বাইরের দিকেই কেবল তাকিয়ে থাকি, তাই আমাদের এইরূপ বিচার বুদ্ধির অভাব ঘটে। আপনি যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, তার দাম দেবার মত কোন ধন নেই; কেবল যিনি গুরুর সেই সাধনার সিদ্ধ বস্তুকে রক্ষা করতে পারেন শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তিনিই যথার্থভাবে কিছু মূল্য দিতে পারেন বলে মনে করি।

গুরুদেব বলিলেন,—সত্যই এর চেয়ে আর কোন কিছু কামনা থাকতে পারে না। ভগবানের কৃপায় সে দিক দিয়ে আমি ভারতী-কুমারকে পেয়ে মহাধনী হয়ে আছি।

সন্ন্যাসীমহারাজ গুরুদেবকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়া তাঁহার পায়ের কাছ হইতে নোট্‌টি তুলিয়া লইয়া সঙ্গীতসাধককে দিবার জন্য রাখিয়া দিলেন, নির্লোভ ও সরল প্রকৃতির গুরুদেব উহা তুলিতে লজ্জা পাইতেছেন দেখিয়া। আগন্তুকেরা আজ সঙ্গীতসাধকের প্রকৃত নাম জানিতে পারিলেন। গুরুমাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য সাবিত্রীদেবী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গুরুপত্নী তাঁহাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, সাবিত্রীদেবী কাছে আসিতেই কোলের নিকট টানিয়া লইয়া অতি স্নেহাদর করিতে লাগিলেন এবং দুই তিনবার মুখের চুম্বন গ্রহণ করিলেন। মায়ের মত বস্তু যে কি তাহার স্বাদ গুরুমায়ের কাছে আজ পাইয়া সাবিত্রীদেবীর অন্তর তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল এবং চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি গুরুমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও পায়ের ধূলা মাথায় রাখিয়া পরে তাঁহার চরণে প্রণামিস্বরূপ একটি মোহর প্রদান করিলেন।

গুরুপত্নী বলিলেন,—তুমি আমার মেয়ের মত হয়ে এসব কি দিচ্ছ?

আমার এ সকলে কি হবে মা!

সাবিত্রীদেবী করজোড়ে বলিলেন,—মা! মেয়েদের কি মাকে কিছু দিতে নেই?

গুরুপত্নী এতবড় কথার পর আর কিছু জবাব দিতে পারলেন না। সাবিত্রীদেবী তখন মোহরটি তুলিয়া লইয়া গুরুমার অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীমহারাজ প্রভৃতি আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সঙ্গীতসাধক বৈঠকখানা গৃহে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণের জন্য সঙ্গীত-সাধকের সামনে সাবিত্রীদেবীর উপস্থিতির মধ্যে উভয়ের সঙ্কোচ, জড়তা ও ভীষণ সংযত ভাব এবং তাহার সঙ্গে যেন আর একটা কিছু, সেই কিছুটার সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ করিয়া গুরুদেব পত্নী মনে মনে ভাবিলেন "এ তো ঠিক সহজ মনের অবস্থা নয়! তবে কি যাহাকে পূর্ব্বরাগ ও অনুরাগ বলে তাহাই!" যাহাই হউক তিনি কল্পনায় একটি আনন্দের ছবি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন।

এই সময় সাবিত্রীদেবীর চাকর একটি ছোট চর্ম্মপেটিকা নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। সাবিত্রীদেবী সেইটি হাতে লইয়া গুরুগৃহিণীকে বলিলেন,—মা আমি কাপড় ছেড়ে এক্ষুণি আসছি।

এই বলিয়া তিনি গৃহ মধ্যে যাইয়া একখানি অতি সাধারণ রেশমির সাড়ী ও জামা পরিয়া গুরুপত্নীর কাছে আসিয়া বলিলেন,—মা, আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমাকে বড়লোকের মেয়ে মনে করে একেবারে অকেজো ভাববেন না। অবশ্য আমি আগে সেই রকমই ছিলেম। এখন মানুষের মত খানিকটা হবার জন্যে ব্রত নিয়েছি। বাবার জন্যে প্রত্যহ কিছু কিছু রান্না করি এবং সময় মত সংসারের কাজ কর্ম্মও করি।

গুরুগৃহিণী সাবিত্রীদেবীর কথা শুনিয়া কোলের কাছে তাঁহার মাথাটি টানিয়া লইয়া মধুর স্বরে বলিলেন,—মা! আমি তোমাকে দেখেই বুঝে

নিয়েছি যে, তুমি সব গুণের অধিকারিণী। তাছাড়া সন্ন্যাসীমহারাজ ওঁকে পত্রের মধ্যে তোমার কথা সবিস্তারে লিখেও জানিয়েছিলেন। সত্যই আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে আজ তোমাকে কাছে পেয়ে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখি, কিন্তু কি করব তা ত সম্ভব নয় মা! কারণ বৈঠকখানায় আজ বহু বিষয়ের আলোচনা হবে, তোমার উপস্থিত থাকা সেখানে বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ সঙ্গীত বিষয়ের যে সমস্ত আলোচনা হবে তা তোমার শোনা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। তুমি আমাকে সাহায্য করবার কথা বলছ, কিন্তু আমি যে মা এসব কাজ করতে কোন কষ্টই মনে করি না। মানুষ জনকে রেঁধে খাওয়াতে পারলে আমি বড় আনন্দ পাই। তবে সে রকম আর এখন ভাগ্য নেই বলে বড় কষ্ট হয়। আগে গান বাজনা শেখবার জন্যে পাঁচ ছ'টি করে ছেলে বাড়ীতে থাকতই। আমাকে তারা মা বলে ডাকত; আমি তাদের আদর, যত্ন করে ও খাইয়ে দাইয়ে কত আনন্দ পেতেম; কিন্তু যুদ্ধ এসে সব সামর্থ্যকে আমাদের নষ্ট করে দিল। জিনিষ পত্রের ভীষণ দুর্ম্মূল্যের দরুণ ওঁর ঐ সামান্য আয়ে আর সে কর্ত্তব্য পালন এবং ঘরভরা আনন্দ রইল না। তারপর ভারতীকুমারও বহুকাল কাছ ছাড়া হয়ে আছে, মা বলে ডাকবার আর কেউ নেই। শেষ কথাগুলি বলিবামাত্র গুরুগৃহিণীর চক্ষে জল আসিয়া গেল। সাবিত্রীদেবী সজল নয়নে গুরুমায়ের পদদ্বয়ে দুই হস্ত জড়াইয়া বলিলেন,—মা! আমাকে সে অধিকার দিন, আমি সর্ব্বদা আপনাকে মা বলে ডেকে ধন্য হব।

গুরুদেবপত্নী পরম তৃপ্তির হাস্য হাসিয়া বলিলেন,—আমারও সেটা পরম ভাগ্য হবে মা। তুমি সাহায্যের ও সংসারের কথা যে বলছিলে, সে সম্বন্ধে একটা কথা বলি; দেখ মা! আমি মনে করি, আমাদের গৃহ কর্ম্মের চেয়ে বড় আর কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নেই। পুরুষ জাতিদের কর্ম্ম প্রচেষ্টায়

উৎসাহ ও উদ্দীপনার যোগান দিতে এবং তাঁদের সর্ব্ববিধ ভাবে রক্ষা কল্লে আমাদের সংসার ধর্ম্মের মধ্যে থেকে নারী ধর্ম্মপালন করবার জন্যেই ভগবান পাঠিয়েছেন। এর অন্যথা আচরণে উভয় পক্ষেরই ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান লঙ্ঘন হেতু নিশ্চয়ই অপরাধ হবে বলে মনে করি। শুধু তাই নয়, এর ব্যতিক্রম নিয়মে চলতে গেলে ক্রমশঃ সমগ্র জাতিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে। যাই হ'ক তুমি এখন এক কাজ কর মা, আমি ও ঘরে জলখাবারের জোগাড় করে রেখেছি আসন পেতে সেগুলি দিতে থাকি, তুমি ওঁদের সকলকে ডেকে দাও।

সাবিত্রীদেবী বৈঠকখানায় আসিয়া জলযোগের কথা জানাইলে পর গুরুদেব বলিলেন,—মা! জলখাবারগুলো এখানে আনা চল্‌ত না? আমাদের এখন কথাবার্ত্তা বেশ জমে উঠেছিল।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—আমি সে কথা বলেছিলেম, কিন্তু মা রাজী হলেন না। তিনি বললেন, "পরের মত ভেবে বৈঠকখানাতে কি করে জলখাবার পাঠাতে পারি। সবাই আমার ঘরের মানুষ; তাঁরা আমার ঘরের ভিতর এসে বিদুরের গৃহের মত যা কিছু সামান্য ক্ষুদ কুঁড়ো আছে তাই গ্রহণ করবেন।"

সাবিত্রীদেবীর মুখে এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসীজীর ও জমীদার-মহাশয়ের গুরুপত্নীর উপর শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে সকলে জলযোগ সারিয়া বৈঠকখানা গৃহে আসিয়া বসিলেন।

আশ্রম সম্বন্ধে ও সঙ্গীতের পাঠ্যতালিকা প্রস্তুতির এবং অন্যান্য বিষয়ের নিয়ম প্রণালী প্রণয়নের জন্য গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাসীমহারাজ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, এবং তাঁহারা বাকী অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা যাহা করিয়াছেন ও করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহা সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন।

গুরুদেব বলিলেন,—আপনার লিখিত বিস্তারিত পত্রে মোটামুটি সমস্তই দেওয়া ছিল, এখন আর একবার ভাল করে বুঝে নিতে পারলেম। কি বলব! যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা সেই ভগবান এত শীগ্‌গীর্‌ জমীদার-মহাশয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন, তা ভাবতেই পারিনি। সর্ব্বমঙ্গলময় সেই ৺শ্রীশ্রীভগবানের চরণে কোটী কোটী প্রণাম জানাই। আপনাদের পরিকল্পিত নিয়ম প্রণালী অতি উত্তম হয়েছে। অন্যান্য যে যে বিষয় স্থিরীকৃত করতে বাকী আছে তা সম্পাদনের জন্যে আপনি, জমীদারমহাশয় এবং ভারতীকুমার আছেন; সকলে মিলে যা করবেন তার চেয়ে আমার দ্বারা আর কি বেশী ভাল হবে? তবে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাস্যের যদি প্রয়োজন থাকে তা আমি আমার অভিজ্ঞতা মত মন্তব্য প্রকাশ নিশ্চয়ই করব।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আশ্রমের নিয়ম পালন ও নিয়মিত শিক্ষার জন্য রাগ-তালাদি নির্দ্দিষ্ট করবার একমাত্র অধিকার আপনার ও সঙ্গীতসাধকের আছে।

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—শিক্ষার পাঠ্যতালিকা প্রনয়ন করবার জন্যে যে অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন হয় তা একমাত্র গুরুদেবেরই আছে।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—সত্যই, আর এর জন্যেই ত আমাদের বিশেষ করে গুরুদেবের কাছে আসা। উনি এক একটি করে প্রত্যেক বিষয়ের নিয়ম বলে যান, আর সন্ন্যাসীমহারাজ তা লিখে নিতে থাকুন।

তখন গুরুদেব আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের নিয়ম পালনের বিষয় তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্ব বর্ণিত নারীদের শিক্ষার নিয়মানু-যায়ীর মতই প্রায় অভিমত জ্ঞাপন করিলেন। অর্থাৎ মুনি, ঋষিদের আশ্রমের মত ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা শিক্ষার নিয়ম জ্ঞাপন করিলেন।

তাঁহার বর্ণিত নিয়ম ব্যবস্থা শুনিয়া সকলেই উহাকে হৃষ্টচিত্তে যথার্থ গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মানিয়া লইলেন।

তাহার পর রাগাদি নির্ব্বাচনের প্রসঙ্গে গুরুদেব বলিলেন,—আমাদের দেশে যে সমস্ত নানা প্রকারের ভাবপ্রবন ও ধর্ম্মসঙ্গীত বহুকাল হতে চলে আসছে এবং সেই সব সঙ্গীতের ভাববস্তুর মধ্যে যে সব রাগের রূপ রক্ষিত আছে সেগুলিকে বিচার বিবেচনা মত ক্রমিক ভাবে শিক্ষার্থী-দের জন্য গৃহীত হওয়া সর্ব্বাগ্রে দরকার। যেমন দেখতে পাই, কোন ভাবসঙ্গীতের মধ্যে সাধক কবি গ্রহণ করেছেন তাঁর ভাবের উদ্দেশ্যকে প্রকৃতির রূপের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্বন্ধ রেখে প্রধান স্বরযুক্ত প্রাতঃ-কালের "বিভাস" রাগকে। কোন কোন কবি আলাইয়া, খাম্বাজ, ঝিঁঝিঁট, ভৈরবী, কালেংড়া, ইমন-কল্যাণ, পিলু, সিন্ধু, ইত্যাদি রাগ-গুলিকে। ওই প্রকারের রাগগুলি প্রথমতঃ শিক্ষা দিয়ে সমস্ত ভাব প্রধান সঙ্গীতের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করে দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করি। কারণ এর দ্বারা তাদের মনে ও অন্তরে ভাব ও সুরের মিলন সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়ে সঙ্গীতের প্রাণধর্ম্ম পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হতে পারবে। তাছাড়া ঐ রাগগুলি প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজ ও নিয়ম সঙ্গত রূপে সুন্দর ভাবে গ্রহণযোগ্যও বটে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে স্বভাবগত ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়ে যে সকল রাগের সুর সেই দেশের মানুষের কর্ণে ঝঙ্কৃত হয়ে হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে দিয়ে আনন্দিত করেছে ও করে আসছে তার প্রভাবশক্তিকে অস্বীকার করা যেতে পারে না এবং তা উচিতও নয়। আজকাল আমরা এ চিন্তাকে হারিয়ে দৃষ্টিশক্তির অভাব ঘটিয়েছি। গুরুদেবের যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া সকলে উহা গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আমিও একদিন এই কথা সাবিত্রীকে

বলেছিলেম যে, স্বদেশীয় গুণী-সঙ্গীতজ্ঞদেরই একমাত্র অধিকার থাকা দরকার স্ব স্ব দেশের শিক্ষার পাঠ্যতালিকা রচনা করবার।

ইহার পর শিক্ষার বিষয় সম্বন্ধে গুরুদেব একে একে যাহা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তাহা সন্ন্যাসীমহারাজ লিখিয়া লইতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—স্বরলিপির সাঙ্কেতিক চিহ্ন পদ্ধতির কোনটিকে আপনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলে মনে করেন? কারণ এখন কয়েকটি পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে পড়েছে।

গুরুদেব উত্তরে বলিলেন,—যে কয়টি পদ্ধতি চলছে তা আমি জানি। যথার্থভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, কোন্ পদ্ধতির চিহ্নের দ্বারা দৃষ্টিমাত্রেরই স্বর, মাত্রা, ত্রিগপ্তকের চিহ্ন, কড়ি, কোমল এবং কথা বুঝে নিয়ে কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারা যায়ঃ এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয় না। তাছাড়া এও দেখতে হবে যে, মাত্রার সূক্ষ্ম ভাগগুলির অঙ্কন চিত্র ও তালের ঠেকা, বোল এবং গানের কথার উপর মাত্রা দিতে কোন্ পদ্ধতিকে অনুসরণ করলে যথাযথভাবে উহা সম্পাদিত হবে।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—ঠিক আছে; আমি বুঝে নিয়েছি, কোন পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করা উচিত।

সাবিত্রীদেবী বিনীতভাবে সন্ন্যাসীজীকে বলিলেন,—আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা আপনি কোন্ পদ্ধতিকে ধরে নিয়েছেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—মা, আমি যথার্থভাবে বিচার ও যুক্তি দিয়ে যেটুকু বুঝেছি, তাতে করে আমি মনে করি যে, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের সঙ্গীত ঋষিদের প্রবর্ত্তিত দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিই উপযুক্তভাবে গ্রহণযোগ্য। তখনকার যুগের রোম ও গ্রীস্ দেশের মনীষীরাও বলে গেছেন ভারতবর্ষেই প্রথম স্বরলিপির সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঐ দণ্ডমাত্রিক পদ্ধতিকে তাঁরা যথার্থ কার্য্যকরী বলেও স্বীকার

করে গেছেন। এ সমস্ত কথা তাঁদের দেশের গ্রন্থ হতে পাওয়া যায়। যাই হ'ক ঐ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতিটির সম্বন্ধে আর একটা কথা বল্‌বার আছে যে, ওতে কেবলমাত্র যদি সাতটি সুরের জন্যে চিহ্ন অঙ্কিত করে দেওয়া যায়, যেমন;—'সা'এর চিহ্ন ┌ রে এর ╒ গা ☰ মা ☰ পা ☰ ধা ☰ নি ┐ সা ┌̇—এই রকমভাবে কিংবা অন্যভাবে যদি লেখা যায় তাহলে সমগ্র বিশ্বে এই পদ্ধতির দ্বারা আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত যথার্থভাবে লিখিত হয়ে প্রচারিত হতে পারবে; যা অন্য পদ্ধতির দ্বারা সম্ভবপর হবে না। আমি এ কথা বলতে পারি যে, ঐ পদ্ধতিটির যাঁরা যথার্থভাবে বিচার বিবেচনা করবেন তাঁরা সকলেই আমার কথাকে সমর্থন করবেন।

গুরুদেব বলিলেন,—সন্ন্যাসীমহারাজ আমার মনোগত ইচ্ছাকে বুঝে নিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে দণ্ডমাত্রিকের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তবে একটা কথা, অন্যান্য যে কয়টি পদ্ধতির প্রচলন হয়ে পড়েছে সেগুলিও শিক্ষার্থীদের জেনে রাখা আবশ্যক হবে।

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—তা নিশ্চয়ই। তবে একটা নির্দ্দিষ্ট সর্ব্ব-সক্ষম পদ্ধতিকেই সকলের মেনে নিয়ে চলাই যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—ঐ মেনে নেওয়ার মত মন তৈরি হতে দেরি আছে। এই কথা শুনিয়া গুরুদেব একটু হাসিলেন; তাহার পর তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—আর একটা কথা, যে সকল ছাত্রছাত্রী কণ্ঠসঙ্গীতবিদ্ হতে ইচ্ছা করবেন, তাঁদের প্রত্যেককে গান শিক্ষায় বহুদূর অগ্রসর হবার পর তারের যন্ত্র, সুরবাহার কিংবা বীণা বাদনের অধিকার অনেকখানি লাভ করতে হবে। কারণ যন্ত্রেতে অধিকার না থাকলে যথার্থভাবে উচ্চস্তরের কণ্ঠসঙ্গীতবিদ্ হওয়া যায় না বলেই আমার বিশ্বাস। তারের যন্ত্রের মধ্যে যে সুন্দর ও মাধুর্য্যময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

রাগের প্রকাশভঙ্গীগুলি উৎপন্ন হয়, তাকে নিজ শক্তিতে অঙ্গুলির দ্বারা সৃষ্টি করে বহিরিন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে সেই স্থানে নিয়োজিত পূর্ব্বক অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে যোগস্থাপন করে তাকে লাভ করতে না পারলে শুধুমাত্র কণ্ঠসঙ্গীত সাধনায় অনেকখানি ফাঁক থেকে যায়। এইরূপভাবে যন্ত্রীদেরও কণ্ঠসঙ্গীত আয়ত্ত করবার দরকার হবে। তালাদি বাদ্যের ঠেকা ও বোল অনেকগুলি করে নিজ হস্তের দ্বারা প্রকাশ করবার ক্ষমতা না হলে যন্ত্রী ও গায়কের পক্ষে বহু প্রকারের ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতা যথাযথভাবে হবে না, এই জন্যে শিক্ষার মাধ্যমে ওটা রাখতেই হবে। এই সকল যুক্তিপূর্ণ নিয়মগুলি আগেকার দিনে সঙ্গীতগুণীরা মেনে চলতেন। তাই শোনা যায় ও দেখা গেছে প্রাচীন ঘরাণা গুণীরা একাধারে গায়ক এবং যন্ত্রী ছিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—এত বড় সত্য কথাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই,—কিন্তু একটা কথা অতি সংকোচে ও ভীতভাবে নিবেদন করছি যে, আপনি এবং সাধকজী ত কখনও যন্ত্র বাজান ও জানেন বলে শুনিনি?

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—আমার গুরুদেব বীণাযন্ত্র খুব ভাল বাজাতে পারেন। তবে আজকাল আর তেমনভাবে চর্চ্চা করেন না।

গুরুদেব বলিলেন,—ভারতীকুমারও আমার বীণাটিতে প্রায় সমস্ত রাগের আলাপ বাজাতে অভ্যাস করেছিলেন। আজকাল ঐ যন্ত্র ক্রয় করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য বলে বাবাজীবনের জন্যে তৈরি করিয়ে দিতে পারিনি; এজন্যেই আপনারাও জানতে পারেননি।

সন্ন্যাসীমহারাজ গুরুদেবকে বলিলেন,—আপনি চর্চ্চা ছেড়ে দিলেন কেন?

গুরুদেব বলিলেন,—একটার ভাবেই মজে থাকি, দুটোকে ধরে

রাখবার আর আগ্রহ বিশেষ নেই। সাংসারিক জীবনে যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটোকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করতে গেছলেম তার কোন মূল্যই আমাদের দেশের কাছে না পেয়ে একটাকে অবসর দিয়ে দিয়েছি। কেবল মাঝে মাঝে ঐ যন্ত্রটির কাছে প্রণাম করে' ও ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে বলি—তোমার শক্তির কণা মাত্র যা লাভ করেছিলমে তার সম্মান আমি তোমাকে দিতে পারলেম না ; তোমাকে আমার কাছে আনা ভাল হয়নি। গুরুদেবের এই কথা শুনিয়া সকলের মনে বিষাদ ভাব আসিয়া গেল।

সন্ন্যাসীমহারাজ একটি গম্ভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—এ প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করে ভাল করিনি। সত্যই দেশের অবস্থা জেনে শুনেও আমি ঐ কথা জিজ্ঞেস করে নিজেও দুঃখ পেলেম এবং আপনাদেরও দুঃখ দিলেম।

গুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—যাক্‌গে ও কথা, এখন শিক্ষা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বিষয় জানাচ্ছি,—উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন শিক্ষার জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রাখা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। ঐ সঙ্গীত আমাদের প্রাণস্বরূপ। যে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সারা দেশকে প্রেমের অমৃত সাগরে ভাসিয়ে ছিলেন এবং সেই অমৃত পান করে' মানুষের অন্তর প্রেমময় হয়েছিল, তাকে জানা ও শিক্ষা করা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আশ্রমের থাকবার মত উপযুক্ত কীর্ত্তনীয়ার সন্ধান করতে হবে।

গুরুদেব বলিলেন,—সন্ধান করতে কষ্ট পেতে হবে না। এত বড় প্রতিষ্ঠান যাঁর কৃপায় হচ্ছে তিনি তার জন্যে যথাযথ ব্যক্তিও ঠিক করে রেখেছেন। ঠিক সময়েই আমরা তাঁদের দর্শন পাব। এখন আর একটা কথা এই যে, আশ্রম তৈরি হয়ে গেলে উদ্বোধনের পর কয়েক

মাসের মধ্যে সমস্ত প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এবং তাঁদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সেই সেই প্রদেশের বড় বড় সঙ্গীতগুণীদের আহ্বান করে বড় আকারে ও যথানিয়মে একটি সঙ্গীতের অধিবেশন করতে পারলে বড় ভাল হয়। তাহলে সেই অধিবেশনের সময় আশ্রমের শিক্ষার নিয়মাদি প্রচার করে এবং সমস্ত রাগের গঠন প্রণালী ইত্যাদির সম্বন্ধে বিশেষভাবে যুক্তি দেখিয়ে যদি সর্ব্ববাদীসম্মত একটি নিয়ম ব্যবস্থা রক্ষা করে সকলের নিকট হতে স্বীকৃতি স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাহলে সঙ্গীতের আর একটা দিক দিয়ে খুব বড় কল্যাণকর কাজ করা হবে বলে মনে করি।

গুরুদেবের এই উপদেশগুলি সকলেই একবাক্যে মানিয়া লইলেন এবং উহা নিশ্চয়ই করা হইবে বলিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ ও জমীদারমহাশয় জানাইলেন।

জমীদারমহাশয় গুরুদেবকে বলিলেন,—প্রয়োজন মত শিক্ষা সমাধার মান ধার্য্য কত বৎসরের মধ্যে থাকা আপনি আবশ্যক মনে করেন।

গুরুদেব বলিলেন,—আমার মনে হয় অন্ততঃ দশ বছর থাকা দরকার। দু'বছর কেবল স্বর ও রাগের স্বরগ্রাম সাধনার জন্যে থাকবে। যাঁরা খেয়াল গায়ক হতে ইচ্ছে করবেন তাঁদের ঐ দু'বছরের পর ধ্রুপদ প্রথমতঃ শিখতে হবে অন্ততঃ দু'বছর তারপর চার বছর থাকবে খেয়াল শেখবার জন্যে। বাকী দু'বছরের মধ্যে দেড় বছর তারের যন্ত্র ও ছ'মাস কীর্ত্তন, ধর্ম্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও চর্ম্মবাদ্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আরো ব্যবস্থা রাখতে হবে শেষের দিকে প্রত্যেক মাসে দু'বার সঙ্গীত সভার আয়োজন করে ঐ সকল ছাত্রছাত্রীদের সভায় গাইবার শক্তি অর্জ্জনের জন্য।

যাঁরা শুধু ধ্রুপদী হতে চাইবেন তাঁদেরও ঐরূপ স্বর সাধনা করে

তারপর পাঁচবছর ধ্রুপদ শিখবার জন্যে সময় রেখে বাকী তিন বছরের মধ্যে এক বছর থাকবে খেয়ালের জন্যে। আপনাদের মনে হতে পারে 'যাঁরা শুধু ধ্রুপদী হতে ইচ্ছুক হবেন তাঁদের খেয়ালগান না জানলেই বা ক্ষতি কি।' ক্ষতি বিশেষ কিছু নেই তবে খেয়ালের জন্ম ধ্রুপদ হতে হলেও যখন সে তার স্বাতন্ত্র্যে ও রূপবৈশিষ্ট্যতায় এক বিরাট ও অপূর্ব্ব শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন শিক্ষার্থীদের তাকে সাধনার দ্বারা পাওয়া ও জানা অন্ততঃ কিছুও প্রয়োজন মনে করি।

জমীদারমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—মোঘলসাম্রাজ্যের শেষ সময়ে খেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে বলে শোনা যায়। কি রকম ভাবে হয়ে পড়ল, সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। এ বিষয়ে আপনার ধারণা কি জানতে বাসনা হচ্ছে।

গুরুদেব বলিলেন,—এ সম্বন্ধে লিখিত ভাবে ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে আমি চিন্তার দ্বারা যেটুকু উপলব্ধিতে আনতে পেরেছি, তাতে মনে হয় তানসেনগুরু-হরিদাসস্বামী ধ্রুপদ গান করতেন কেবলমাত্র ঈশ্বর উপাসনার জন্য। কোনরূপ তালাদি বাদ্যযন্ত্রের অনুগামী ছিলেন বলে শোনা যায়নি। তিনি স্বাধীন চিত্তে ধ্রুপদ গানের মধ্যে ভাবাবেশে সেই সেই রাগের সুরবৈচিত্র্য অঙ্কন করে যেতেন সর্ব্বদা নূতন নূতন প্রকারে তার রস-প্রেমে মাতওয়ারা হয়ে। এরকম ভাবে গান করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রকৃত বলেই আমার মন বলে এই সাধনসিদ্ধপুরুষের কাছেই শিক্ষালাভ করলেন ঐরূপ সুরের মহিমা-পূর্ণ ও প্রাণমাতান আদর্শের গান রামতনুপাঁড়ে। তিনি শিক্ষা সমাপনান্তে সংসার জীবনের পথে এসে যখন ঐরূপ পদ্ধতির গান রাজা রাজড়ার কাছে প্রচার করলেন তখন তাঁর সেই অপূর্ব্ব ভাবমাহাত্ম্যপূর্ণ গানে সকলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সমগ্র দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

তিনি ধ্রুপদকে তার গণ্ডিবদ্ধ নিয়ম থেকে সরিয়ে এনে এক নূতন ভাবে সুরের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর কণ্ঠ দিতে লাগল সেই প্রতিষ্ঠিত রূপের উপর নিত্য নূতন সাধনার মূল্যবান পূজা উপচার। সম্রাট আকবর তাঁকে নিজ দরবারে এনে নবরত্নের মধ্যে উজ্জলতম রত্ন বলে প্রচার করলেন এবং উপাধি দিলেন 'তানসেন' অর্থাৎ রাগ বিস্তারে শ্রেষ্ঠ। পরে তাঁর গায়কীর যাঁরা ধারক বাহক হলেন তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা বোধ হয় তাঁর মত সাধক জীবনের পথ থেকে সরে এসে দরবারবিলাসী হয়ে পড়ে ধ্রুপদের আধ্যাত্মিক স্থান এবং রচনার পবিত্রপ্রভাবশক্তির স্থান হতে নেমে পড়লেন। তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় বলে গণ্য হল সুর বিস্তারের রচনা কৌশলটিই এবং সুরের মায়াজাল সৃষ্টির উপরেই এনে দিল তাঁদের প্রেম, দরদ ও আন্তরিকতা। তখন তাঁরা স্বল্প কথায় গীত রচনা করে' সৃষ্টি শক্তির ইচ্ছাকেই বড় করে দেখালেন খেয়াল নাম দিয়ে। তাই মনে হয় সেই থেকে তানসেনের ধ্রুপদ গানের রীতি নীতির প্রকৃত ভাবধারা বজায় রইল না। ঐ গানের গায়কীপদ্ধতি যা রইল তা পূর্ব্বের রীতি নীতিকে অনুসরণ করেই। খেয়ালের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে মোটামুটি এই রূপই আমার ধারণা হয়। এ বিষয়ে মতান্তর থাকতে পারে। যাই হ'ক আমাদের আশ্রমে শিক্ষার্থীদের ধ্রুপদ গানের মধ্যে সুরের কলা কৌশল প্রয়োগ করবার নিয়মগুলি এবং তৎসঙ্গে আলাপ শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। আমার বিশেষ করে বক্তব্য এই যে, ধ্রুপদের মধ্যে যেমন আছে তার আধ্যাত্মিক মহিমা, কবিত্বের ভাব ও প্রভাব, তেমনি তার সঙ্গে তাকে সুরের সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধিশালী করে তার যথার্থ শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করার দায়িত্ব রাখতে হবে। ধ্রুপদের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীতের প্রকাশ শক্তির কোনরূপ অভাবই থাকতে পারে না। এখন মূল বিষয়ের আরো অনেক কিছু যা বলবার আছে সেগুলি

বলি। ধ্রুপদ শিক্ষার্থীদের বাকী দু'বছর পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী যন্ত্রাদি শিক্ষার জন্যে থাকবে। যাঁরা শুধু যন্ত্রী হতে চাইবেন, তাঁদের অনুরূপ ভাবে স্বর সাধন এবং গৎ ও আলাপের জন্যে সময় ধার্য্য থাকবে সাত বছর। তৎপূর্ব্বে এক বছর কণ্ঠে স্বর সাধন এবং দেড় বছর ধ্রুপদ শিক্ষার জন্যে থাকবে, এবং বাকী সময়টুকু থাকবে চর্ম্মবাদ্য শিক্ষার প্রয়োজনে। শিক্ষার মধ্যে স্বরলিপি জানা, সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়ন, এ সমস্ত ত থাকবেই, তাছাড়া কিছু সময় হিন্দী ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর একটা কথা, গান এবং গৎ ইত্যাদি রচনা করবার ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্যে বাধ্য-বাধকতা রাখতে হবে। কবিত্ব ও রচনাশক্তি থাকা সঙ্গীতজ্ঞদের সাধনার সৃষ্টিকে রক্ষা করে রাখবার উপায় স্বরূপ। নায়কগোপাল, বৈজুবাওরা প্রভৃতি বিখ্যাত গায়কদের যদি রচনা শক্তি না থাকত তাহলে আমরা তাঁদের অস্তিত্বই বুঝতে পারতেম না। কবিত্ব শক্তি, প্রকৃত গুণীগায়ক হবার একটা বিশেষ লক্ষণ। পরিশেষে আমার আর একটি মন্তব্য এই যে, ভাবপ্রবন দেশীয় সঙ্গীতগুলি জানার বিশেষজ্ঞদের সন্ধান নিয়ে আনিয়ে প্রত্যেক মাসে ছাত্র-ছাত্রীদের শোনাতে পারলে তাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব উৎপন্ন হয়ে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে অনেকখানি আধ্যাত্মিক ভাবের রস জোগান দিয়ে তাকে পরিপুষ্ট করতে সহায়তা করবে। শিক্ষার আরম্ভ থেকেই তম্বুরা দ্বারা সাধনার নিয়ম থাকবে। উপস্থিত আমি এই গুলিই প্রয়োজন মনে করছি। এরপর আপনারা বিচার বিবেচনা করে দেখুন কোন কোনগুলি বাদ ছাঁট দিয়ে তৎপরিবর্ত্তে যদি নূতন কোন যোগ দিলে ভাল হয়।

এই কথা শুনিয়া সকলে বলিলেন,—আপনি বহুকাল ধরে শিক্ষকতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে যে সকল নিয়ম ব্যবস্থার কথা বললেন তার উপর আমাদের আর কিছু বলবার কি

অধিকার আছে এবং থাকতে পারে? আপনার প্রত্যেক বক্তব্য ও উপদেশগুলিই আমাদের মনে অতি উত্তম এবং যথাযথ নিয়মসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে।

এইসময় সাবিত্রীদেবী উঠিয়া গুরুদেব পত্নীর কাছে চলিয়া গেলেন। গুরুদেব বলিলেন,—আর একটা ব্যবস্থার বিষয় বলা হয়নি, তা' এই; আশ্রমে একটি গ্রন্থাগার করে দেশের প্রাচীন ও বর্ত্তমানের রচিত সঙ্গীতের গ্রন্থ সংগ্রহ করে রাখবার বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। তৎসঙ্গে একটি ছাপাখানারও প্রয়োজন হবে। দেশের যে সমস্ত গুণীদের গ্রন্থ রচনায় দক্ষতা আছে অথচ অর্থাভাবে তাঁরা ছাপাতে পারেননি, সে সমস্ত তাঁদের গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের দ্বারা প্রকাশিত করবার ভার আশ্রমের নেওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য হবে বলে মনে করি। শিক্ষার্থীদের নিয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ করে নিয়ম রাখা আবশ্যক হবে। যেমন, আশ্রমে গ্রহণ করবার পূর্ব্বে দেখে নিতে হবে তাদের কণ্ঠ গান শিক্ষার উপযোগী কিনা এবং তাদের সুর ও তাল বোধ স্বভাবত পাওয়া আছে কি না এবং ধর্ম্মে মতি ও অনুকরণশক্তি আছে কি না। এই সব গুণগুলি অল্প বিস্তর না থাকলে তাদের পক্ষে সঙ্গীত শিক্ষা যথার্থ ও আদর্শ সম্মত হবে না। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সমাধার পর উপাধি একটা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমার মনে হয় সংস্কৃত ধরণের কণ্ঠতীর্থ, যন্ত্র বা তন্ত্রতীর্থ এই রকম উপাধি দেওয়া মন্দ হবেনা; কি বলেন? আর একটা বক্তব্য আছে, প্রত্যেক বৎসর পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে অন্ততঃ আশীনম্বর রাখতেই হবে, নচেৎ তাঁকে পরের শ্রেণীর শিক্ষা লাভে এক বৎসর বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। কোনরূপ ডিভিশন্ আমাদের থাকবে না। অর্থাৎ শিক্ষা ও সাধনাকে সস্তায় নামিয়ে দেওয়া আমি উচিত মনে করিনা। দশ বৎসর শিক্ষা সমাধার পর যাঁরা আশ্রম হতে বিদায় নেবেন

তাঁরা যেন সঙ্গীতের সাধনায়, জ্ঞানে, আধ্যাত্মিকতায় ও শিল্পে যথার্থই প্রেমিক, ভাবুক ও গুণী হবার যোগ্যতা নিয়ে যেতে পারেন সেই লক্ষ্যই আমাদের ধ্রুব হয়ে থাকবে, এবং এইরকম ব্যক্তিই পাবেন উপাধি।

গুরুদেবের এই মন্তব্য সকলেরই মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। জমিদারমহাশয় বলিলেন,—মোটামুটি ভাবে একরকম প্রায় সমস্ত কিছুই সুন্দর নিয়ম ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গেল। এখন আপনি যদি অভয় দেন তাহলে একটা কথা নিবেদন করি।

গুরুদেব অতি সাগ্রহে বলিলেন,—একি কথা! আমার যা কিছু শক্তি, সামর্থ্য, মন প্রাণ সবই আপনাদের জন্তে মনে করবেন। আমি ভারতীকুমারকে যেমন দেখি তদপেক্ষা আপনাদের কম দেখি না। আপনাকে দেখে অবধি সত্যই নিজের সহোদর ভাইএর মত ভেবে ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

জমীদারমহাশয় এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—এর চেয়ে আমার কি সৌভাগ্য আছে। আপনি এরপর থেকে দয়া করে ছোট ভাইএর মত মনে করে আমাকে ধন্ত করবেন; আর জমীদার বলে ডেকে লজ্জা দেবেন না, 'প্রশান্ত' বলে ডাকবেন। আপনি বোধ-হয় জানেন আমরাও ব্রাহ্মণ। তাহার পর জমীদারমহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন,—সাবিত্রী যে কাম্য বস্তুর উপর মনপ্রাণ অর্পণ করেছে, আপনার আশীর্ব্বাদে সে যদি তা লাভ ক'রতে পারে তাহলে আমি নিজেকে ধন্ত মনে করব। গুরুদেব বলিলেন,—তার কাম্য বস্তুর লাভে শুধু আপনি কেন আমরাও সর্ব্বাধিক সুখী হব।

ইহার পর গুরুদেব প্রীতিপুলকিত মনে জমীদারমহাশয়ের মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া আর্দ্রচক্ষে কহিলেন, এখন বল ভাই তুমি কি বলতে চাচ্ছিলে?

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আপনার একটু গান শুনবার বাসনা হচ্ছে।

গুরুদেব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—আরে! এই সামান্য কথার জন্যে এত সংকোচ আসতে যে পারে আমি তা ভাবতেই পারিনি,—মনে করেছিলেম বুঝি সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন গুরুতর প্রশ্ন করে তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিবে! এক্ষুণি শোনাচ্ছি,—এই বলিয়া গুরুদেব অত্যন্ত খুসী হইয়া তম্বুরাটি পাড়িবার জন্যে উঠিয়া পড়িতেই সঙ্গীতসাধক তাড়াতাড়ি উঠিয়া তম্বুরাটি পাড়িয়া মস্তকে ঠেকাইয়া গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিলেন। সুবৃহৎ তম্বুরায় যখন জুড়ির তার দুইটিতে মুদারার ষড়জ স্বর এবং অন্য দুইটির একটিতে উদারার পঞ্চম ও আর একটিতে উদারার ষড়জ স্বর গুরুদেবের অঙ্গুলি চালনায় ঝঙ্কৃত হইল তখন তাহার সুমধুর গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে সমগ্র গৃহ ভরিয়া গেল।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—তম্বুরায় মাত্র এই তিনটি সুরের সমন্বয় ধ্বনি যখন উৎপন্ন হয় তখন তার ভাবমায়ায় মনকে যেন আধ্যাত্মিক স্থানে টেনে নিয়ে যায়। বাস্তবিকই কণ্ঠসাধনার জন্য কি অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য আবিষ্কার করেছিলেন সেই ব্রহ্মদ্রষ্টা তম্বুরমুনি!

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—এখন হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল,—আজকাল কয়েকটা আসরে দেখেছি কোন কোন গায়ক তম্বুরার জুড়ির তার দুটিকে ভিন্ন ভাবে বেঁধে অর্থাৎ একটিকে মুদারার 'সা' এ ও অন্যটিকে উদারার 'নি' এ বেঁধে গান করছেন। ঐরূপ বাঁধা সুর যখন বাজতে থাকে তখন 'নি' ও 'সা', এর অদ্ভুত সামঞ্জস্য পূর্ণ সুমধুর আওয়াজ শুনে মনে হয় যেন মাথার ভিতর কেউ করাত চালাচ্ছে। এরকম বেখাপ্পা সুর বাঁধবার মানে কি বলুন না?

গুরুদেব এইরূপ অসম্ভব ও অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত অবাক

হইয়া বলিলেন,—এ নিশ্চয়ই কোন বাইরের খেয়ালীর অদ্ভুত খেয়ালের দ্বারা মাথায় এই আবিষ্কার এসেছে এবং তাই দেখেই বোধ হয় আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ বিচার বিবেচনাকে বিস্মরণ হয়ে সুরের বিজ্ঞানসম্পর্ককে লণ্ড ভণ্ড করতে আরম্ভ করেছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, তাঁরা কি করে কানের কাছে ঐরূপ ভারসাম্যহীন সুরের পীড়াদায়ক ধ্বনিকে গ্রহণযোগ্য ও ন্যায়সঙ্গত মনে করলেন! তম্বুরার প্রকৃত নিয়মে বাঁধা সুরের সঙ্গে মনপ্রাণ নিয়োগ করে যখন সুরের সাধনা করি তখন মনে হয় যেন বাইরের ধ্বনি ভিতরের সঙ্গে এসে এবং ভিতরের ধ্বনি বাইরের সঙ্গে মিলে গলা জড়াজড়ি করে অন্তরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যই মনে হয় যেন তম্বুরমুনির যোগসিদ্ধ শক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত এই তম্বুরা যন্ত্রটির রূপাকৃতি ঠিক নাদব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশক ধ্বনির প্রতিমূর্ত্তি। উদারার 'সা' সুরের তারে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে আমি অনুভব করি যেন তম্বুস্থানটি ঠিক নাভিস্থলের চক্রাধারের মত, পঞ্চমের তারটিতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তা যেন হৃদ্‌পদ্মস্থল এবং মূদারার 'সা' মস্তকের ব্রহ্মস্থল। মস্তকের মধ্যে যেমন দুটি মস্তিষ্ক দেহের সমস্ত প্রাণশক্তিকে রক্ষা করে, তদ্রূপ নিম্নস্থল হতে সমস্ত সুরের রূপ ও প্রাণশক্তিকে রক্ষা করে রেখেছে ঐ দুইটি জুড়ির তারের ষড়্‌জ স্বর দুটি। পক্ষাঘাতে একটি মস্তিষ্ক নষ্ট হলে যেরূপ দেহের একটি অঙ্গ বিকল হয়ে যায়, সেরূপ জুড়ির তারের একটিকে স্থানচ্যুত করলে তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তম্বুরায় সুর-পঞ্চমের দ্বারা যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তা বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতির সেই ওঙ্কার ধ্বনির ন্যায়। এই যন্ত্রটির সুরের মধ্যে যে বস্তু নিহিত আছে তার মত অত বড় বিজ্ঞান ও দর্শনের একত্র সমাবেশ কোন বস্তুতে আছে কি না আমি জানিনা।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আপনি যেরূপ তম্বুরার সুরের মাহাত্ম্য

ব্যাখ্যা করলেন, তা' ক'জন যে জানেন সেই আমি ভাবছি। আমার মনে হয় আমরা অনেক কাজই ঝোঁকের মাথায় করি কিংবা নূতন কিছু একটা করে লোককে তাক্‌লাগিয়ে দেওয়া যাবে এ রকমও আমরা ভাবি। কিছু মনে করবেন না, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, রামকেলী রাগ ভৈরব রাগ হতে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানি, যাই হ'ক ওতে কিন্তু আজকাল অনেকে কড়ি মধ্যম ব্যবহার কচ্ছেন। আমি এর কোন যুক্তি সঙ্গত অর্থ খুঁজে পাই না। প্রাতঃকালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রামকেলীর রূপভাব এমন যে তার রূপ প্রকাশ কালীন তাঁরা যখন কড়ি মা লাগান তখন মনে হয় যেন পরিবেশক রসগোল্লার সঙ্গে নুন মিশিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব সুর যোজনার গানের যেখানে দু একটি রাগের অংশ মিলিয়েছেন সেখানে ত কৈ বেখাপ্পা লাগে না বরং সুন্দর মিলন সম্পর্ক অনুভব হয়, আর যাঁরা রাগসঙ্গীতের গায়ক তাঁরা কি করে এমন বেখাপ্পা ভাবে সুর লাগান বলুন ত? এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, ভৈরব হতে বিশেষ করে পার্থক্য রাখবার জন্যে তাঁরা কড়ি মা লাগান।

গুরুদেব ভীষণ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন,—চমৎকার যুক্তি ত! রামকেলীতে আরোহণে ঋষভ নেই এবং এর বাদী-সংবাদী পঞ্চম ষড়জ। ভৈরব হতে এতখানি তফাতের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁদের রাগ প্রকাশে অসুবিধা হয় তাহলে তাঁদের দয়া করে রামকেলী না গাওয়াই ভাল নয় কি? প্রকৃতির সঙ্গে রাগের রূপভাবের যে সম্বন্ধ আছে তাতে করে প্রাতঃকালের সময় যে রাগে পঞ্চমকে কেন্দ্র করে' তার দুপাশে মধ্যম ও কোমল ধৈবত ব্যবহার হয়ে আসছে সেখানে কড়ি মধ্যম লাগালে শুধু খারাপই শোনাবে না সময়ের সঙ্গে সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যাবে। এমন করে আমরা দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসলে সঙ্গীতের মধ্যে ভীষণ বিপ্লব

এসে সবই যে উলটপালট্ করে দেবে ভাই! তাহার পর গুরুদেব গুম্ফান্তরালে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া জমীদার মহাশয়কে বলিলেন,—যাঁরা রামকেলীতে কড়ি মধ্যম লাগিয়ে গান করেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা ঠাটের ভক্ত তাঁরা তাহলে এটিকে কোন্ ঠাটের রাগ বলবেন? ভৈঁরো-তোড়ী কি?

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—এ রকম হঠকারিতা বেশীদিন থাকবে না, আবার শীঘ্র সব ঘুরে আসবে। এ বাংলা দেশ, ঠিক সময়ে বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতা আবার সকলের মাথায় ফিরে আসবে। হিড়িকের গরম পড়ে এখন সঙ্গীতের উপর কাল বৈশাখীর ঝড় চলেছে। এরপর ক্রমশঃ শান্ত-সমাহিত ভাবরূপবর্ষা নেমে সঙ্গীতের ক্ষেত্র আবার যথার্থভাবে উর্ব্বর করবে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার বিলম্বও নেই।

গুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আচ্ছা আমি এখন গাইতে আরম্ভ করি। এই বলিয়া তিনি বৃন্দাবনি সারং রাগের আলাপ করিতে সুরু করিলেন। গুরুদেব সারং রাগের আলাপ বহু রকম বিস্তার ও বৈচিত্র্যের দ্বারা কণ্ঠে সুললিত ভাবে প্রকাশ করিয়া এক ঘণ্টার পর সমাধা করিলেন এবং পরে একটি ধ্রুপদাঙ্গের চৌতাল ও ধামার গাহিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আপনার মুখে একখানি খেয়াল শোনবার ইচ্ছে হচ্ছে।

বলা বাহুল্য গানের প্রথম থেকেই সাবিত্রীদেবী সেইখানে আসিয়া আবার উপস্থিত হইয়াছেন।

গুরুদেব বলিলেন,—একটু সংক্ষেপে গাই, কারণ আপনাদের অনেক বেলা হয়ে যাবে। এই বলিয়া গুরুদেব 'সুখরাইতোড়ীর, 'বাত পুরাণী' গানটি আরম্ভ করিলেন; তাহার পর ঐ রাগের একটি ছুনী গান

গাহিয়া সমাধা করিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আপনার কোন্ সাধনাটা বেশী বা কম তা বুঝবার উপায় নেই। প্রত্যেকটির মধ্যেই চরম সাধনার শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে।

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—গুরুদেবের বীণা বাদন শুনলেও আপনারা ঐ কথা বলবেন।

জমীদারমহাশয় গুরুদেবকে বলিলেন,—আচ্ছা! এই সারংটির বৃন্দাবনী কেন নাম হ'ল তা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে এবং আজকাল এই রাগটিতে অনেকে দুই নিষাদ ব্যবহার কেন করেন সে সম্বন্ধেও আপনার অভিমত জানতে বাসনা করি।

'বৃন্দাবনী' নামটি সম্বন্ধে গুরুদেব বলিলেন,—বৃন্দাবন অঞ্চলের স্বভাবজাত সুর বলে তাই বোধ হয় প্রসিদ্ধ স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা প্রসূত এই রকম সুর নাগপুর অঞ্চলে, সাঁওতাল পরগণায় এবং মানভূমের অনেক স্থানের আদিবাসীদেরও স্বভাবজাত মনে করে আসছি। মাত্র প্রধান স্বরের দ্বারা যে যে সুরের রূপ সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি প্রথম যুগের মনুষ্য কণ্ঠের স্বভাবজাত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। সুতরাং যে সময় সাতটি স্বরেই সৃষ্টি হয়নি সে সময় ঐ রাগে কোমল সুরের আবির্ভাব হওয়া মোটেই স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া ঐ রাগটির প্রকাশ নিয়ম যে সময়ের জন্যে বিশেষ করে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, সে সময়ের প্রকৃতির স্বভাবগত অবস্থায় কোমল স্বরের ব্যবহার কি করে আসতে পারে তা আমার বোধগম্য হয় না। কারণ দিনের দ্বিতীয় প্রহরের তৃতীয়াংশের সময় বিশেষ করে ধরিত্রীররূপ হয় উত্তাপপূর্ণ ও রুক্ষ, চতুর্দ্দিকের সমস্ত বস্তুই তখন নিঝুম নিস্তব্ধে থাকে, কোমলতা ও সরস ভাবের কোনরূপ প্রকাশ থাকে না। পাখীরা থাকে তখন গাছের

মধ্যে লুকিয়ে, গোজাতি বৃক্ষের ছায়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে, রাখালেরা তখন ঝোপের আড়ালে বসে বাঁশীতে মেঠো উদাসী সুর বাজিয়ে যেন প্রকৃতির ভীষণ শূন্য অন্তরে করুণ বেদনা প্রদান করছে বলে মনে হতে থাকে। কাজেই সেই সময়ের সুনির্দ্দিষ্টভাবে রক্ষিত ঐ রাগটিতে কোমল স্বরের প্রয়োগ দেখালে তাতে ভাববস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধকে উপেক্ষা করা হয় না কি? এ জন্যে আমার মনে হয়, প্রধান রাগগুলির সময়ানুযায়ী প্রকৃতির রূপের সঙ্গে যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তা বুঝতে হলে সহর ছেড়ে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে গিয়ে উপলব্ধি করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ অভিজ্ঞতার অভাব থাকলে রাগের গঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা আসা কঠিন হয় এবং এজন্যেই আজকাল আমরা অনেক বিষয়ে গোলমাল করে ফেলছি।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—তাহলে বৃন্দাবনী সারংএর পরই মধুমাধুবী-সারংএ কি করে কোমল নিষাদের ব্যবহার হল? তখন সঙ্গে সঙ্গেই এমন বিশেষ কোন প্রকৃতির রূপ বদলে যাওয়া ত সম্ভব নয়?

গুরুদেব তাঁহার ভারতীকুমারকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—এ সম্বন্ধে তোমার কি যুক্তি আছে তা এঁদের বুঝিয়ে দাও ত বাবা!

সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—প্রধান রাগকে অবলম্বন করে আরো অনেক রাগ যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, আমার মনে হয় তাঁরা একেবারে বিচারহীন হয়ে করেননি। প্রথম নির্দ্দিষ্ট হয়ে যে আদি রাগগুলি প্রকৃতির রূপভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, সেগুলির সেই সেই সময়ে অনেকক্ষণ করে' তাদের স্থিতি ও প্রভাব শক্তি আছে বুঝতে হবে। এজন্যে বৃন্দাবনীসারংএর রূপ প্রকাশের সময়ধার্য্যকে অনেকখানি ব্যাপক ভাবে ধরে নিতে হয়। তারপর তৃতীয় প্রহরের সম্মুখ ভাগে প্রকৃতির নিস্তব্ধ রূপ ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাগটিতে কোমল 'নি' লাগিয়ে

জাগ্রত আনন্দের মত রূপের প্রকাশ দেখাবার জন্যে যিনি 'মধুমাধবী' নামকরণ করেছিলেন তাঁর সৃষ্টি ও ভাব শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। এইরকম ভাবে ক্রমশঃ প্রকৃতির কোমলভাব ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কোমল নিষাদের সঙ্গে কোমল গান্ধার যুক্ত করে' সরস স্বরবিন্যাস দিয়ে 'ভীমপলশ্রী' 'রাজবিজয়' প্রভৃতি রাগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সব রাগের মধ্যেই যে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে যথার্থ যোগাযোগ সম্বন্ধ বুঝতে পারি তা নয়। কেন আমরা তা পারি না, তার উত্তরে আমার মনে হয় যে, বিশেষ বিশেষ কয়েকটি প্রধান রাগই প্রথমতঃ সময়ের সঙ্গে ভাব রক্ষা করে' যথার্থভাবে তাদের সেই সেই স্থানে রক্ষিত হয়েছিল, পরে যখন ঐগুলির এক একটিকে অবলম্বন করে' সঙ্গীতজ্ঞগণ বহু রাগের সৃষ্টি করলেন তখন তাঁদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে কতকগুলি রাগের যোগাযোগ প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক সম্বন্ধ রেখে করা সম্ভবপর হয়নি। দিবারাত্রির মধ্যে আমাদের উপলব্ধিমত আটটি প্রহরের প্রারম্ভিক ও অন্তের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রকৃতির রূপের গতিশীল তফাৎ আমাদের ঠিক বোধগম্য হয় না। এ জন্যে সময়ের সম্পর্ক ধরতে না পারার এটাও একটা কারণ বলে মনে করতে হয়। আর একটা কথা মনে হয়, পূর্ব্বে যে সকল সঙ্গীতসাধক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে সময়ের সম্পর্ককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে' রাগের রূপ সেই সেই সময়ের জন্যে নির্দ্দিষ্ট করেছিলেন সেই সেই রাগগুলিই যথার্থরূপে সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাব এনে দেয়। আর যে সকল সঙ্গীতজ্ঞ দরবারে বসে বা সহরে থেকে রাগ রচনা করে' সময় নির্দ্দিষ্ট করে গেছেন, সেগুলি তেমন ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ সম্বন্ধ না থাকার দরুণই বোধ হয় আমরা ঠিক ধরতে পারি নি।

সঙ্গীতসাধকের যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য শুনিয়া সকলে পরিতোষ

লাভ করিলেন। জমীদারমহাশয় বলিলেন,—যেমন গুরু তেমনি তাঁর উপযুক্ত শিষ্য দেখে আজ আমাদেরযে কি আনন্দ হল তা কি আর বলব!

সন্ন্যাসীমহারাজ গুরুদেবকে বলিলেন,—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছলেম, কথাটা এই যে, বর্ত্তমানে দেখা যাচ্ছে যিনি সমস্ত রাগগুলিকে কয়েকটি ঠাটের মধ্যে ফেলে এক একটিকে সেই গোষ্ঠীভুক্ত রাগ বলে ধার্য্য করেছেন, তাঁর সেই নিয়মকে এখন অনেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মেনে নিয়ে চল্‌ছেন। আমার কিন্তু ঐরূপ ঠাটের নিয়ম ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে, অর্থাৎ মনে হয় যেন ওতে বিশেষ ভাবে যুক্তি ও বিচারের অভাব আছে। যাই হ'ক আমাদের পাঠ্য-তালিকায় ঐ নিয়মটাকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়া হবে কি না তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

গুরুদেব উত্তরে বলিলেন,—আমার মনে হয় যিনি শিক্ষার্থীদের সুবিধা হবে মনে করে ঠাটের সংখ্যা দেখিয়ে ওটাকে তৈরীর জন্যে পরিশ্রম করেছিলেন তিনি তখন উপকারের চিন্তাটাকেই বড় করে দেখেছিলেন। কিন্তু পরে যদি তিনি অবসর নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করতেন তাহলে আমার মনে হয় ওর দ্বারা কল্পিত উপকারের পরিবর্ত্তে রাগের সম্পর্ক ও অর্থ নিয়ে বিশেষ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এ কথাই বুঝতে পারতেন। ব্যাপকভাবে শিক্ষার নিয়ম ব্যবস্থার জন্যে আমাদের দেশে পূর্ব্বে তেমন কোনরূপ পদ্ধতিমূলক পাঠ্যতালিকা ছিল বলে দেখা যায় নি। বহুকাল পরে যাঁরা এই কার্য্যে ব্রতী হলেন, তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টার রূপদানকে শ্রদ্ধা ও মান্য করে তারপর সেই সমস্ত ধার্য্য বিষয়ের বিচার ও আলোচনার দ্বারা ভুল ত্রুটী সংশোধন করে নেবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি। প্রথমতঃ দেখা দরকার

'ঠাট' কথাটির 'গোষ্ঠীভুক্ত'র সঙ্গে অর্থ সামঞ্জস্য আছে কি না। এ কথা বোধহয় সকলেই জানেন যে, ঠাট বলতে কাঠামোকে বুঝায়। ঘর, বাড়ীকে প্রথমতঃ কাঠের দ্বারা তার আকৃতিটা যেমন ভাবে খাড়া করা হয়, তেমনি প্রত্যেক রাগের নির্দ্দিষ্ট স্বরগুলিকে গতায়াতের উপর রক্ষা করে যে রূপ নিয়মে দেখান যায় তাকেই ঠাট কথার অর্থে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। কাজেই 'গোষ্ঠীভুক্ত'র সঙ্গে প্রত্যেক রাগের ঠাট কথার অর্থসঙ্গতি রক্ষা পাচ্ছে কৈ? ঠাটের যথাযথ অর্থ যা হয় তাতে বুঝে নিতে হবে, প্রত্যেক রাগেরই নিজস্ব এক একটি ঠাট আছে। যাই হ'ক ঐ অর্থসঙ্গতির কথা যদি ছেড়ে দিয়েও রাগগুলির রূপসম্পর্কের মিলন ও সাদৃশ্যের উপর রক্ষা করে ঠাট সংখ্যা নির্দ্ধারিত হত, তা হলেও বরং কতকটা উপকার আছে ভেবে গ্রহণ করা যেতে পারত; কিন্তু সে নিয়মও বিচারসম্মতভাবে রক্ষা হয়নি এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—কি রকম ভাবে করলে অর্থসঙ্গত হত বলে আপনি মনে করেন?

গুরুদেব বলিলেন,—সেটাও সব রাগকে নিয়ে করা চলে না, মাত্র কয়েকটি রাগের মধ্যেই পরস্পর নিকট সম্বন্ধ পাওয়া যাবে। যেমন মনে-করুন,—পুরিয়া, মারওয়া ও সোহিনী, এইগুলি একটি ঠাট ভুক্ত। সিন্ধু, ঝিঁঝিট, কাফী এই তিনটি এক ঠাট ভুক্ত। ভৈরব, রামকেলী, কলিঙ্গড়া ও যোগিয়া এক ঠাট ভুক্ত। কাঁনাড়া, নায়কী ও সুঘরাই,—এক ভুক্ত। ইমন ও কল্যাণ এক ভুক্ত; ভীমপলশ্রী, রাজবিজয়, এক গোষ্ঠীভুক্ত। এই রকম কয়েকটিকেই নিকট সম্পর্ক ধরে অর্থগত না হ'ক অন্ততঃ সম্বন্ধগত বলে' ঠাট নাম দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু তাতেও বিশেষ কিছু উপকার নেই।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—যিনি কাফী ঠাটে বাগেশ্রী, বাহার,

ভীমপলশ্রী ইত্যাদি রাগগুলি ধরেছেন তিনি কি কেবল কোমলগান্ধার ও কোমলনিষাদ প্রত্যেকটির মধ্যে আছে বলে তাই ধরে ঠাটের উপর এত বড় গুরুত্ব আরোপ করেছেন ?

গুরুদেব বলিলেন,—যদি গঠনপ্রণালীর ও রাগের রূপের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক না থাকে তাহলে সেই রাগকে গোষ্ঠীভুক্ত রাগ কি করে বলা চলে ? মালমসলাটাই রূপের সম্পর্ক স্থাপক বস্তু নয়। বালী, চুন্, সুর্কী, ও ইঁট দিয়ে মন্দিরও তৈরী হয় আবার কারখানার চিম্নি, ঘর, দেয়াল, সাঁকো, পুল, বেদী ও চৌবাচ্চা ইত্যাদিও তৈরী হয়। তাহ'লে কি একই মালমসলার জন্যে ঐ রকম তৈরি রূপগুলো এক গোষ্ঠিভুক্ত হবে ? মনে করুন ছাত্রদের প্রশ্ন করা হল, বেহাগ কোন্ ঠাটের রাগ ? তারা উত্তরে মুখস্থ বুলি আওড়ে দিয়ে বল্ল কেদারা-ঠাটের রাগ। কিংবা 'মালকোষ' কোন্ ঠাটের অন্তর্গত ? এর উত্তরে বল্ল জৌনপুরী, বা কাঁনাড়া। এ বলার মধ্যে তাদের যদি রূপ সম্পর্ক নিয়ে কোন উপকার হবে বলে মনে করা যায় তাহলে আমি বলব, যদি কেউ ভূগোলের প্রশ্নে বেলুড় মঠ কোথায় ? এর উত্তরে বলে 'কাশীতে' তাহলে তারও ধারণা জ্ঞানের অভাব নেই মনে করে নিতে হবে। কারণ বেলুড়েও গঙ্গা, মৃত্তিকা ও মন্দির আছে, এবং কাশীতেও আছে। সুতরাং এ ব্যবস্থাকে আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অবাস্তব নিয়ম মনে করি।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—এখন বেশ বুঝছি এর প্রচলন কেবলমাত্র একটা হুজুগ ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ নিয়ম অন্ধের মত কেবল অনুসরণ করে চলা মাত্র। অধিবেশনের সময় এ সম্বন্ধে আপনার যুক্তি-সমূহ বিশদভাবে লিখে প্রকাশ করব।

গুরুগৃহিণী কপাটের আড়ালে আসিয়া গুরুদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—আপনাদের আলোচনা ইত্যাদি যদি শেষ হয়ে থাকে তাহলে

এখন আমি খেতে দেবার জায়গা করতে পারি কি?

গুরুদেব সন্ন্যাসীমহারাজকে বলিলেন,—বলুন, এখন আরো কিছু আলোচনার বাকী আছে কি না?

সন্ন্যাসীমহারাজ জমীদারমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার অভিমত কি?

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আলোচনার ত বহু বিষয় আছে, তবে আপাততঃ আর বাড়িয়ে গুরুদেবকে কষ্ট দেবার আবশ্যক নেই। অনেকক্ষণ ধরে তিনি পরিশ্রম করছেন। তাছাড়া কাজের উপযোগী একরকম প্রায় সব ব্যবস্থাই তিনি করে দিয়েছেন। সুতরাং এরপর যেগুলো বাকী রইল সেগুলো ধীরে সুস্থে হলেও চলবে।

গুরুপত্নী বুঝিলেন তাহা হইলে এখন খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আপনি অনুগ্রহ করে একটু দাঁড়ান। এই বলিয়া জমীদারমহাশয় উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীমহারাজও নিকটে যাইয়া নত মস্তকে কর-জোড়ে নমস্কার করিলেন। গুরুমাও তাঁহাদিগকে প্রতিনমস্কার ও স্নেহসম্ভাষণ জানাইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। সাবিত্রীদেবী গুরুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—মা, এবার ত আমি আপনার কিছুও সাহায্য করতে পারি।

এই কথা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তুমি তাহলে এখন আসন পেতে কলাপাতা, নুন, লেবু দিয়ে মাটীর গেলাসে করে জল দাও, আমি এদিকের ব্যবস্থা করি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাবিত্রীদেবী বৈঠকখানায় আসিয়া জানাইলেন জায়গা হইয়াছে।

ইহা শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন,—উঠুন, উঠুন, দুটো শাক অন্ন

গ্রহণ করবেন চলুন। এই বলিয়া সন্ন্যাসীজীকে ও জমীদারমহাশয়কে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। তাঁহারা হাত মুখ ধুইয়া খাবারের কাছে আসিয়া দেখিলেন অন্ততঃ পনর ষোলটি রকম রকম রান্না দ্রব্যে অন্নের চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর দধি, পায়স ও সন্দেশ আছে। জমীদারমহাশয় ও সন্ন্যাসীমহারাজ ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিলেন, "এত শীঘ্র কি করিয়া একা মানুষ এত আয়োজন করিতে পারিলেন।" তাহার পর তাঁহারা খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন,—প্রত্যেকটি রান্নাই অতি উপাদেয় হয়েছে। এমন সুন্দর রান্না কখনও খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে না।

গুরুদেব বলিলেন,—উঁনি পিতৃভবন হতে যে সব শিল্পকলা, রান্না প্রভৃতি বহুবিধ গুণ শিক্ষা লাভ করে' এসেছিলেন, তার চর্চ্চা ও অভ্যাস রাখবার উপায় ত আমার কাছ থেকে পান নি, কাজেই রান্নাগুলো যদি সত্যই ভাল হয়ে থাকে তাহলে কতকাল পূর্ব্বের শিক্ষার শক্তিকে এখনও বজায় রাখতে পারার জন্যে প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য হয় বটে; কিন্তু আমার বাড়ীতে আমিষ রান্না হয় না বলে আপনাদের সবই ফাঁকা ফাঁকা লাগবে; সত্যকারের তৃপ্তি হবে না।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—এ রকম রান্না খেতে পেলে আমি বলতে পারি যাঁরা ভীষণ আমিষাশী তাঁরাও আমিষ দ্রব্য ছেড়ে দেবেন। আমার কথা আলাদা; কারণ আমি মাছ মাংসের কোন দিনই ভক্ত নই। আপনি সে জন্যে কিছুমাত্রও ভাববেন না। আমিই বরং ভেবে বিস্মিত হচ্ছি যে, এতগুলি রান্নার প্রত্যেকটীরই ভিন্ন ভিন্ন তৃপ্তিকর আস্বাদ বজায় রেখে কি করে তিনি তৈরী করলেন। সত্যই, এটাও যে একটা কত বড় শিল্প তা এরকম রান্না না খেলে বুঝা যায় না। সমস্ত নিরামিষ রান্নার উপর এতবড় সাধনার অধিকার

কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এ শিক্ষার কৃতিত্বের জন্যেও কোন উপাধির ব্যবস্থা থাকত তাহলে আমি বলতে পারি অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের চেয়ে আরও উৎকৃষ্টতর সম্মান পাওয়া যথার্থ হত। কারণ মানুষের জন্যে মানুষ যত রকম ভাবে তৃপ্তি, সুখ ও আনন্দ দানের চেষ্টা করে সেগুলি খাদ্যবস্তুর কাছে শ্রেষ্ঠ নয়। খাইয়ে এবং খেয়ে তৃপ্তির মত বোধ হয় আর অন্য কিছু নেই।

জমীদারমহাশয়ের কাছে রান্নার অত্যন্ত প্রশংসা শুনিয়া গুরুদেব মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন,—অনেক সময় ভাল, মন্দ বিচার ও প্রশংসা দান ব্যক্তি বিশেষের উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসার জন্যেও নির্ভর করে। যেমন আজকার ক্ষেত্রে; ভাল না লাগলেও মনস্তুষ্টির জন্যেও অন্ততঃ মৌখিক ভাবে প্রশংসা না করে পার্চ্ছেন না।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—তা বলে কি আমাকেও খোসামোদকারী-দের দলে ফেল্‌লেন দাদা?—অতি নিন্দুকও যে এরূপ রান্নার অতি সুখ্যাতি না করে পারবেন না; আপনিই বলুন না পারবেন কি?

এই কথা শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। গুরুপত্নী স্বল্প দূর হইতে শেষ কথা কয়টি শুনিতে পাইয়া ঘোম্‌টাটানা মুখে গুরুদেবকে উদ্দেশ করিয়া মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন,—হয়েছে ত। কেমন, আমার নিন্দে করার জবাব্‌টা ত পেলে!

গুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—সত্যই বড় আনন্দ হল দেখে যে, জমীদার ভাইটি আমার বেশ গুক্‌ন গুক্‌ন মুখটি করে রসিকতাপূর্ণ জব্দ করা জবাব দিতে পারেন।

এইরকম ভাবে নানাপ্রকার আনন্দের কথাবার্ত্তার মধ্যে সকলে প্রচুর তৃপ্তির সহিত আহার সমাধা করিয়া উঠিলেন।

সাবিত্রীদেবীকে গুরুপত্নী ইঁহাদের সঙ্গে বসিয়া খাইতে বিশেষ

করিয়া বলায়, সাবিত্রীদেবী বলিয়াছিলেন,—"মা, আমি আপনার সঙ্গে বসে খাব; মায়ের কাছে সন্তানের খাওয়ার মধ্যে যে কত তৃপ্তি আছে, তা জানার সৌভাগ্য হতে আজ আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

গুরুপত্নী এইকথা শুনিয়া অতি শৈশবে এই মাতৃহীনা কন্যাটিকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং তিনি তখন তাঁহার গণ্ডের উপর কয়েকফোঁটা চোখের জল পড়াকে রোধ করিতে পারিয়াছিলেন না।

মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বৈঠকখানায় সকলে আসিলে পর জমীদার-মহাশয় গুরুদেবকে বলিলেন,—আপনি কি কখনও মাছ টাছ্ খান নি?

গুরুদেব বলিলেন,—একটা কথা বলতে ভুলে গেছলেম; আমার পত্নীর ইচ্ছানুযায়ী বিবাহের পর থেকে প্রত্যেক একাদশীতে সামান্য মাছ তাঁর জন্যে আনতে হয়। ঐ দিনটি ছাড়া আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে আর কোনদিন আমরা আমিষ দ্রব্য স্পর্শ করব না। ঐদিন উনি মাছ মুখে দেন বলে আমিও তাই করি। কারণ তিনি যদি তাঁর সধবাত্ব চিরস্থায়ী করবার জন্যে সেটা পালন করে চলেন, তাহলে আমারও ত উচিত নিজের সধবাত্ব বজায় রাখা; কি বল ভাই?

গুরুদেবের গভীর পত্নীপ্রেম দেখিয়া জমীদারমহাশয়ের অন্তর পুলকিত হইল। তিনি ইঁহাদের নিবিড় একাত্মভাব উপলব্ধি করিয়া কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বৌঠাকরুণ যখন পিতৃভবনে যান, তখন আপনি একা থাকেন, সেবা যত্নাদির জন্যে বড় কষ্টে পড়তে হয়, নয়?

গুরুদেব বলিলেন,—বিবাহের পর থেকে তিনি আমাকে একা রেখে এবং আমার কষ্ট হবে ভেবে কোনদিনই বাপের বাড়ী বা অন্য কোথাও যান নি। এ জন্যে বাধ্য হয়ে আমিই তাঁকে সময় সময় এক আধদিনের জন্যে নিয়ে যাই। তাঁর বিষয় একটু বলি,—সেবা, যত্ন সম্বন্ধে আমার

একআধটা প্রশ্নে তিনি এমন সুন্দর যুক্তিযুক্ত উত্তর দেন যে, আমি সত্যই তখন অবাক হয়ে যাই। একটা দিনের আমার প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন তা শুনুন,—আমি তাঁকে বললেম; "আচ্ছা, এতকাল ধরে' কোন বিষয়েই তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমার প্রতি ক্ষোভ বা বিরক্তি আনয়ন করতে কি করে না পেরেছ বল দেখি? সত্যই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, এত দীর্ঘদিন যাবৎ একটা মানুষ ক্রটীহীন হয়ে আর একটা মানুষকে কোন্ মহাশক্তির বলে সর্ব্বদা তৃপ্তিতে ও আনন্দে রাখতে পারে!" তিনি আমার কথা শুনে অত্যন্ত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"দেখ! আমাদের ত এই সাধনাই জন্ম-জন্মান্তর ধরে' করে আসবার জন্যে কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলে' ভগবৎ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে এবং এর মধ্যে দিয়েই ত আমাদের সব কিছুর যথার্থ পরিচয় তোমাদের ও ঈশ্বরের কাছে দেবার দায়িত্ব আছে। সংসারে আত্মীয় স্বজনের প্রতি সেবা-যত্নের যে নিয়ম পদ্ধতি আছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মনের সেবা। এই মনের সেবা যদি ঠিক মত করতে না পারা যায় তাহলে যতই কেন না আমরা তোমাদের দৈহিক সেবা যত্ন করি তাতে প্রকৃত সুখ শান্তি দান করা হবে না। ঐ বিষয়ের অভিজ্ঞতার অভাব ও ত্রুটী থাকার দরুণই অনেক সংসারে সুখ শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।"

আমি বললেম মনের সেবা কিরূপ? তিনি উত্তর দিলেন,—"স্বামীর কথাই সর্ব্বাগ্রে বলি,—মনের সেবা অর্থে প্রধানতঃ এই গুলি যথা,—তিনি যে কাজে ও যে সাধনায় ব্রতী থাকেন সেই বিষয়ে স্ত্রীকেও অনেকখানি অভিজ্ঞতা ও বোধশক্তি সঞ্চয় করতে হবে। এছাড়া স্বামী কোন্ কোন্ বিষয় পছন্দ করেন ও করেন না, সেইগুলি বুঝে নিয়ে সেই মত ধারায় চলতে হবে এবং যে যে বিষয়ে তাঁর বংশগত

ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও ধর্ম্মাদির নিয়ম আছে সে গুলিকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রক্ষা করে চলবার জন্যে চেষ্টা ও সাধনা করে যেতে হবে। আর কোন্ কোন্ বিষয়ে সহায়তা করলে তাঁর মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকবে এবং সকল কর্ম্মে তাঁকে উৎসাহিত করবে সেগুলিও বুঝে নিতে হবে। এই সমস্ত বিষয়ে বোধশক্তি নিয়ে সংসারে চলবার চেষ্টা করলেই আমি মনে করি যথার্থভাবে দায়িত্ব পালন করে' শান্তি ও তৃপ্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা হবে। ইহাকেই আমার বুদ্ধিতে মনের সেবা বলে ; যা আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় জিনিষ। নচেৎ রান্না বান্না, খাওয়ান ইত্যাদি এ সব ত পয়সা থাকলে ঝি, চাকর, রাঁধুনিতেও করে যেতে পারে ; আমাদের তাহলে বৈশিষ্ট্য কি রইল ? আমিই কি এরূপ সেবার যথার্থ যোগ্যা হতে পেরেছি। তবে কেবল মন-প্রাণ দিয়ে সাধনা করে যাই মাত্র ; আর তুমিও তোমার উদার প্রাণ নিয়ে আমাকে ধন্য করে রেখেছ, তাই আমার সব কাজই তোমার ভাল লাগে। যাই হ'ক মোটের উপর 'আমাদের মন ও চিত্তকে সর্ব্বদা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে নিষ্কাম ভাবে সকলের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করে গেলে তবেই নিজের যথার্থ তৃপ্তি ও শান্তি পাওয়া হবে এবং অন্যকেও তা দিতে পারা যাবে।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া গুরুদেবের পত্নীর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সন্ন্যাসীজী গুরুদেবকে বলিলেন,—গুরুমায়ের মত এরূপ শিক্ষা, বিচার ও বুদ্ধি নিয়ে চললে সংসার সত্যই সুখের হয়। আপনি এদিক দিয়ে খুবই ভাগ্যবান মনে করি। অবশ্য আপনার মত আদর্শ মানুষ না হলে তাঁদের পক্ষে যথাযথ কর্ত্তব্য পালন সম্ভব হতে পারে কিনা জানি না।

জমীদারমহাশয় ইহার উত্তরে সন্ন্যাসীজীকে বলিলেন,—আপনার

মন্তব্য খুবই সত্য। তবে শেষের কথাগুলির সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলবার আছে,—সর্ব্বশক্তিরূপা-নারী জাতিরা যদি তাঁদের কর্ত্তব্য ঠিক মত পালন করে' যেতে পারেন তাহলে পুরুষদের কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী এবং সমস্ত পবিত্রশক্তির ক্ষয় হতে পারে না, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। যেমন দৃষ্টান্ত বৌঠাকরুণ ও গুরুদেব।

গুরুদেব সঙ্কোচ সহকারে বলিলেন,—আমাকে কেন আপনারা জড়াচ্ছেন। আমার সমস্ত কিছু শক্তিকে রক্ষা করে আছেন উনিই। তাঁর কাছে উৎসাহ, ধৈর্য্য, বল ইত্যাদি গুণগুলির প্রেরণা ও শক্তি যদি পেয়ে না আসতেম তাহলে আমি বোধ হয় এতদিনে ভেঙ্গে পড়তেম; কোন কাজেই ইচ্ছা বলে কিছু থাকত না। সত্যই এদিক দিয়ে আমি খুবই ভাগ্যবান। জমীদার ভায়ার শেষের উক্তির অভিজ্ঞতা আমার যথার্থভাবে লাভ হয়ে আছে।

ইহার পর কিছুক্ষণ অন্যান্য কথা বলিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ গুরুদেবকে বলিলেন,—আশ্রম তৈরি হয়ে গেলেই আমরা এসে আপনাদের নিয়ে যাব। আশ্রম পরিচালনার জন্যে সুনির্দ্দিষ্ট উপদেশ প্রদানের ভার এবং মহিলা বিভাগের শিক্ষা ও সমস্ত কিছুর দায়িত্ব আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।

গুরুদেব সাগ্রহে ও আনন্দের সহিত বলিলেন,—আমি আমার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দিয়ে যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আশ্রম আমার প্রাণ-স্বরূপ হয়ে থাকবে। আপনাদের মত ব্যক্তিদের বুদ্ধি ও বল-ভরসার সাহায্য থাকলে কোন মানুষের পক্ষেই কোন কিছু করা কষ্টকর বলে মনে হবে না।

এই কথা সমাপ্তির পরে সন্ন্যাসীজী ও জমীদারমহাশয়, গুরুদেব ও গুরুপত্নীকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

গুরুদেব বলিলেন,—সারা জীবনের মধ্যে আজকার দিনটিই সত্যকারের দিন বলে মনে হ'ল।

সাবিত্রীদেবী গুরুমার চরণে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সজল নয়নে বলিলেন, মা, তবে আসি!

গুরুপত্নী তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া মুখের চুম্বন লইয়া বলিলেন,—একা ভারতীকুমারের অভাব সর্ব্বদা অনুভব করে আসছি; তার উপর আজ হতে তোমার অভাবও সর্ব্বদা মনে হতে থাকবে।

সাবিত্রীদেবী তাহার পর বৈঠকখানায় আসিয়া গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে বিদায় চাহিলেন।

গুরুদেব পরম প্রীতি ও স্নেহের সহিত সাবিত্রীদেবীর মস্তকে হাত বুলাইয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন! তাহার পর সকলে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। গুরুপত্নী, গুরুদেব ও সঙ্গীতসাধক রাস্তার উপর কতকদূর অগ্রসর হইয়া শেষে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখা যাইল ততক্ষণ তাঁহারা একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

গুরুদেবপত্নী বলিলেন,—জমীদারমহাশয় ও সন্ন্যাসীমহারাজের কথা ছেড়েই দি, কিন্তু অত বড় জমীদারের একমাত্র পরমাসুন্দরী-গুণবতী কন্যা হয়ে যে অতি সাধারণ মানুষের মত এত ভাল হতে পারে, এ আমার ধারণাই ছিল না।

গুরুদেব বলিলেন,—অত বড় পণ্ডিত বংশে জন্মে পরম আদরে লালিত-পালিত হয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করে কোন নারী যে এমন ভাবে দুঃখ কষ্টকে বরণ ও সকলকে স্নেহাদরের সহিত যত্ন ও সেবা করাকে ব্রতরূপে গ্রহণ করে নিতে পারে বলে আমারও ধারণা ছিল না।

গুরুপত্নী ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন,—তোমার কি এ ছাড়া আর কোন কথা নেই। আমি একটা কত বড় আশ্চর্য্যের কথা বল্‌লেম; না, তুমি অম্‌নি একটা তুচ্ছ কথার সঙ্গে তুলনা দিয়ে অত বড় গুরুত্বটাকে খেলো করে দিতে গেলে!

গুরুদেব বলিলেন,—আমি কি ইচ্ছে করে বলি, বেরিয়ে পড়ে ত কি করব!—ও কথাটা না বলবার অভ্যেস আমি কোনদিনই করতে পারলেম না, আর পারবও না; এ জন্যে আমার তোমার কাছে বকুনি খাওয়া চিরকালই যেন ভাগ্যে থাকে। এই বলিয়া পত্নীর দিকে গুরুদেব ভয়চকিত দৃষ্টি হানিতে হানিতে মুখে হাসি চাপিয়া গৃহমধ্যে পলাইয়া গেলেন।

সঙ্গীতসাধক তাঁহার গুরুমাকে বলিলেন,—মা, আপনি যেরূপ সাবিত্রীদেবীকে দেখে হয়ে পড়েছেন তাতে ভয় হচ্ছে পাছে আমার একাধিপত্যের স্থানে আবার একজন না অংশীদার হয়ে পড়ে।

গুরুপত্নী বলিলেন,—বাবা তোকে পেয়ে আমার সে স্থানটা এত বেড়ে গেছে যে, এক আধ জনকে ঠাঁই দিলে তোর কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই এ জন্যে তোর কিছু মাত্র ভয় নেই।

এই বলিয়া সাধকের মস্তকে আদরের সহিত হাত রাখিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

একদিন লক্ষ্মী শেষ রাত্রে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল। সে স্বপ্নেতে দেখিল যেন কোন্ এক দুর্গম পার্ব্বত্যময় স্থানে দ্রুতপদে হাঁটিয়া চলিয়াছে তাহার প্রার্থীত বস্তুকে পাইবার জন্য। পর্ব্বতের শিখর দেশে চলিতে চলিতে একস্থানে উপনীত হইয়া দেখিল তাহার গন্তব্য পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন সে পথ পাইবার জন্য ভগবানকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই সময় জটাজুটধারী এক সাধু তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"মা তুই পথ খুঁজে পাচ্ছিস্ না? আমার হাত ধর, আমি তোকে গন্তব্য স্থানের পথ দেখিয়ে দিই।" এই বলিয়া সাধু লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, সম্মুখের পর্ব্বতের উপর ধূলি-ধুসরবর্ণ, রুক্ষবেশ, অতি-শীর্ণকায় একটি পুরুষ তাহাদের দিকে পশ্চাৎ করিয়া সেই চূড়ায় আরোহণ করিতেছে। ইহা দৃষ্টে সাধু লক্ষ্মীকে বলিলেন,—"মা ঐ দেখ্ তোর স্বামী তোর খোঁজে চলে যাচ্ছে, পারিস্ ত এ সময় তুই তাকে ধর্, নচেৎ আর পাবি না" এই কথা বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। লক্ষ্মী তখন প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল ধরিবার জন্য। এক এক সময় তাহার মনে হইল যেন সে পাখীদের মত হাত নাড়িয়া আস্মানে উড়িয়া যাইতেছে। এইরকম ভাবে যখন সে সেই পর্ব্বতশীর্ষে উপনীত হইল তখন দেখিল সেই মূর্ত্তিটি অনেকখানি নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী তখন চীৎকার করিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করিল কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বর বাহির হইল না। তখন তাহাকে ধরিবার জন্য সেইস্থান হইতে গড়াইয়া পড়িল কিন্তু ধরিতে পারিল না। মূর্ত্তিটির কণ্ঠ হইতে কেবল তাহার নামের

ডাক বহুদূর হইতে শুনিতে পাইল মাত্র। লক্ষ্মীরও সেই সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেই অবধি সমানে স্থিরভাবে বসিয়া স্বপ্নের ভীষণ ঘটনা স্মরণ করিতে করিতে ভয়ে ও চিন্তায় কাঁপিতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছিল। লক্ষ্মীর পার্শ্বের শয্যা হইতে উঠিয়া বৈষ্ণব গৃহিণী তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত ভয়াকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা! তোর কি হয়েছে শীগ্‌গীর্ আমাকে বল্? তোর চেহারা দেখে আমি বড় ভয় পেয়ে গেছি।

লক্ষ্মী তখন রোদনযুক্ত স্বরে এবং ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আনুপূর্ব্বিক স্বপ্নের ঘটনা বিবৃত করিল।

বৈষ্ণবগৃহিণী শুনিয়া মনে মনে আশঙ্কাযুক্তা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ভগবান একি আবার লক্ষ্মীর ভাগ্যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিলেন। মেয়েটাকে কি তিনি সীতার মত জনম দুঃখিনী করিয়া পাঠাইয়াছেন!" মনের এই চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীকে ক্রোড়ের কাছে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—মা তুই অমন বুদ্ধিমতী ও কৃষ্ণপ্রেমিকা হয়ে স্বপ্নের ঐ অলীক ঘটনাতে এত কাতর হচ্ছিস্ কেন? দেখ্ মা, ওঁর কাছে এই কথাই সর্ব্বদা শুনে আসছি যে, স্বপ্ন এবং জাগ্রত এ দুটোর কোনটাই সত্য নয়; সত্য কেবল সেই পরব্রহ্মশ্রীহরিনারায়ণ। তাঁকে চিন্তা করলে আর কোন চিন্তাই থাকে না। তুইত মা তাঁকে সর্ব্বদাই ধ্যান করছিস্, তবে কেন আজ তোর এরূপ অলীক ভাবান্তর উপস্থিত হল?

লক্ষ্মী বলিল,—কি যেন জানিনা মা, স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবার পর থেকে আমাকে যেন কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আজ যেন মনে হচ্ছে আমার সব সাধনা ও কর্ত্তব্যের মধ্যে একটা ভীষণ ফাঁক থেকে গেছে। সত্যই আজ আমি আমার সমস্ত ভাবসত্তা হারিয়ে ফেলেছি। সেই শীর্ণ-কঙ্কালদেহ বিশিষ্ট চেহারাখানিই সর্ব্বদা মনে পড়ছে এবং কেবলই অন্তর

হতে কে বলছে যেন, "তোর ঠিক পথ ধরা হয়নি ; দেখ্! সত্যকারের প্রেমের পথ ধরে বহু দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে' তোকে পাবার জন্যে তোর স্বামী জীবন পর্য্যন্ত দান করল ; আর তুই কিনা নিজ স্বার্থের দিকেই তাকিয়ে কাটাতে লাগলি।" মা আমি একি করলাম্!

এই বলিয়া লক্ষ্মী বৈষ্ণবগৃহিণীর কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

* * * *

বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় বাউল ঠাকুর হন্তদন্ত হইয়া বৈষ্ণব-বাবাজীর দরজায় তাঁহার নাম ধরিয়া উপর্য্যুপরি ডাকিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণববাবাজী তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাউলঠাকুরকে দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে বলিলেন,—কি হয়েছে দাদা ? এমন ভাবে ঘন ঘন কেন ডাক, এবং তার সঙ্গে তোমার মুখ এত চিন্তাকুলই বা কেন দেখছি বলত ? সকাল থেকে আজ লক্ষ্মীমাকে নিয়ে ভীষণ দুঃখে আছি, তার উপর তোমার মুখ দেখে যেন একটা ভীষণ কিছুর আশঙ্কা দেখতে পাচ্ছি। এস, ঘরের ভিতরে এসে বল কি হয়েছে।

বাউলঠাকুর বলিলেন,—আমি ক'দিন নানাস্থানে ঘুরে আজ কিছুক্ষণ আগে যখন এই সহরের সম্মুখবর্ত্তী হলেম তখন হঠাৎ আমার নজর্ পড়ল একটি গাছতলায় শুয়ে থাকা মানুষের উপর। তার কাছে গিয়ে দেখলেম যে, লোকটির বয়েস বেশী হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই তার দেহের সমস্ত কোমল চিহ্ন শুকিয়ে গিয়ে কঙ্কালসার করে দিয়েছে। মাথার বড় বড় চুল তেল অভাবে জট্ পাকিয়ে গেছে, গায়ে খড়ি উড়ছে। দেখেই বুঝতে পারলেম যে, বহুদিন অনাহারে ও ভাবনার মধ্যে থেকে মানুষের

যেমন চেহারা হয় ঠিক তেম্‌নি। তীক্ষ্ণ নাসিকার, কোটরগতসুবিস্তৃত-চক্ষুর এবং চিবুকের গড়ন দেখে মনে হল এক সময় লোকটির চেহারা অতি সুন্দর ছিল। তারপর আমি তার মুখের কাছে গিয়ে ডাক দিলেম, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পেলেম না। তখন গায়ে হাত দিয়ে দেখি আগুনের মত উত্তাপ। একটু পরে অজ্ঞান অবস্থার ঘোরে তার মুখে যে সব কথা শুন্‌লেম তাতে করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, আমার লক্ষ্মী-মায়ের সেই হারাণ মাণিক ছাড়া এ আর অন্য কেউ নয়। তখন এলেম ছুটে তোমাদের খবর দিতে।

বাউলঠাকুর আসিবা মাত্র লক্ষ্মী তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সমস্ত কথা শুনিবা মাত্র পাগলিনীর মত আলু থালু বেশে গৃহ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল এবং বলিতে লাগিল,—ওগো তুমি চলে যেও না, দাঁড়াও আমি যাচ্ছি! তুমি আমার জন্যে প্রাণ দিতে চললে আর আমি তোমার জন্যে কিছুই দিতে পারলেম না; হে ভগবান ক্ষমা কর! রক্ষা কর!! স্বপ্ন সত্য কর না!!!

বৈষ্ণববাবাজী, তাঁহার পত্নী ও বাউলঠাকুর লক্ষ্মীর পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়াইলেন। লক্ষ্মীর কাছে আজ যেন সেই স্থানে পৌছিবার পথ সমস্ত জানা হইয়া গেল। ঝড়ের মত বেগে লক্ষ্মী সেই গাছতলার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিয়াই চিনিয়া লইল তাহার স্বামী বলিয়া। তাহার পর সে সেই দেহটির মুখের উপর জ্ঞানশূন্যের মত অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। বৈষ্ণববাবাজী প্রভৃতি তখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্মীর সেই ভীষণ মূর্ত্তিসহ ঈষৎ ঋজুভাবে দাঁড়ান অবস্থার চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহাদেরও যেন তখন কোনরূপ বুদ্ধিশক্তি নাই, এইরূপ মনের অবস্থা হইয়া গিয়াছে।

মাণিক কিছুক্ষণ পরে বিকারের ঘোরেই বলিয়া যাইতে লাগিল,—

"লক্ষ্মী! আমার লক্ষ্মী এলে কি আমার শত অপরাধ ক্ষমা করে'? ভগবান! আমি তোমাকে আমার লক্ষ্মীর দর্শন পাবার জন্য দিনরাত ডেকেছি, দাও প্রভু দয়াময় একটিবার অন্ততঃ যাবার সময় তার মুখ দর্শন করতে! তোমার কাছে আমার আর কোন কামনা নাই। দয়ালদাদা লক্ষ্মীর জন্য প্রায় পাগল হয়ে গেছেন, তার জন্য তাঁর শিশুর মত কান্না দেখে আমি যে প্রভু বড় জোর গলায় বলে এসেছিলাম যে, লক্ষ্মীকে আমি তোমার কাছে নিয়ে আসবই; আমার কোন বাসনাই পূর্ণ হ'ল না। আমি তোমার চরণে এত কি অপরাধ করেছিলাম যে তুমি মার্জ্জনার অতীত মনে করে রইলে প্রভু!"

এই কথাগুলি বলিয়া মাণিকের খুব জোরে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। লক্ষ্মী এতক্ষণ যেন পাষাণ মূর্ত্তির মত হইয়া কথাগুলা শুনিতেছিল। যাই কথা থামিয়া যাইল ওম্‌নি চীৎকার করিয়া মাণিকের উপর পড়িয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল,—ওগো! এই দেখ আমি এসেছি তোমার হতভাগিনী লক্ষ্মী, একবার চোখ চাও! তুমি আমাকে এত ভালবেসেছিলে যে জীবন পর্য্যন্ত দিতে বসলে! আমি কি করে এ সহ্য করব বল? ভগবান তুমি আমাকে এরূপ চরম শাস্তি দিও না প্রভু!

এই বলিয়া লক্ষ্মী মাণিকের দেহটি নিজের ক্রোড়ের উপর লইয়া বসিল। ঠিক যেন তখন মনে হইল বেহুলাদেবী লখীন্দরের শবদেহ বক্ষে লইয়া ভেলার উপর বসিয়া ভাসিয়া যাইতেছেন। লক্ষ্মী আবার বলিতে লাগিল,—নারায়ণ! আমাকে বল্ দাও, শক্তি দাও, পথ দেখিয়ে দাও আমি কি করব!

এই রকম ভাবে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে লক্ষ্মী দেখিতে পাইল মাণিকের যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে। একটু পরে মাণিক চক্ষু মেলিয়া আকুল ভাবে ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি কি আমার সেই

লক্ষ্মীদেবী! বল, বল?

লক্ষ্মী মাণিকের চিবুকের উপর চিবুক রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—ওগো! আমি তোমার প্রেমের অনুপযুক্তা সেই অভাগিনী লক্ষ্মী।

মাণিক অতি কষ্টে লক্ষ্মীর মুখে শুষ্ক অস্থিসদৃশ হাতখানি ঠেকাইয়া বলিল,—তুমি এমন কথা বল না, তোমার তপস্যার জোরে আমি যেদিন হতে নূতন জীবন পেয়ে নূতন মানুষ হতে পেরেছিলাম সেই দিন হতে এ জীবন, মন, সবই তোমার কাছেই ছিল এবং এখনও তাই রইল; দেহটাই কেবল থাকবে না। ভগবান শেষ সময়ে আমার আশা পূর্ণ করেছেন; আর আমার কোন দুঃখ নাই। যদি আবার কখনও মানুষ হয়ে জন্মাই তাহলে তোমার প্রেমেরই চিরকাল পূজা করে যাব। আমার জন্য দুঃখ কর' না। লক্ষ্মী—দেবী আমার! তুমি 'তাঁর' চরণে মন প্রাণ রেখে শান্তিলাভ কর এই প্রার্থনাই জানাচ্ছি। তাঁর মধ্যেই তুমি সব পাবে।

এই কথাগুলি অনেক কষ্টে প্রাণপণ শক্তিতে বলিয়া ফেলিয়াই মাণিকের ভীষণ শ্বাস উত্থিত হইতে লাগিল। অতি দূর হইতে যেন একটি ক্ষীণ কণ্ঠের ধ্বনি সকলের কর্ণে আসিল,—আ-মি-চ-ল্লা-ম ল-ক্ষ্মী-দে-বী আমা-র, ধ্যা-ন আমা-র, তু-মি যাঁ-কে চিনে-ছ তি-নি-তো-মা-য় শা-ন্তি দি-ন।"

এই কয়টি কথার পরই লক্ষ্মীর কোলে মাণিকের মস্তকটি ঢলিয়া পড়িল। লক্ষ্মীর তখন আর কোন বাহ্য-জ্ঞান নাই। সে যেন দেখিতে পাইল সম্মুখে ভীষণ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে;—তাহার পরক্ষণেই আবার দেখিল, সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ সূর্য্যের কিরণ ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাহার মধ্যস্থলে চতুর্ভুজধারী নারায়ণ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই দিকে তাহার স্বামী যেন আস্তে আস্তে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মিলাইয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

এদিকে আশ্রম তৈয়ারীর কার্য্য অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর মাস খানেকের মধ্যেই উহার সমস্ত কার্য্য সমাধা হইয়া যাইবে, এইরূপই সকলে মনে করিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ প্রত্যেক প্রদেশের রাজ্যপাল, প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা-সচিব প্রভৃতি বড় বড় প্রধান ব্যক্তিদিগকে সবিস্তারে আশ্রমের বিষয় ও উদ্দেশ্য লিখিতভাবে জানাইলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই উক্ত বড় বড় ব্যক্তিদের নিকট হইতে উৎসাহ ও পরম আগ্রহসূচক উত্তর পাইলেন, এবং তাঁহারা সকলে ইহাও লিখিয়া-ছেন যে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানকে জানাইয়াছি সংখ্যানুপাতে নিজ প্রদেশের মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রী আশ্রমে শিক্ষার নিমিত্ত ভর্ত্তি হইবার জন্য।" তাঁহারা পরিশেষে লিখিয়াছেন,—"আশ্রমে শিক্ষা আরম্ভ হইলে পর উহা জানিতে পাইবা মাত্র যথা শীঘ্র আশ্রম দর্শন করিতে আসিবেন।" সন্ন্যাসীমহারাজ এই সমস্ত উত্তর পাইয়া আনন্দান্তঃকরণে জমীদারমহাশয় ও গুরুদেবকে ঐ সংবাদ পত্রের দ্বারা জানাইলেন এবং এই সংবাদ প্রদান করিতে সঙ্গীতসাধকের নিকট গমন করিলেন।

সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শক্তিরাণী সাধকজীর সামনে নূতন শিক্ষা করা একটি 'যোগিয়া' রাগের দ্রুতঅঙ্গের খেয়াল গাইতেছেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ সেইখানে দাঁড়াইয়া শক্তিরাণীর সুধাকণ্ঠের গীত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "কি অপূর্ব্ব সাধনা! গানের মধ্যে তানের লহরী চলিতেছে যেন অমৃতের স্রোত বহিয়া গিয়া সেই পরম স্থানের চরণতটে লুটাইয়া পড়িতেছে।"

গানটি থামিয়া যাইবার একটু পরেই সন্ন্যাসীমহারাজ সাধকজীর সমীপে উপস্থিত হইবা মাত্র তাঁহারা উঠিয়া সশ্রদ্ধ আহ্বান জানাইয়া সন্ন্যাসীজীকে সমাদরে কাছে বসাইলেন। সন্ন্যাসীমহারাজ রৌদ্রে ঘামিয়া গিয়াছেন দেখিয়া শক্তিরাণী তাড়াতাড়ি তালপত্রের বীজনি আনিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীজী ত্রস্তযুক্ত হইয়া বলিলেন,—থাক্ থাক্ মা তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। এই বলিয়া পাখাটি হাতে করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন এবং পরে বলিলেন,—তুমি সঙ্গীতের যে স্থানে উপনীত হয়েছ, সেই উচ্চস্থান হ'তে তোমার কাছে আমার সেবা নেওয়া উচিত হয় না।

শক্তিরাণী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল এবং হাতজোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল,—এ আপনি কি কথা বলছেন! কত সৌভাগ্য হলে তবে আপনাদের মত ব্যক্তিদের সেবা করতে পাওয়া যায়। আপনি সঙ্গীতের ভাব সমুদ্রে ডুবে থাকেন তাই আমার মত তুচ্ছ শৈবালকেও রত্নবলে ভ্রম কচ্ছেন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন সঙ্গীতের মাহাত্ম্য ও অধ্যাত্মধর্ম্ম যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

সন্ন্যাসীজী শক্তিরাণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া খুব খুসী হইলেন, এবং মনে মনে কহিলেন,—"সত্যই নিজেকে এমনি ভাবে তৃণবৎ না ভাবিতে শিখিলে কি কেহ বিদ্যার ও সাধনার উচ্চশিখরে উঠিতে পারে!"

সঙ্গীতসাধক সন্ন্যাসীজীকে কহিলেন,—আজ এ সময় হঠাৎ আগমন করবেন এ আমি ভাবতেও পারিনি। আশ্রমের নির্ম্মাণ কার্য্য দেখতে এসেছেন বোধ হয়, না?

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—ঠিক তা নয়, কতকগুলি চিঠি এসেছে তাই দেখাবার জন্তেই বিশেষ করে আসা। এসে দু কাজই হয়ে গেল। শক্তিরাণীদেবীর একক গান আজ ভাগ্যগুণে শোনা হয়ে গেল।

এই কথা বলিয়া চিঠি পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর আশ্রম বিষয়ক দুই চারিটি কথা যখন চলিতে লাগিল তখন সেই সময় বাউলঠাকুর কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনুমতি চাহিয়া বলিলেন,—আমি কি আপনাদের নিকট আসতে পারি?

সাধকজী অতি আহ্লাদিত হইয়া সম্বর্দ্ধনা সহযোগে ডাকিলেন,—আসুন, আসুন, বাবাজীঠাকুর! বহুকাল পরে আপনার দর্শন পেলেম।

সন্ন্যাসীমহারাজ কহিলেন,—আমি আপনার জন্যে বড় বেশী উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলেম। এতদিন আপনাকে কেন দেখতে পাইনি, কোথায় ছিলেন বলুন ত?

বাউলঠাকুর উত্তরে তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্ব্বিক লক্ষ্মীদেবীর জীবন কাহিনীর বৃত্তান্ত গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বলিয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন,—আমি লক্ষ্মীদেবীর স্বামীর মৃত্যুর দৃশ্য দেখে ভীষণ দুঃখে আহত হয়ে বিচলিত মনের শান্তিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আবার শ্রীবৃন্দাবনে চলে যাই। সেখানে কিছুদিন থেকে মনটাকে সুস্থ ক'রে নিয়ে আজ ফিরে এসে আপনাকে দর্শন করবার জন্যে মঠে গিয়ে শুনলেম আপনি বাবুজীর আশ্রমে এসেছেন। তাই না শুনে ছুটে এলেম এখানে দেবদেবীর একত্র সমাবেশ দর্শন করতে।

সন্ন্যাসীমহারাজ শেষের ঐ কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—সত্যই দেখছি, আপনার মনের অবস্থা এখনও স্বাভাবিক হয়নি, তাই সাধারণ মানুষকে ভাবের ঘোরে দেবতা বানিয়ে দিলেন।

বাউলঠাকুর উত্তরে বলিলেন,—কি বলব মহারাজজী! কিছুদিন হতে সেই দেবীরূপা লক্ষ্মী মেয়েটি ও তার স্বামীর চরিত্র আমাকে যেন কি করে দিয়েচে! আপনাদের ত কথাই নেই, আজকাল মানুষকে দেখলে আর মনে করতে পারি না যে ইনি দেবত্বের অধিকার না লাভ করতে পারেন।

আমার মন ও চোখ যেন ঐ রকমই কি এক হয়ে গেছে।

ইঁহারা সকলে বাউলঠাকুরের কাছে লক্ষ্মীদেবীর ও মাণিকের বৃত্তান্ত সমস্ত শুনিয়া অতুলনীয় আদর্শ চরিত্রের মহিমায় আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং সেই মেয়েটির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। মেয়েটির বিবরণ শুনিবার সময় হইতে শক্তিরাণীর ভাবে ও দুঃখে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শেষের বর্ণিত দৃশ্যে সে যেন আরও বেশী করিয়া বিস্ময়ে ও ব্যথায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আমি এই মেয়েটির বিষয় শাখামঠের এক কর্ম্মীর পত্রে বহুদিন পূর্ব্বে জেনেছিলেম, কিন্তু তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে এমন দুটি পুরুষ নারী বর্ত্তমান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে পারে। সত্যই আমাদের দেশের মাটির এমনি গুণ যে আদর্শ মানুষের সৃষ্টির অভাব কোন দিনই হয়নি। তাহার পর বাউলঠাকুরকে বলিলেন,—আমি ঐ মেয়েটির কাছে যাব, আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।

বাউলঠাকুর বলিলেন,—বেশত, আপনি যখনই যেতে চাইবেন আমি প্রস্তুত রইলেম।

সাধকজী বাউলঠাকুরকে কহিলেন,—আপনার কাছে আজ এক অপূর্ব্ব ও দুঃখজনক কাহিনী শুনে মনটা বড়ই উদ্বেলিত হয়ে পড়ল। এ সময় আপনি দয়া করে একটা দেহতত্ত্বের গান শুনিয়ে তৃপ্ত করুন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—সত্যই আপনার গানই এ সময় শোনার আবশ্যক।

বাউলঠাকুর চক্ষুমুদ্রিত করিয়া যে গানটি আশাভৈরবী সুরে গাহিলেন, তাহার কথাগুলি এইরূপ,—

"আমি আমি করি বুঝিতে না পারি কে আমি আমাতে আছে কি রতন,

কার শক্তিবলে বেড়াই চলে বুলে, কার অভাবে দেহ হবেরে পতন।
দেহেরি মধ্যেতে প্রাণের সঞ্চার, তাহাতেই বলি আমি বা আমার,
প্রাণ ছেড়ে গেলে হবে শবাকার, কেবা কার কোথা রবে ধন জন।
প্রাণেরি চাঞ্চল্যে জীব ভাব ঘটে, চঞ্চলতা গেলে সকল আশা মেটে'
স্থিতি হলে ঘটে দেখ চিত্ত পটে আঁকা আছেন বাঁকা মদনমোহন॥"

সন্ন্যাসীজী গানটি শুনিয়া বলিলেন,—মস্তবড় জ্ঞানীসাধকের এটা রচনা। এসব গান শুনলে সত্যই ভিতরের দ্বার অনেক খানি খুলে যায়। ভগবান কৃপা করুন যেন আবার আমাদের জাতির এই সমস্ত জ্ঞান ও কল্যাণময় সঙ্গীত শোনবার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ বৃদ্ধি হয়।

বাউলঠাকুর বলিলেন,—একটা মজার কথা শুনুন,—এই সেদিন আসতে আসতে এক জায়গায় লোকমুখে একজন উৎপীড়ক ও অত্যাচারী জমীদারের কথা শুনে আমি তাঁর কাছে যাই, এবং অনেক অনুনয় বিনয় করে' কোন প্রকারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং আমার গান শুনতে রাজি করাই। তারপর আমি যে গানটি গেয়েছিলেম, সেটি শেষ হতেই দেখি, ভদ্রলোকের যেন মনের মধ্যে কি এক ভাবান্তর এসে গেছে। একটু পরে তিনি আমার হাত দুটো ধরে বল্লেন,—"আপনি আজ আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিলেন। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমার যা কিছু ধন রত্ন আছে তা আজ থেকে মানবকল্যাণের জন্যে উৎসর্গ করলেম। আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁর কৃপা লাভ করতে পারি।"

শক্তিরাণী মহারাজজীকে বলিল,—বাউলঠাকুরমহাশয় কোন্ গানটি গেয়েছিলেন, সেটি একবার গাইতে বলুন না!

বাউলঠাকুর শক্তিরাণীর কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—শোনাচ্ছি মা! এই বলিয়া জৌনপুরী রাগে নিম্নোক্ত গানটী গাহিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সাড়ে তিন হাত জমী পেয়ে করিস্ রে তুই বাদশাগিরি,
ওরে, এক পলকের ভরসা নেই তোর তবু দেখাস বাহাদুরি।
খাজনা করা বসত বাড়ী, যতই করিস ছল চাতুরী
ওরে, বাকী খাজনায় ডিগ্রী হবে জমি নিবে নিলাম করি।
অহঙ্কারে হয়ে মত্ত দেখছিস ধরা শরার মত
যখন, পড়বে মাথায় কালের দণ্ড খাটবে না তোর জারিজুরি।
আপন দোষে করিস অন্ধ, খুঁজে বেড়াস পরের মন্দ,
তত্ত্ব কথা বড়ই তিক্ত খোসামোদে প্রিয় ভারি।
তাই বলি মন সম্‌ঝেরে চল, তাঁর নাম নিয়ে সম্বল,
ভয় ভাবনা থাকবে না তোর মনে প্রাণে জপলে 'হরি'॥"

গানটী শেষ হইয়া যাইবার পর সঙ্গীতসাধক বলিলেন,—সত্যই এসব গান শুনলে অচেতন মানুষদের চেতন ফিরে আসতে দেরি হয় না।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আজ তাহলে এখন উঠি। আমি কাল সেই মেয়েটির কাছে বাউলঠাকুরের সঙ্গে যাব।

শক্তিরাণী বলিল,—মহারাজজী আমরা তাঁর দর্শন পাব না?

সন্ন্যাসীজী বলিলেন,—তাঁর কৃপায় ঠিক সময়ই দেখা সাক্ষাত হবে মা। এই বলিয়া বাউলঠাকুরের সহিত কুটির হইতে বহির্গত হইলেন।

মঠে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীজীর মনে হইল এমন একটা অপূর্ব্ব সংবাদ জমীদারমহাশয়কে জানান আবশ্যক। তখন তিনি একখানি পত্রে লক্ষ্মীদেবীর বিষয় বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া মঠের একজন কর্ম্মীকে দিয়া সেইখানে পাঠাইলেন। পরে বাউলঠাকুরকে বলিলেন,—আপনি আজ এইখানেই থাকুন, কাল আমরা গন্তব্য স্থানে রওনা হব। এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি পত্র লিখিতে

বসিলেন বিশেষ বিশেষ স্থানে পাঠাইবার জন্য।

কয়েকদিন পূর্ব্বে দেশের সমস্ত সংবাদ পত্রে এই সঙ্গীতাশ্রমের বিষয় বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং তাহাতে সারা ভারতেই বেশ একটা ঔৎসুক্য ভাব আসিয়া গিয়াছে।

সেইদিনই রাত্রে সন্ন্যাসীমহারাজের প্রেরিত লোকটি রায়গঞ্জ সহর হইতে ফিরিয়া জমীদারমহাশয়ের লিখিত পত্রখানি সন্ন্যাসীজীর হস্তে প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসীজী উহা পাঠ করিয়া বাউলঠাকুরকে বলিলেন,—জমীদারমহাশয় তাঁর কন্যাকে নিয়ে কাল প্রাতঃকালে এখানে আসবেন এবং তাঁরাও আমাদের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর কাছে যাবেন।

তৎপর দিবস বেলা প্রায় আটটা নাগাইদ মোটরে করিয়া জমীদার-মহাশয় ও সাবিত্রীদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীমহারাজ ও বাউলঠাকুর তৎপূর্ব্বেই স্নানাদি সারিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—আমরা আর বিলম্ব করব না, আপনারা গাড়ীতে উঠে পড়ুন, সেখানে পৌঁছবার জন্যে আমাদের প্রায় পঞ্চাশ মাইল রাস্তা যেতে হবে। চালক চালিত মোটরটি তখন সকলকে লইয়া দ্রুতবেগে দৌড়াইল এবং বেলা প্রায় দশটার সময় সেই সহরে বৈষ্ণব-বাবাজীর গৃহের কিছুদূরে বড় রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। মোটর হইতে সকলে নামিয়া অগ্রবর্ত্তি বাউলঠাকুরকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

বাউলঠাকুর বৈষ্ণববাবাজীর গৃহের দ্বারে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিবা মাত্র তিনি দরজা খুলিয়া আগন্তুকদের দেখিয়া বলিলেন,—বাউল দাদা! আজ আমার এ—কি সৌভাগ্য ঘটালে? এসব দেব ও দেবকন্যার মত এবং মহাত্মা বিশেষ সন্ন্যাসী, এঁরা কে ভাই?

বাউলঠাকুর ইঁহাদের সংক্ষেপে পরিচয় দিবা মাত্র বৈষ্ণববাবাজী সকলকে করজোড়ে শ্রদ্ধাযুক্ত নমস্কার জানাইয়া পরম সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে

লইয়া গেলেন এবং গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন শীঘ্র মধ্যে অতিথি-দের বসিবার আসন প্রদান করিবার জন্ম।

বৈষ্ণবগৃহিণী তাড়াতাড়ি কম্বলাসন আনিয়া গৃহের দাওয়ায় বিছাইয়া দিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে তাঁহাদিগকে নমস্কার জানাইয়া সাবিত্রীদেবীকে পরম স্নেহভরে হস্তের দ্বারা ক্রোড়ের কাছে জড়াইয়া গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার চিবুকের চুম্বন লইয়া বলিলেন,—আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, এতগুলি অমূল্য রত্ন এই গরীবদের গৃহে সমাবেশ হল। আমার লক্ষ্মী মা অনেকক্ষণ পূজায় বসেছে, এক্ষুণি তার সারা হবে, চল মা তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই।

পূজার ঘরে সাবিত্রীদেবী যখন লক্ষ্মীর পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন তখন তিনি ঠাকুরপ্রণাম করিতেছিলেন। প্রণাম সারিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিতেই সম্মুখে সাবিত্রীদেবীকে দেখিয়া চমকাইয়া গেলেন। সাবিত্রী-দেবীও জ্যোতিস্বরূপা লক্ষ্মীকে দেখিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাভাবে তাহার অপরূপ মূর্ত্তিখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইহাকেই বোধ হয় বলে সতীর তেজময়ীরূপ ও ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি।"

লক্ষ্মী সাবিত্রীদেবীকে দেখিয়া বলিল,—আপনি কে? হঠাৎ এখানে দেবীর মত মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হওয়ায় আমি বড়ই আশ্চর্য্য ও অবাক হয়ে গেছি।

সাবিত্রীদেবী বলিলেন,—আমি দেবীও নই বা অন্ত কিছুই নই, সামান্ত মানবী মাত্র; আপনার পূণ্যময়রূপকে দর্শন করতে এসেছি। বাউল-ঠাকুরের কাছে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আমরা স্থির থাকতে পারলেম না; তাই ছুটে এলেম পূণ্য সঞ্চয় করবার জন্তে। আমার পিতা ও সন্ন্যাসীমহারাজ এসেছেন, তাঁদের কাছে আপনি একটিবার দয়া করে চলুন।

লক্ষ্মী নিজের প্রশংসা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল,—দেবী! আপনি বোধহয় আমার বংশ পরিচয় ও আমি সমাজের কোন্ স্তরের মানুষ তা জানেন না; জানলে নিশ্চয়ই আপনার এত খানি ভুল হত না। তাই সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ এবং সভ্য মনুষ্য-সমাজের অবহেলিত ও ঘৃণিত নীচ জাতিতে আমার জন্ম। এছাড়া আর আমার সত্যকারের কোন পরিচয় ও মূল্য আছে বলে জানিনা। আপনারা যে আমার জন্য এত দূর কষ্ট করে এসেছেন তার জন্য আমি নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করছি, কিন্তু আপনাদের যে কিছুই লাভ হল না, সেইটাই আমার পক্ষে বড়ই লজ্জা ও দুঃখের কারণ হল দেবী!

এই শ্রেণীর জাতিদের প্রতি উপর স্তরের মানুষদের কিরূপ অকরুণ আচরণ ও অবিচার চলিয়া আসিতেছে তাহার বিষয় প্রত্যক্ষ করা আছে বলিয়া সাবিত্রীদেবী লক্ষ্মীর মুখে এই কথা শুনিবা মাত্র মর্ম্মে আঘাত পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এইরূপ অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মী মনে বেদনা পাইল এবং তৎক্ষণাৎ সাবিত্রীদেবীর হাত দুইটি ধরিয়া শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে বলিল,—চলুন দেবী তাঁদের দর্শন করে আসি। সাবিত্রীদেবী সম্মুখস্থ ৺নারায়ণকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পরে বৈষ্ণবগৃহিণীকে করজোড়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইলেন, তাহার পর লক্ষ্মীকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার পিতা ও সন্ন্যাসীমহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে আসিবা মাত্র লক্ষ্মীর অপরূপ সুন্দর ভাবময়ী মূর্ত্তিখানি দেখিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে তাহাকে বসিতে বলিলেন। লক্ষ্মী তাঁহাদিগকে সামান্য দূর হইতে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল। সকলে প্রণাম লইলেন বটে কিন্তু মন তাঁহাদের বেশ একটু লজ্জিত ও শঙ্কান্বিত হইল।

সন্ন্যাসীমহারাজ লক্ষ্মীকে বলিলেন,—মা! দেশ হতে তোমার বহির্গত

হওয়ার সংবাদ এবং তোমার সেই সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার অনেকখানি বিষয় জানতে পেরেছিলেম। দয়ালদাস ও তাঁর স্ত্রী তোমার জন্যে অত্যন্ত চিন্তাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছেন, এ কথাও জেনে ছিলেম; তাই বিশেষ করে তোমার সন্ধানের নিমিত্ত বহু ব্যক্তির দ্বারা চেষ্টা করিয়েও কোন খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। যাই হ'ক আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্চ্ছি,—বলত মা! অমন পরোপকারী দয়ালু তোমার সেই দাদুটিকে কোন সংবাদ দাও নি কেন?

লক্ষ্মী উত্তরে বলিল,—আমি যে বাসনা ও উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়েছিলাম তা যদি ভগবান কৃপা করে সফল করতেন তাহলে সর্ব্বাগ্রে দাদু ও দিদিমার কাছে উভয়ে যেতাম,—কিন্তু শ্রীহরির ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই আমার জীবনের স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হয়ে পড়ল বলে আর সংসারের মায়ার মধ্যে যেতে মন চাইলনা এবং এই জন্যই আমার স্থিতির সংবাদ তাঁদের জানাই নাই,—পাছে আবার তাঁদের মায়া মমতায় আমাকে ফিরে যেতে হয়—এই ভয়ে। তারপর বর্ত্তমানের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এ কয়দিন ধরে কেবল মনে হচ্ছে একবার তাঁদের দর্শন করে আসি, কিন্তু আবার আশঙ্কাও আছে, পাছে সেই জন্মভূমি আমাকে আকৃষ্ট করে' ফেলে।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—মা! দয়ালদাস ও তাঁর স্ত্রী যদি এখনও বেঁচে থাকেন তাহলে তোমার শীগ্ গীর্ একবার সেখানে তাঁদের দেখতে যাওয়া দরকার, নচেৎ তোমাকে আবার এরজন্যে ভীষণ আফ্শোস্ করতে হবে মনে করি। তাছাড়া তোমার এটাও একটা কর্ত্তব্য বলে কি মনে হয় না মা?—জান মা! কর্ত্তব্য বস্তুর বিচারে ছোট বড় নেই, এজন্যে বড় মনে করে একটিকে পাবার জন্যে যদি অন্যটিকে ছোট ভেবে ত্যাগ করা যায় তাহলে যেটির প্রতি হাত বাড়ান যায় সেটি ক্রমশঃ দূরেই সরে

যায়, সত্যকারের পাওয়া যায় না; বরং যাকে অবহেলা করে ছাড়া হয় তাকে হারানর জন্যে চিরকাল দুঃখই পেতে হয় এবং সেই অবহেলার ঋণ মানুষকে জন্মান্তরেও শোধ করে যেতে হয়। কেবল লাভের মধ্যে তার সুদের অঙ্ক বেড়ে চলে ;—এই আমার বিশ্বাস।

সন্ন্যাসীজীর কথা শুনিয়া লক্ষীর অন্তর শিহরিয়া ও চমকাইয়া উঠিল। সে বিচলিত হইয়া বৈষ্ণববাবাজীকে বলিল,—বাবা! আপনি আমাকে দাদুর কাছে পাঠিয়ে দিবার শীগ্‌গীর্ ব্যবস্থা করে দিন্।

জমীদারমহাশয় বলিলেন,—মা! তুমি আমাদের মোটরে আজই সেখানে চল আমরা তোমাকে নিয়ে যাব।

বৈষ্ণববাবাজী জমীদারমহাশয়কে বলিলেন,—আমাদেরও দয়া করে নিয়ে চলুন, মায়ের জন্মভূমি দেখে আসব; তাছাড়া মা'কে ছেড়ে আমরা এক দণ্ডও থাকতে পারব না।

সাগ্রহে জমীদারমহাশয় বলিলেন,—খুব ভাল কথা, আমি এক্ষুণি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে ফেলছি।

বৈষ্ণব বাবাজী সবিনয়ে বলিলেন,—আমার গৃহিণী আপনাদের জন্যে অতি সামান্য কিছু খাদ্য তৈরি করেছেন, আপনারা যদি দয়া করে তা গ্রহণ করেন তবে আমরা বড়ই সুখী হব।

সন্ন্যাসীমহারাজ ও জমীদারমহাশয় এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—এতো এখন আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও আনন্দের কথা।

বৈষ্ণববাবাজী তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া আনন্দান্তঃকরণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের নিকট আসিয়া আহার গ্রহণ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিতে বলিলেন। সকলে পরম তৃপ্তির সহিত বৈষ্ণবগৃহিণীর স্বহস্তে প্রস্তুত লুচি, তরকারী, মোহনভোগ ও পায়স ভোজন করিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া জমীদারমহাশয়

সন্ন্যাসীজীকে বলিলেন,—আমি একটা ট্যাক্সি আনিয়ে নিচ্ছি, আপনি সকলকে প্রস্তুত হয়ে নিতে বলুন।

এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং ট্যাক্সি জোগাড় করিয়া উহা সকলকে জানাইলেন। তখন সকলে বাহির হইয়া জমীদারমহাশয়ের গাড়ীতে বৈষ্ণববাবাজী, তাঁহার পত্নী, সাবিত্রীদেবী ও লক্ষ্মী বসিলেন এবং ট্যাক্সিতে বাউলঠাকুর প্রভৃতি বসিলেন। বেলা তিন ঘটিকার সময় দীর্ঘ গন্তব্য পথে তাঁহাদের মোটর ছুটিতে লাগিল। সাবিত্রীদেবী লক্ষ্মীকে কোলের কাছে জড়াইয়া বসিয়া রহিলেন এবং তাঁহাদের নানাবিধ আলাপের মধ্য দিয়া অত দীর্ঘ পথ কখন যে শেষ হইয়া আসিল তাহা তাঁহারা বুঝিতেই পারিলেন না। সকলে যখন সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইবার উপক্রম করিয়াছেন।

ইঁহাদের মোটরের শব্দ শুনিয়া গ্রামের সমস্ত লোক জড় হইয়া গেল। শাখামঠের কর্ম্মীটি দয়ালদাসের গৃহ হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীমহারাজকে বলিলেন,—আপনারা শীঘ্র চলুন, দয়ালদাস বোধ হয় আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না। কর্ম্মীর মুখে এই কথা শ্রবণ মাত্র লক্ষ্মী ও সাবিত্রীদেবী দয়ালদাসের গৃহাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে সন্ন্যাসীমহারাজ প্রভৃতি গ্রামের সকলে দ্রুতপদে ধাবিত হইলেন। পশ্চাতবর্ত্তী সকলে যখন দয়ালের গৃহ আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন মুমূর্ষু দয়ালদাসের মস্তকটি লক্ষ্মী ক্রোড়ে লইয়া তাহার শুষ্ক, শান্ত ও নির্ম্মল মুখটিতে অল্প অল্প করিয়া গঙ্গোদক পান করাইতেছে এবং সাবিত্রীদেবী এক হাতে পাখা করিতে করিতে অন্য হাতে দয়ালের গাত্রে হাত বুলাইতেছেন।

লক্ষ্মী বৈষ্ণববাবাজীকে বলিল,—বাবা, এ সময় আর অন্য কিছু করবার নাই, আপনি একখানি কীর্ত্তন গাহিয়া দাদুকে নাম-মহৌষধী

পার করান। ইহার বেশী আর কিছু লক্ষ্মী বলিতে পারিল না, তাহার এখন গণ্ড বহিয়া অশ্রুর ধারা দয়ালদাসের মুখের উপর পড়িতে লাগিল। বৈষ্ণববাবাজী কীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক আজ দয়ালদাসের গৃহকে পরম তীর্থ স্থান মনে করিতে লাগিল এবং দয়ালদাস যে কি রকম ব্যক্তি ছিল তাহা আজ বিশেষ করিয়া সকলে অন্তরে অনুভব করিয়া দুঃখ পাইতে লাগিল। অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিল, "সত্যই দয়ালদাস পরম উপকারী ব্যক্তি ছিল। নিজের দুঃখ কষ্টের দিকে কোন দিনই তাকায় নাই, কেবল পরের জন্যই সে সর্ব্বদা ব্যাকুল হইত। ইহার পর দয়ালদাসের অভাব গরীব দুঃখীদের কাছে ভীষণ ভাবে অনুভব হইবে।"

তৈলহীন প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে যেমন ভাবে একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তেমনি ভাবে দয়ালদাস চক্ষু মেলিয়া শেষ বারের মত চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিল।

লক্ষ্মী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল,—দাদু! দাদু, তুমিও চলে যাচ্ছ! দয়াল ডাক শুনিতে পাইয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে মুখে হাসি টানিয়া বলিল,—তুই কে রে! আমার লক্ষ্মীদিদির মত গলা মনে হচ্ছে না! তাহলে কি সত্যই এলি দিদি তোর দয়াল দাদার মরণে শান্তি দিতে! কৈ রে! তোর মুখটি আমার আরো কাছে নিয়ে আয় ভাই, একবার ভাল করে দেখে যাই। লক্ষ্মী দয়ালদাসের বুকের উপর মুখ রাখিয়া ঢলিয়া পড়িল।

দয়ালদাস অতি কষ্টে ডান হাতটি উঠাইয়া লক্ষ্মীর মাথায় রাখিয়া বলিল,—আমার মাণিকদাদা কৈ রে? তাকে দেখছি না কেন? কাঁদছিস্ ভাই! কাঁদিস না; এই ত সত্য,—আর সব মিথ্যা। তোরা বহুকাল বেঁচে থেকে কেবল মানুষের কল্যাণ করে যা ভাই; এর চেয়ে আর বড় কিছু আছে কি না তা আমি জানি না। অনেক কষ্টে এই কথা

কয়টি বলিবার পরই তাহার প্রাণ প্রদীপ নিভিয়া আসিতে লাগিল। শেষ মুহূর্ত্তে ভগবান, শ্রীহরি, গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম; এই নাম কয়টি উচ্চারণের পরই তাহার প্রাণপাখী বাসা ছাড়িয়া কোন্ এক অদৃশ্য লোকে চলিয়া গেল; নশ্বর দেহ-পিঞ্জরটি পড়িয়া রহিল। সত্যই আজ একটি দয়ালু-মানুষ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পর শীঘ্র মধ্যেই দাহাদি ক্রিয়ার ব্যবস্থা হইয়া গেল। সেই কর্ম্মীটি লক্ষ্মীকে বলিলেন,—দয়ালদাসের স্ত্রী আজ প্রায় মাস দুই হ'ল মারা গেছেন। আপনার জন্যে ত একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল তার উপর স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে দয়ালদাস আর তার কোমল প্রাণে সহ্য করতে পারল না, ক্রমশঃ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। আমি প্রত্যহই এসে খোঁজ খবর এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতাম। কাল এসে যখন দেখলাম যে, অবস্থা ভাল নয় তখন থেকেই আমি এখানে থেকে গেছি। রোগের ঘোরে কেবল আপনাকেই অনবরত খুঁজে ছিল।

কর্ম্মীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া লক্ষ্মী মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"সন্ন্যাসীমহারাজ প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন, কোন কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করিয়া আর একটিকে বড় ভাবিয়া ধরিতে যাইলে তাহাতে সুফল পাওয়া যায় না এবং প্রকৃত শান্তি ও আসে না। এই জন্যই বোধ হয় আমার পাওয়ার চেয়ে হারানটাই বেশী হইয়া গেল। এই সব চিন্তা করিতে করিতে লক্ষ্মী ভগবানের কাছে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল,—"ওগো প্রভু! বলে দাও, সত্যই কি শ্রীচৈতন্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি ইহারা স্ত্রী, পুত্র পরিজন ত্যাগ করিয়া সুখী হইয়া ছিলেন? অন্তরে কি তাঁহারা বেদনা পান নাই! রক্ত মাংসের শরীরে কি এ-ও সম্ভব? অত বড় কর্ত্তব্যকে ত্যাগ করা কি শুধু তাঁহাদেরই জন্য উপযুক্ত হইয়াছিল? ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ত শ্রীমাকে ত্যাগ

করেন নাই! তাঁহার চরিতামৃতে পড়িয়াছি, তিনি বলিতেন "নবহত-খানায় যে মা আছেন তাঁহার চেখে জল ফেলাইয়া ও কষ্ট দিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইলে মন্দিরের মা রাগ করিবেন।" ওইরূপ মহান কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়ার জন্যই কি তিনি জগন্মাতাকে সাক্ষাত দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই আদ্যাশক্তিমহামায়া তাঁহার সঙ্গে মাতাপুত্রের মত কথাবার্ত্তা কহিতেন? তাই কি সেই সাধন সিদ্ধ পুরুষ পরমানন্দে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিতেন? আমার সব হারিয়ে গেছে, তবুও তুমি বলিয়া দাও প্রভু কোন্ পথ ঠিক? বিবেক আজ সুযোগ পাইয়া লক্ষীর অন্তর হইতে বলিল,—"শোন! কর্ত্তব্যের কাছে ত্যাগ বড় নয়! প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন করার মধ্যে দিয়াই মানুষের সব কামনা সিদ্ধ হয় এবং তাহাতেই আসে প্রকৃত আনন্দ শান্তি ও তৃপ্তি। এই জন্য যথার্থ বিচারে ত্যাগের চেয়ে কর্ত্তব্য অনেক বড়। ভাবপ্রবণ মানুষ এই দিক দিয়া বিচারে ভুল করে বলিয়া ত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে। সংসারে যাহাদিগকে দুঃখ দিয়া ও কাঁদাইয়া ত্যাগের মহত্ত্ব দেখাইতে যাইবে বা প্রচার করিতে যাইবে তাহাদের জন্য ত সেই পরম করুণা ও দয়াময় নিশ্চয়ই দুঃখ পাইবেন; কাজেই যাঁহাকে পাইবার জন্য তুমি ত্যাগ দেখাইতে যাইতেছ তাঁহাকেই ত সর্ব্বাগ্রে তুমি কর্ত্তব্যের নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দুঃখিত করিতেছ! তাহা হইলে তুমি সত্যই কি তাঁহার কাছে অপরাধিনী হইতেছ না? উচ্ছ্বাসের বশবর্ত্তী না হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপকে ও তাঁর বিধি-নীতিকে যথার্থভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে না যে, তাঁহার মনুষ্য-সৃষ্টির অভিপ্রায় কি এবং সেই সৃষ্টিকে সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়া যাইবার নিমিত্ত যত প্রকার বস্তু ও ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলির নিয়মকে যথার্থভাবে পালন করিয়া যাইবার জন্য মানুষের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

যদি বল, যে সব কাজ আমি পছন্দ করি না সেই সব কাজে আমি মানুষের মধ্যে থেকেও কেন বাধা দিই না? এর উত্তরে শুন, আমার তোমার উপর নিজস্ব অধিকার ও শক্তি কিছু নাই। আমি নিরপেক্ষ উপদেষ্টা মাত্র। তুমি হইলে মন—দেহের রাজা; কামনা ও বাসনা এই দুই জন তোমার রাণী। তোমার ঐ রাজ্য অবাধে পরিচালনা করেন বুদ্ধি, মতি, ভাব, উচ্ছ্বাস, ইচ্ছা প্রভৃতি কয়েকজন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মিলিয়া। আমি ইহাদের সকলের উপরে থাকিয়া ক্রিয়াকলাপ দেখি মাত্র। সম্বন্ধ আমার গুরু শিষ্যের মত। উপদেশ লইতে আসিলে তখন দিই। তুমি উহাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পরে যখন তাহাদের কার্য্যে ভুল ভ্রান্তি হইতেছে বুঝিতে পার তখনই আমার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ কর "কেন এমন হ'ল?" তাই বলি, তুমি নিজে স্থিতধী হও, তোমার মন্ত্রীবর্গকে আমার অভিন্নহৃদয় 'কর্ত্তব্য-' প্রিয়তমকে মান্য করিয়া চলিতে বল এবং আমার সঙ্গে সর্ব্বদা যোগাযোগ স্থাপন করিতে বল, তাহা হইলেই কোনরূপ দুঃখ, কষ্ট, অনুতাপ ও অনুশোচনা আসিতে পারিবে না; সত্যকারের মঙ্গল বুঝিতে পারিবে। কিন্তু তাহা তুমি পার কৈ? তোমার এক এক জন মন্ত্রী এক এক ভাবে মন্ত্রণা দিয়ে তোমাকে যে পাগল করিয়া তুলে! বেচারী কর্ত্তব্য তখন আমার কাছে মুখ ম্লান করিয়া দাঁড়ায়, আমিও তখন সেই পরমপুরুষের দিকে তাকাইয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি; বুঝলে?"

অন্তর হইতে এই সমস্ত কথার ডাকে লক্ষ্মীর মন ভীষণ ভাবে আলোড়িত হইতে লাগিল। এদিকে তখন জমীদারমহাশয় গ্রামের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কাছে ডাকাইয়া বলিলেন,—আমি শাখা-মঠের এই কর্ম্মীমহাশয়কে একখানি পাঁচশত টাকার চেক দিচ্ছি, এই টাকা হতে আপনারা দাঁড়িয়ে থেকে সামান্য ভাবে শ্রাদ্ধের জন্যে ব্যয় করে

বাকী টাকায় গরীব দুঃখীদের অন্ন-বস্ত্র দান করবেন। আর আমি শীঘ্র দশ হাজার টাকার একটি চেক্ পাঠিয়ে দেবো, আপনারা সেই টাকায় এখানে একটি "দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করবেন। ঔষধাদি ছাড়া গরীবদের জন্যে পথ্যাদিরও ব্যবস্থা রাখবেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিচালিত করবেন আপনাদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েক জন ব্যক্তি মিলে এবং আয়, ব্যয়ের হিসেব রক্ষকের কাজ করবেন এই কর্ম্মীমহাশয়। চিকিৎসালয়টির নাম রাখবেন, 'দয়াল-গোবিন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়।' লক্ষ্মী-দেবীর পিতার ও দয়ালদাসের স্মৃতি রক্ষার্থে এই নামকরণ করে গেলেম।

দেশস্থ সকলে জমীদারমহাশয়কে সাধু, সাধু! বলিয়া সকৃতজ্ঞ সম্বর্দ্ধনায় অভিষিক্ত করিয়া দিল।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—এই চিকিৎসালয়টি যাতে শাসন-কর্তৃপক্ষ গ্রহন করেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করে স্থায়ীভাবে পরিচালনার ভার নেন তার জন্যে আমি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করব। আপনারাও সকলে স্বাক্ষর দিয়ে এ সম্বন্ধে আবেদন জানাবেন। আমরা এখন চল্‌লাম, আপনারা উপস্থিত থেকে যথারীতি সৎকারাদির ব্যবস্থা করুন এবং জমীদারমহাশয় যে যে বিষয় বল্লেন সেগুলি আপনারা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে করবেন আশাকরি। এই বলিয়া তাহার পর বৈষ্ণব-বাবাজীকে অনুরোধ করিলেন তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া লক্ষ্মীকে দয়ালদাসের নিকট হইতে তুলিয়া আনিবার জন্য।

লক্ষ্মীকে বৈষ্ণবগৃহিণী ও সাবিত্রীদেবী যখন তুলিয়া উঠাইলেন তখন সে শেষবারের মত দয়ালদাসের চরণে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—দাদু! এত যে ভালবাসা, দয়া, মায়া, কর্ত্তব্যজ্ঞান নিয়ে এসেছিলে, সে সব কার কাছে গচ্ছিত রেখে গেলে? মানুষকে সে

সমস্ত কে দিবে? এই বলিয়া লক্ষ্মী চক্ষু মুছিতে মুছিতে দয়ালদাসের মুখের উপর শোকাহত দৃষ্টি রাখিয়া অতি কষ্টে আস্তে আস্তে পশ্চাৎদিকে হাটিয়া চলিল যতক্ষণ দেখিতে পাইল।

তাহার পর তাঁহারা সকলের নিকট বিদায় লইয়া যখন চলিয়া গেলেন তখন গ্রামস্থ সকলে লক্ষ্মী মানুষের কোন্ স্থানে পৌছিয়াছে তাহা আজ চাক্ষুষ করিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইল। কয়েক জন বলাবলি করিল, "দুইটি মেয়েকে দেখিতে যেন লক্ষ্মী সরস্বতীর মত মনে হইল।" এইকথার সমর্থন করিয়া সকলেই বলিলেন, "সত্যই দেখিলে ভক্তি হয়।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আশ্রম উদ্বোধনের দিন আসিয়া গেল।

স্থানীয় প্রদেশের উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সেই দিন উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধলিপি গিয়াছে।

সন্ন্যাসীমহারাজ, জমীদারমহাশয় ও সাবিত্রীদেবী মহানগরীতে যাইয়া গুরুদেব ও তাঁহার পত্নীকে আশ্রমে লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মহানগরীর নির্ম্মম আকর্ষণ হইতে এতদিনে পরিত্রাণ পাইয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

যথা দিনে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি ও মহিলাবৃন্দের সমাগমে গুরুদেবের দ্বারা আশ্রম উদ্বোধিত হইল।

তৎপূর্ব্বেই সেই ৺মহেশ্বরের মন্দিরের যন্ত্রীসাধু এবং যথাস্থান হইতে লক্ষ্মী ও বৈষ্ণববাবাজী এবং তাঁহার পত্নীকে সকলে যাইয়া অতি সসম্মানে লইয়া আসিয়াছেন। প্রায় সমস্ত প্রদেশেরই দুই চারিজন করিয়া ছাত্র ছাত্রীতে আশ্রম ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। যন্ত্রীসাধু তারের যন্ত্রের গুরু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বৈষ্ণববাবাজী কীর্ত্তন ও খোল বাদ্য শিক্ষাদানের ভার লইয়াছেন। লক্ষ্মীদেবীকে দেওয়া হইয়াছে কীর্ত্তন, ধর্ম্মসঙ্গীত ও গ্রাম্য-গীতি শিক্ষার ভার। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিক্ষাদানের ভার লইয়াছেন গুরুদেব ও সঙ্গীতসাধক। শক্তিরাণী ও সাবিত্রীদেবী মহিলা বিভাগের পরিচর্য্যার ভার লইয়াছেন।

আশ্রমের মনোরম শোভাসৌন্দর্য্য এবং শিক্ষার আদর্শসম্মত সুব্যবস্থা দেখিয়া উদ্বোধনের দিন সমাগত ব্যক্তিগণ অতিশয় মুগ্ধ হইলেন।

গুরুদেব এবং সঙ্গীতসাধক প্রভৃতির উপস্থিতিতে সন্ন্যাসীমহারাজ অভ্যাগত ব্যক্তিগণের নিকট শীঘ্র প্রত্যেক প্রদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত-গুণিগণকে এবং প্রধান ব্যক্তিদের আহ্বান জানাইয়া সঙ্গীতের একটি বৃহৎ অধিবেশন করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজের নিকট ঐরূপ সদুদ্দেশ্যের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে পরম উৎসাহিত হইয়া যাহাতে শীঘ্র উহা করা যায় তাহার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা যতদূর সাহায্য হইতে পারিবে তাহারও প্রতিশ্রুতি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিলেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—আপনাদের কাছে সর্ব্ববিধ সাহায্য পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে আমার বল ভরসা বেড়ে গেল। অধিবেশনের দিন স্থির ও তার জন্যে যথারীতি ব্যবস্থা করতে আমরা আজই হতে মন প্রাণ নিয়োগ করব এবং কি রকম ভাবে আমরা এই কাজে অগ্রসর হচ্ছি তা আপনাদের সবিশেষ জানাব। একটা বিষয় আপনাদের কাছে

পরামর্শ নিতে চাই,—অধিবেশনের সভাপতি ও প্রধান অতিথি কিরূপ যোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পণ করা যাবে তা আপনারা বলুন।

এই কথা শুনিয়া মাননীয় ব্যক্তিরা বলিলেন,—এই প্রদেশের রাজ্য-পালকে প্রধান অতিথি করতে পারেন, আর সভাপতি তাঁকেই করা কর্ত্তব্য যিনি প্রবীণ ও সঙ্গীতে বিশেষ গুণী এবং ধ্রুপদী। তাছাড়া যিনি স্বপ্রদেশের জন্য সর্ব্বাধিক ভাবে সারা জীবন বহু কিছু দান করেছেন এবং বিশেষ ভাবে সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচারে সহায়তা করে আসছেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ ইহা জানিয়াও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করে এ বুঝতে পারা যাবে যে কোন্ প্রদেশে কে কি রকম গুণী আছেন?

তাঁহারা বলিলেন,—যে প্রদেশের গুণী ধ্রুপদসঙ্গীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দখলকার এবং শিক্ষার্থীদের জন্যে যিনি সব চেয়ে বেশী গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা সঙ্গীতশাস্ত্র ও ধ্রুপদ ইত্যাদি অমূল্য সম্পদ প্রকাশ করে যথার্থ কর্ত্তব্য পালন করে আসছেন তাঁকে খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না। কারণ প্রত্যেক প্রদেশের উপযুক্ত ব্যক্তিদের জানালে তাঁরা গুণীদের সমস্ত পরিচয় প্রদান করে' এবং তার সঙ্গে যে যে গুণীদের রচিত গ্রন্থ আছে তাও পাঠিয়ে দিতে পারবেন। আমরা তা দেখে সকলে মিলে যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্যে চিনে নিতে পারব বলে আশা করি।

তাঁহাদের এইরূপ সুচিন্তিত যুক্তিকে সকলেই সমর্থন করিলেন। অভ্যাগতগণ তাহার পর আশ্রমের আচার্য্যদের ও সন্ন্যাসীমহারাজ প্রভৃতি সকলের কাছে বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

জমীদারমহাশয় আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া অধিবেশন সংক্রান্ত বহুবিধ আলোচনা করিয়া সাবিত্রীদেবীকে লইয়া গৃহে রওনা হইলেন। আশ্রমে সেই দিন হইতেই অধিবেশনের জন্য অল্প অল্প করিয়া তোড়্ জোড়

চলিতে লাগিল।

* * *

সাবিত্রীদেবী এখন প্রত্যেক সপ্তাহে দুই তিন বার করিয়া পিতার সহিত আশ্রমে আসেন এবং তিনি ও শক্তিরাণী গুরুদেবের কাছে বীণা বাদ্য শিক্ষা করেন।

পূর্ব্বেই কতকগুলি তম্বুরা, বীণা, সুরবাহার, সেতার ইত্যাদি যন্ত্র তৈয়ারী করাইয়া আশ্রমে আনা হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবন অঞ্চলের একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ মৃদঙ্গ বাদ্যে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সন্ন্যাসীমহারাজ শুনিবামাত্র সেখানে নিজে যাইয়া তাঁহাকে সসম্মানে আশ্রমে আনিয়া মৃদঙ্গাচার্য্যের পদ দান করিয়াছেন। ইঁহার তবলা বাদ্যের উপরও কাজ চালানর মত অধিকার আছে। গুরুদেব বলেন, "শুদ্ধ মাত্রা ও গতিযুক্ত তালেরঠেকাটি বাজাইতে পারিলেই তবলার তালের গান ওগৎএর পক্ষে যথেষ্ট। বাদ্য কারের বেশী বোল-পরম প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না।"

দুই একদিন পরে গুরুদেবের আশ্রম গৃহে জমীদারমহাশয় প্রভৃতি সকলে বসিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করিতেছেন। নানা কথা প্রসঙ্গে গায়কদের গাহিবার রীতিনীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে গুরুদেবকে জমীদারমহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্বে আমি বরোদা, দিল্লী, কাশী প্রভৃতি বড় বড় স্থানে "নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে" এবং আরো বহু স্থানে গায়কদের গানের সময় দেখেছি, তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্রোড়ে তম্বুরা রেখে বাজিয়ে গান করতেন; কোন বাহ্যিক আড়ম্বরেরই তাঁদের প্রয়োজন হত না। আমার মনে হয় এর দ্বারা তাঁদের সঙ্গীত প্রকাশে স্বাধীনশক্তির পরিচয় বিশেষ করে পাওয়া যেত। কিন্তু আজ কয়েক বছর ধরে সঙ্গীতের আসরে

দেখে আসছি, গায়কদের গানে আনুষঙ্গিক আড়ম্বর যেন বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে দুঃখ লাগে গায়কদের তম্বুরা হাতে করে না বাজিয়ে গান করা দেখে। যে যন্ত্রটির কৃপায় সঙ্গীতসাধক তাঁর সাধনার যথার্থ পরিচয় লাভের জন্যে সহায়তা পেলেন এবং সঙ্গীতের প্রকৃত পথে অগ্রসর হবার জন্যে সেই রইল চিরসম্বল ও পথ প্রদর্শক হয়ে, তাকে আসরে গুরুর মত মর্য্যাদা না দিয়ে নিজের সাধনার নিয়ম, নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য দেখাবেন না—তিনি দেবেন কি-না সেই দেবযন্ত্রটি অন্যের হাতে তুলে। এর সঙ্গত কারণ ত আমি খুঁজে পাই না। এর কারণ সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা আছে কি-না অনুগ্রহ করে বলুন।

এর উত্তরে গুরুদেব দুঃখ করিয়া বলিলেন,—কি জানি! আমার মনে হয় এ প্রথা লোক দেখান জমকালত্ব ও আয়েসী ভাব নিয়ে বড়ত্ব প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। জানিনা, এরূপ ভাবে গান করায় তাঁদের যথার্থ সাধনার পরিচয়, সম্মান, সম্ভ্রম, ও আত্মতৃপ্তি বেড়েছে না কমেছে। এখনকার দিনে গায়কদের ইচ্ছা ও খেয়াল খুসীর উপর কারো কিছু বলবার অধিকার নেই এবং সেরূপ বলিষ্ঠ শক্তির অভাব বলেই তাঁদের ভাল মন্দ তাঁরাই বুঝে চলেছেন। যাঁরা যথার্থ আদর্শকে মান্য করে চলেন তাঁরা ঠিকই আছেন। আবার যখন সকলে নিজেদের অবস্থা ও ন্যায় নীতিকে বুঝে নেবেন তখন আবার সকলের কাছে আদর্শ বস্তুটিই প্রতিভাত হয়ে উঠবে। এই কথার পর সেইদিনকার মত তাঁহাদের আলোচনার আসর ভঙ্গ হইল।

কয়েক দিনের মধ্যেই সঙ্গীত অধিবেশনের জন্য মঠের সম্মুখস্থ বিরাট ময়দানে মণ্ডপ তৈয়ারী হইয়া গেল। সঙ্গীতজ্ঞ ও বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসিবার জন্য তাহার ভিতর সুদীর্ঘ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বিশেষ শ্রোতাদের জন্য মঞ্চের নিম্নে আসনের উপর বসিবার ব্যবস্থা

হইয়াছে। আগামী সপ্তাহে অধিবেশন আরম্ভ হইবে। সরকারের নির্দ্দেশে সন্নিকটের রেলওয়ে ষ্টেশন্‌টি এখন বেশ বৃহৎ হইয়াছে এবং উহার নূতন নামকরণ হইয়াছে "সঙ্গীতাশ্রম রোড ষ্টেশন্।" এখন সমস্ত ট্রেনই থামে। ষ্টেশন্ হইতে আশ্রম দ্বার পর্য্যন্ত লাল কাঁকর দিয়া বাঁধান সুন্দর পরিসর রাস্তা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। মঠে টেলিফোন, টেলিগ্রামযন্ত্রযুক্ত একটি ডাকঘর এবং চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন স্থানীয় সরকার। সমগ্র প্রদেশের গুণিগণ অধিবেশনে উপস্থিত হইবেন এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীমহারাজ একদিন সাধকজী ও গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া সমস্তরাগের বিশুদ্ধ গঠনপ্রণালী, ঠাট, স্বরলিপি ও শিক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট যুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। অতঃপর সেইগুলিকে হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজীতে সুন্দরভাবে বিচার বিশ্লেষণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া আনিলেন এবং অভিমত জানিবার জন্য সমস্ত গুণীদের নিকট ডাকযোগে এক একখানি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে এই কথাও জানাইলেন যে, যদি যুক্তিসমূহের মধ্যে কোন বিষয়ে আপত্তি থাকে তাহা হইলে তাঁহারা নিজ নিজ মন্তব্য পূর্ব্বাহ্নে পরিচালক সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন; তাঁহাদের আপত্তির বিষয়গুলি অধিবেশনের দিন আলোচিত হইবে।

বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার ও যুক্তিসম্মত অভিমতের দ্বারা বাঙলার এক প্রবীণ-সঙ্গীতসাধক সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং প্রধানঅতিথির পদ অলঙ্কৃত করিবেন প্রদেশের রাজ্যপাল।

দেখিতে দেখিতে অধিবেশনের দিন আসিয়া গেল। প্রত্যেক প্রদেশের বহু গণ্যমান্যব্যক্তি ও তাঁহাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত বিশিষ্ট

সঙ্গীতগুণিগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জমীদারমহাশয় সভাপতি-মহাশয়কে অধিবেশনের পূর্ব্বদিন যে ট্রেনে লইয়া আসিলেন, সেই ট্রেন আসার সময়ে গুরুদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ষ্টেশনে যাইয়া সভাপতিমহাশয়কে সকলে বিপুল সম্বর্দ্ধনা সহকারে আশ্রমে লইয়া আসিলেন এবং সঙ্গীতসাধক পূর্ব্বে যে কুটিরে ছিলেন সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনোরম কুটিরে সভাপতি মহাশয়ের থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ আশ্রম দেখিয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের পৃথকভাবে থাকিবার নিয়মসঙ্গত সুন্দর ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রণালী এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের মত বিশুদ্ধ নিয়ম পালনের নির্দ্দেশাবলী দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা সকলে বলাবলি করিতে লাগিলেন, এইরূপ আদর্শ সম্মত নিয়মই সঙ্গীতের মত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার প্রকৃত উপায়।

বেলা দুই ঘটিকার সময় মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজ্যপাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-জমীদারমহাশয় মাননীয়-ব্যক্তিগণকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা সহকারে সঙ্গে লইয়া আশ্রম দেখাইয়া তাহার পরে মণ্ডপ মধ্যে লইয়া গেলেন। মঞ্চের উপর এক পার্শ্বে তাঁহারা উপবেশন করিলেন এবং অপর পার্শ্বে সঙ্গীতগুণিগণ বসিলেন। মধ্যস্থলের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন সভাপতি মহাশয়, তাহার পরে রাজ্যপাল ও গুরুদেব। পশ্চাৎ দিকে সারিবদ্ধ হইয়া আশ্রমের সাতজন গৈরিক বসন পরিহিতা অল্প বয়স্কা ছাত্রী মস্তকে ঊর্দ্ধ ঝুঁটি বন্ধন করিয়া এবং পুষ্পা-লঙ্কারে ভূষিত হইয়া হস্তে এক একটি করিয়া শঙ্খ লইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসীমহারাজের ইঙ্গিত পাইয়া তাহারা সাতটি স্বরে পর পর শঙ্খ ধ্বনি করিয়া শুভ উদ্বোধনের সূচনা ঘোষণা করিল। এই সপ্তপ্রকার স্বরের-সাতটি শঙ্খ সন্ন্যাসীমহারাজ বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিয়া ক্রয় করিয়া

আনিয়াছিলেন। ঐ শঙ্খ ধ্বনির পর সেই ছাত্রীরা সমবেত কণ্ঠে ভীম-পলশ্রী রাগে ও চৌতালতালে মঙ্গলবাচক একটি বেদমন্ত্র গাহিল। সেই সঙ্গীতের ভাবমাধুর্য্যে যেন সূচনাতেই সমগ্র মণ্ডপটি পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তৎপরে মাল্যদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর জমীদারমহাশয় সকলকে বিনীত সম্ভাষণ জানাইয়া উদ্বোধন বিবরণী পাঠ করিলেন। তাহার পর সকলের নিকট বিশিষ্ট সঙ্গীতগুণীদের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আশ্রম ও অধিবেশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়া অধিবেশনে যোগদানের জন্য সকলকে পুনশ্চ কৃতজ্ঞতাযুক্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

ইহার পর সঙ্গীতের বহুবিধ বিচার ও শিক্ষার রীতিনীতি সম্বন্ধে তথ্য ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালীযুক্ত পুস্তিকাকারে যাহা ছাপা হইয়াছে তাহা লইয়া সন্ন্যাসীমহারাজ আলোচনা করিয়া সকলকে বিষদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। অধিকাংশ গুণী ব্যক্তিগণই বলিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে গভীর মনোনিবেশ সহকারে উহা পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কাছে কোনরূপ ভুল ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং যুক্তি সকল অকাট্য ও সুন্দর ভাবে গ্রহণ যোগ্য হইয়াছে। দুই একজন আপত্তি জানাইয়াছিলেন কোন কোন বিষয় তাঁহাদের মনঃপুত হয় নাই বলিয়া।

সন্ন্যাসীমহারাজ তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—আপনাদের আপত্তির উত্তরে সঙ্গীতসাধকজী কিছু বলবেন। এই বলিয়া তিনি সাধকজীকে অনুরোধ করিলেন।

সাধকজী তখন সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের অনুমতি লইয়া এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার সিদ্ধপুরুষের মত সৌম্য ও উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট মূর্ত্তিখানি দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে অবাক্

হইয়া গেলেন। যাঁহারা যে যে বিষয়ে আপত্তি জানাইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সাধকজী সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আমার পরম প্রীতিভাজন বন্ধুদের সর্ব্বাগ্রে আমি করজোড়ে সবিনয় নমস্কার জ্ঞাপন কচ্ছি। এই বলিয়া তাহার পর তিনি এমন ভাবে বলিষ্ঠ যুক্তি সকল প্রয়োগ পূর্ব্বক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে কাহারও আর কিছু বলিবার রহিল না। সকলে এক-বাক্যে উহা স্বীকার করিয়া লইয়া লিখিত পাঠ্যতালিকা ও রাগাদির গঠন প্রণালী ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সমগ্র ভারতের জন্য যথার্থ ভাবে গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া স্বাক্ষর পত্রিকায় স্বাক্ষর করিলেন।

তাহার পর সকলে একান্ত ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারা গুরুদেব প্রভৃতি আশ্রমের আচার্য্যদের গীতবাদ্য শ্রবণ করিবেন। তখন সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গুরুদেব শ্রীরাগের আলাপ সুরু করিলেন। এক ঘণ্টাযাবৎ অতি সুললিত ভাবে ও ভরাট কণ্ঠে আলাপের উৎকৃষ্ট ক্রিয়া সকল চারিসপ্তকের দ্বারা দেখাইয়া সেই রাগের চৌতাল, ধামার ও গীতঙ্গী-তালের গান গাইয়া যখন শেষ করিলেন তখন সমবেত ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইয়া বিপুল ভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান জানাইলেন এবং একবাক্যে তাঁহারা বলিলেন যে, "এইরূপ উচ্চস্তরের প্রকৃত আলাপ ও ধ্রুপদ আমরা শুনি নাই।" গানের সঙ্গে মৃদঙ্গাচার্য্যের বাদ্যেরও সকলে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মাননীয় রাজ্যপাল বলিলেন,—গুরুদেবের গান শুনে আমার যেরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অবস্থা হ'ল তার ব্যাখ্যায় এটুকু বলতে পারি যে, তাঁর সঙ্গীত যেন সুরের জলদ মালা, আর মৃদঙ্গের বাদ্য যেন সেই জলদ-মালার অন্তরস্থ মন্দ্র মধুর মেঘ ধ্বনি। এরূপ অপূর্ব্ব যুগল মিলন সম্পর্কের রূপ আমার অন্তরাকাশে সুরের ভাবরূপ-পবনের দ্বারা তরঙ্গান্দোলিত করতে করতে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হয়ে গেল। গায়কের কণ্ঠ নিঃসৃত সুরের জ্যোতি যেন বিজলী ঝলকের মত ক্ষণে ক্ষণে আকাশে, বাতাসে ও অন্তরে

চমক লাগিয়ে দিতেছিল। তারপর সেই রাগের মূর্ত্তি ও ছন্দের বারি ধারায় দেহ মন প্লাবিত ও স্নিগ্ধ করল এবং সেই সুরের বেগ ধারা প্রেমরূপে চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বহিরঅঙ্গের গণ্ড ও বক্ষস্থল ভাসিয়ে দিল। রাজ্যপালের এই উপমাব্যাখ্যাটি সকলেই গভীর ভাবে মনে প্রাণে অনুভব করিলেন। তাহার পর করতালি ধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া সঙ্গীতসাধক বসিলেন গাহিতে। তিনি গাহিলেন সন্ধ্যার পরের অপূর্ব্ব রাগ 'ইমনকল্যাণ'। তাঁহার ভাবযুক্ত গানের অতুলনীয় মহিমায় সকলে মোহিত হইয়া গেলেন, এবং তাঁহারা যেন সঙ্গীতের ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন এইরূপ মনে হইল। গান শেষ হইয়া যাইলে পর গুণিগণ একে একে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "এই হল সঙ্গীতের প্রকৃত প্রাণবস্তুরূপ, এরূপ সঙ্গীতে পাষাণও দ্রবীভূত হয়ে যায়; সত্যই একেই বলে বোধহয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ।" একজন প্রবীণসঙ্গীতজ্ঞ সাধকজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কণ্ঠে উদারার নিম্ন সপ্তকের গান্ধার ও তারার উর্দ্ধ সপ্তকের পঞ্চম পর্য্যন্ত কি করে এবং সাধনার কোন্ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ করতে সক্ষম হলেন? এরূপ আশ্চর্য্যজনক প্রকাশ শক্তি অর্জ্জন হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না এবং কখনও শুনি নি।

সাধকজী বলিলেন,—গুরুদেবের কাছে যেদিন শুনেছিলেম যে, মানুষ যদি ঠিক লক্ষ্যের উপর ধ্যান ও চিন্তা রেখে সাধনা করে' যায় সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা তাহলে কণ্ঠে সে বহু প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া ও শক্তি প্রদর্শন করবার অধিকার লাভ করতে পারে। সেই থেকে আমি চেষ্টা করছি মাত্র। এখনও সে সব শক্তির কিছুই লাভ করতে পারি নি। কণ্ঠে স্বর সমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে এটুকু বুঝেছি যে, ঠিক পথে থাকলে মানুষের কণ্ঠে পাঁচ সপ্তক স্বর প্রকাশ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। গুরুদেবের কণ্ঠে আমি দুটি স্বরের ধ্বনি এক সঙ্গে শুনেছি এবং তিনি দম্ নেবার সময়ও

অক্লেশে সঙ্গীত প্রকাশ করতে পারেন।

সেই সঙ্গীতজ্ঞ বলিলেন,—আপনার গুরুদেব গৃহী হয়ে এত বড় শক্তির যখন অধিকারী হয়েছেন তখন আপনার দ্বারা না জানি আরো কত বিস্ময়কর সৃষ্টি হতে পারে, তাই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

তাহার পর যন্ত্রীসাধু সুরবাহারে ছায়া-নটের আলাপ ও সেই রাগের সেতারে গৎ বাজাইলেন। তাঁহার হাতের বাজনা শুনিয়া ভাবে মুহ্যমান হইয়া সকলে ঝিমাইতে লাগিলেন। যন্ত্রসাধকের অঙ্গুলি চালনার সঙ্গে যেন সুরের অমৃতস্রোত বহিতে লাগিল।

তাহার পর গান ধরিলেন অপূর্ব্ব শক্তি লইয়া অমিয়াকণ্ঠী শক্তিরাণী। বাহার রাগের প্রথমতঃ একখানি ধ্রুপদ ও পরে একখানি বিলম্বিত এবং দ্রুত খেয়াল তিনি গাইলেন। পরিশেষে গাহিলেন লক্ষ্মীদেবী একখানি কীর্ত্তন। ইঁহাদের গানের সময় কেহ কেহ আহাহা করিতে লাগিলেন, কেহবা সুরের মায়ায় ভাবে আকুল হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের অপূর্ব্ব ভাবযুক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ দেখিয়া এবং তাহার উপর এইরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সকলে যেন ভক্তিভাবে পাগলের মত হইয়া গেলেন। গান শেষ হইয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণ যাবৎ সকলে সম্বিত হারার মত বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সকলে শক্তিরাণী ও লক্ষ্মী-দেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—আমরা তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব, না ভগবৎ প্রেরিত দেবী মনে করে পূজা করব তা ভেবে উঠতে পার্চ্ছি না; কি করে মা তোমরা এমনভাবে সঙ্গীতের প্রাণবস্তুকে বুঝে নিতে পারলে তা বলতে পার? আমরা তার ইঙ্গিত পেলে ধন্য হয়ে যাব। তোমাদের গান শুনে মনে হ'ল, একেই বলে বোধহয় স্বর্গীয় সঙ্গীত।

শক্তিরাণী ও লক্ষ্মীদেবী নত মস্তকে করজোড়ে দণ্ডায়মানা থাকিয়া

পরে উভয়ে যখন প্রত্যেককে নমস্কার করিতে লাগিলেন তখন সকলে বাক্যহারা হইয়া গেলেন, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না।

সেই দিনের মত অধিবেশন বন্ধ হইল বলিয়া সন্ন্যাসীমহারাজ ঘোষণা করিলেন।

প্রধানঅতিথি, সভাপতি এবং মন্ত্রীবর্গ প্রমুখ সমস্ত ব্যক্তিগণ এক-বাক্যে বলিলেন,—আমাদের জীবনে যে এ রকম সাধক ও সাধিকাদের অলৌকিক স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণ করা ভাগ্যে ঘট্তে পারবে তা কল্পনায়ও ছিল না। এরূপ পুণ্য লাভের সৌভাগ্য যাঁরা দান করলেন এবং এর উদ্যোক্তা যাঁরা তাঁদের কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সন্ন্যাসীমহারাজ বলিলেন,—কাল প্রাতে পরম শ্রদ্ধাভাজন বহিরাগত গুণীমহোদয়েরা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।

এই কথা শুনিবা মাত্র সঙ্গীতশিল্পীবৃন্দ বলিয়া উঠিলেন,—না, না, না, এরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করার পর এক্ষেত্রে আর আমাদের গান বাজনা করা চলে না। আমরা এক বাক্যে স্বীকার কর্চ্ছি যে, প্রকৃত সাধকের মত সঙ্গীত সাধনা না করলে সঙ্গীতের যথার্থ মাহাত্ম্য উপলব্ধি হতে পারে না।

অতঃপর সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহার রূপ ও সাধনা সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় সুচিন্তিত ও গভীর প্রেরণা মূলক নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিলেন। সভা ভঙ্গ হইয়া যাওয়ার পর মাননীয় রাজ্যপাল, মন্ত্রীবর্গ ও বিশিষ্ট মাননীয় ব্যক্তিগণ সভাপতিকে, সন্ন্যাসীমহারাজ, জমীদারমহাশয়ও আশ্রমের আচার্য্যদিগকে এবং অন্যান্য সমাগত গুণিদিগকে প্রীতি নমস্কার জানাইয়া পরম হৃষ্ট চিত্তে সকলের কাছে বিদায় লইয়া বলিলেন,—আজ হতে আশ্রমটি আমাদেরও প্রাণ-

স্বরূপ হয়ে রইল। এর সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্ত আমাদের সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা থাকবে।

তৎপরে সঙ্গীতসাধক, সাধকযন্ত্রী, শক্তিরাণী ও লক্ষ্মীদেবীকে তাঁহারা কি বলিয়া যে সম্বর্দ্ধনা ও অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইবেন তাহা ভাষার দ্বারা কেহই ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র বলিলেন,—আপনারা ভগবৎ প্রেরিত হয়ে তাঁর ইচ্ছায় সঙ্গীতের ভাব ও মাহাত্ম্য প্রচার করতে এসেছেন।

ভারতের চতুর্দ্দিকের বড় বড় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইয়া অধিবেশনের সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন এবং যাঁহারা সঙ্গীত পরিবেশন করিলেন তাঁহাদের পৃথক পৃথক ও সকলের সমষ্টিগত ভাবে সভার আলোক চিত্র গ্রহণ করিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই উহা সমগ্র দেশে বিরাট ভাবে সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া মানুষকে চমকিত করিয়া দিল। কোন কোন সম্পাদকীয় মন্তব্যে এইরূপ বাক্যও প্রকাশিত হইল যে, "আশ্রমটি সমগ্র জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে, সেখানে যাইলে সঙ্গীতের দেব দেবী দর্শন হইবে ইত্যাদি।"

অধিবেশন উপলক্ষ্যে কয়দিন ধরিয়া আশ্রমাঞ্চলটি সরগরম্ হইয়া রহিয়াছিল। এখন আবার সেই পূর্ব্বের মত শান্ত শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

এক বিশিষ্ট স্থান হইতে জনৈক লোকমান্য ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তিনটি কারুকার্য্য খচিত সুবর্ণের তৈয়ারী তম্বুরা, একটি সুরবাহার ও একটি একতারা পাঠাইয়াছেন এবং তৎসঙ্গে পত্রের দ্বারা জানাইয়াছেন,"মাননীয় গুরুদেবকে, সাধকজীকে ও সঙ্গীতদেবীশক্তিরাণীকে একটি করিয়া তম্বুরা এবং যন্ত্রীসাধুকে সুরবাহারটি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ অর্পণ করিলাম। এইরূপভাবে কীর্ত্তনশ্রেষ্ঠী-ভাবপ্রেমিকা-লক্ষ্মীদেবীমাকে

একতারাটি অর্পণ করিলাম।”

তাহার পর লিখিয়াছেন, “দেশের এই সকল সঙ্গীতে আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভগবৎকৃপায় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকুন এই তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি।”

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আশ্রমের নিয়মিত শিক্ষা ইত্যাদির কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল। বাউলঠাকুর মাঝে মাঝে আসেন আবার চলিয়া যান। শক্তিরাণী গুরুদেবের কাছেই থাকেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহার প্রভুজীর পরিচর্য্যাদি করেন। গুরুদেব ও গুরুমা যেই দিন হইতে শক্তিরাণীকে দেখিয়াছেন সেই দিন হইতেই তাঁহাকে নিজের কন্যার মত স্নেহাদরে কাছে রাখিয়াছেন। শক্তিরাণীকে এক দণ্ড না দেখিলে তাঁহাদের মন অস্থির হইতে থাকে। একদিন গুরুদেবকে যন্ত্রীসাধু বলিতেছিলেন,—“শক্তিমা যখন তাঁহার কাছে সুরবাহারের আলাপ শুনিতে যান, তখন তাঁহার বাজনায় প্রাণশক্তি যেন দ্বিগুণ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া যায়; মনে হয় যেন সাক্ষাৎ সরস্বতীমাতাকে শুনাইতেছি।”

একটি কথা বলিতে ভুল হইয়া গিয়াছে, তাহা এই যে, আশ্রম তৈয়ারী হইতে আরম্ভের কয়েক দিন পরে শক্তিরাণীর মাতা হঠাৎ মারা যান এবং তাহার পর কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধ পিতাও পত্নীর কাছে

পুনর্মিলিত হইতে চলিয়া যান। তাই এখন শক্তিরাণীর ঐ দিকের মায়া ও কর্ত্তব্যের বন্ধন সমস্ত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কয়েক মাস পরে একদিন সন্ধ্যাকালে শক্তিরাণী বৈষ্ণববাবাজীর কুটিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া জপ করিতেছেন। শক্তিরাণীও সেইরূপভাবে বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীদেবী চক্ষু উন্মীলন করিয়া শক্তিরাণীকে দেখিতে পাইয়া পরম আহ্লাদ সহকারে বলিলেন,—দিদি ভাই! আজ এ সময় ৺নারায়ণের কাছে একটি আপনি ভজন গান করুন, আমরা শুনি এবং তিনিও শুনুন।

শক্তিরাণী তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জোড়হস্তে নারায়ণের সম্মুখে একটি গান আরম্ভ করিতেই তাঁহার সুধাকণ্ঠের প্রাণমাতান স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র গুরুদেব, গুরুমা প্রভৃতি সকলে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাত জোড় করিয়া দেবতার সম্মুখে সকলে দাঁড়াইয়া শক্তিরাণীর গান শুনিতে শুনিতে ভক্তিভাবে তাঁহাদের দেহ, মন আপ্লুত হইয়া গেল।

শক্তিরাণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ রাগে নিম্নোক্ত গানটি গাহিলেন :—

ওগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী,
নয়ন প্রাণ মন মুগ্ধকারী।
তব সুন্দর বদন কোটী মদন,
শশী, তপন যায় লাজে হারি'।
শীষে মুকুট শোভে রতন ঝলসিয়া,
ভুরু যেন 'রামধনু' আছে সেথা আঁকিয়া,
কমলনয়নদল করিতেছে ঢল ঢল,
দুই পাশে কুন্তল উড়িছে তাহারি।

মকরকুণ্ডল গণ্ড চুমিছে
বারে বারে যেন সাধ্ না মিটিছে,
বনমালা গলে বরিহা বাতাসে দোলে
পীত বসনে ঝুলে মুকুতার সারি।
চরণপদ্মে মম মন-অলি সদা ধায়
বঞ্চিত ক'র না গো যেন সেথা ঠাঁই পায়,
মম হৃদয়ের বীণে বাজে যেন নিশি দিনে
গাহি যেন সদা গান তোমারে নেহারি' ॥

শক্তিরাণী গানটি শেষ করিয়াই সেইখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ সকলে একি হল! একি হল!! বলিয়া উঠিলেন। গুরুদেব, গুরুমা ও লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি সকলে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সাধকজী খবর পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন। সেইদিন বৈকাল হইতে শক্তিরাণীর শরীর ভাল ছিল না। মাঝে মাঝে তাঁহার একটা কম্পের মত ভাব আসিতেছিল এবং গাত্রও সামান্য গরম হইয়াছিল, তৎসঙ্গে মাঝে মাঝে পৃষ্ঠে বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। শরীরের এই রকম অবস্থা তিনি কাহাকেও জানান নাই। ইহা ছাড়াও আজ দুই একদিন ধরিয়া তাঁহার মনও বেশ প্রফুল্ল ছিল না। যেন সমস্ত বিষয়েই কি রকম এক অনাশক্তির ভাব তাঁহার মনে হইতেছিল, অথচ তিনি নিজেও ইহার কি কারণ তাহা সঠিকভাবে নিরূপণ করিতে পারিতেছিলেন না। যাহাই হউক, উপস্থিত কিছুক্ষণের মধ্যেও যখন শক্তিরাণীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না তখন গুরুদেব তাঁহাকে দুইহাতে কোলের কাছে তুলিয়া লইয়া তাঁহার কুটিরে যাইয়া নিজের খাটিয়ার উপর আস্তে আস্তে শুয়াইয়া দিলেন। গুরুমা তাঁহার মস্তকটি কোলের উপর লইয়া মাথায় মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ

বাদে শক্তিরাণীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল; তিনি ঘোরযুক্ত চক্ষু মেলিয়া যন্ত্রণাকাতর মুখে বলিলেন,—আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম এবং এখন কোথায় আছি?

গুরুমা বলিলেন,—মা শক্তি! ভাল করে চেয়ে দেখ্, তুই আমার কোলে শুয়ে আছিস।

শক্তিরাণী বলিল,—জানেন মা! আমি বেশ এক সুন্দর জায়গায় গেছলাম, সেখানের লোকে আমাকে ছাড়তে চান না, কেবল গান শোনাতে বলছিলেন; আমি তাঁদের বল্‌লাম এখানে তোমাদের জন্য বড় মন কেমন কচ্ছে।

এই কথা শুনিয়া গুরুমা বলিলেন,—ও সব স্বপ্ন, আর কিছু নয়; মা তুই এখন বেশী কথা বলিস না, এই গরম দুধটুকু খেয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

শক্তিরাণী উহা খাইয়া ঘুমাইবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে সুস্থ মনে করিয়া সকলে অনেকখানি নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ কুটিরে চলিয়া গেলেন। সেইদিন আশ্রমে আর সঙ্গীত সাধনা কাহারও হইল না। গুরুদেব, গুরুমা, সাধকজী ও লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি অনেকেরই রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। কি জানি কেন একটা অমঙ্গলের ভীষণ চিন্তা তাঁহাদের মনের মধ্যে আসিয়া চিত্তকে অস্থির করিতে লাগিল।

সাধকজী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শয্যাত্যাগ করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন শক্তিরাণী ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রায় অজ্ঞানের মত পড়িয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি মুখে হাতে জল লইয়া গুরুদেবের কুটিরে যাইয়া দেখিলেন, লক্ষ্মীদেবী, বৈষ্ণববাবাজী, তাঁহার পত্নী, যন্ত্র-সাধক ও মৃদঙ্গাচার্য্য প্রভৃতি ইঁহারাও উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেব

লোক মারফত্‌ সন্ন্যাসীমহারাজের নিকট শক্তিরাণীর অসুখের সবিশেষ সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

সন্ন্যাসীমহারাজ এতদিন ধরিয়া যে কার্য্যে মন প্রাণ দিয়া ব্রতী ছিলেন সেই সঙ্গীতের আদর্শ ভগবৎ কৃপায় রক্ষা পাইয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়া যাওয়ায় এখন তিনি আবার পূর্ব্বের মত পূর্ণোদ্যমে জনসেবা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ঐ কার্য্যের জন্য কয়েক দিন তিনি এই স্থানে ছিলেন না, পূর্ব্বদিন রাত্রে মঠে ফিরিয়াছেন।

লোক প্রেরিত পত্রে শক্তিরাণীর অসুখের সংবাদ জানিয়া বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রথমতঃ তিনি দুই তিন জন খ্যাতনামা চিকিৎসককে শীঘ্র আসিবার জন্য তার করিয়া আশ্রমের উদ্দেশ্যে শক্তিরাণীকে দেখিবার জন্য ত্বরিতপদে রওনা হইলেন।

এদিকে শক্তিরাণী এরূপ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন যে তিনি প্রায় জ্ঞানশূন্যের মত পড়িয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখে যন্ত্রণাও প্রকাশ পাইতেছে। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তিনজন বিখ্যাত ডাক্তার মোটরে করিয়া বহুবিধ ঔষধাদি লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন। তখন সকলে ভয় পাইয়া চিকিৎসকগণকে বলিলেন,—কি দেখলেন বলুন! কেন আপনারা ও রকম করে উঠলেন?

তখন চিকিৎসকরা অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন,—পিঠে একটি ব্রণ হয়েছিল, সেটা বোধহয় অজান্তে খুঁটে দেওয়ার দরুণ এখন সমস্ত শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে গেছে, এবং তার জন্যেই এরূপ প্রবল জ্বর ও অজ্ঞান করে রেখেছে। চিকিৎসায় অনেকখানি দেরি হয়ে যাওয়ার দরুণ এখন বেশ গুরুতর অবস্থায় দাঁড়িয়েছে। যাই হ'ক যত রকমভাবে আমাদের করবার সাধ্য আছে তা করে যাই, তারপর ভগবানের হাত।

এই বলিয়া তাঁহারা যথারীতি ঔষধাদির প্রয়োগ ও ব্যবস্থা করিলেন। তারপর তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ মত একজন বিশেষজ্ঞকে সেখানে সর্ব্বক্ষণের জন্য রাখিয়া গেলেন। চিকিৎসকদের কাছ হইতে নির্ণীত রোগের নাম ও অবস্থা শুনিয়া সকলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন।

* * *

সেইদিন জমীদারমহাশয় তাঁহার নিজ বাটিতে প্রাতঃকালে বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন, সেই সময় সাবিত্রীদেবী অন্তরে খুব চিন্তাকুল হইয়া তাঁহার পিতার কাছে আসিয়া বলিলেন,—বাবা, কাল ভোরে আমি একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি,—কি ভীষণ স্বপ্ন জান! যেন আশ্রমে খুব ভূমিকম্প হচ্ছে, আমি শক্তিকে নিয়ে বাইরে এসেও দাঁড়াতে পারলেম না, শক্তি কেবল পড়ে পড়ে যাচ্ছিল, সে সময় সাধকজী কোন রকমে টল্‌তে টল্‌তে এসে আমাদের ধরতে গিয়ে আমার উপর পড়ে গেলেন, শক্তিবোন্ আমার হাতছাড়া হয়ে যে কোথায় সরে গেল দেখতে না পেয়ে চিৎকার করে ডাকতেই আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সেইথেকেই কেন কি জানি মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে। আজ খাওয়া দাওয়া করে চল আশ্রমে যাই। এই বলিয়া সাবিত্রীদেবী ছল ছল নেত্রে পিতার কাছ হইতে চলিয়া গেলেন। জমীদারমহাশয়েরও কি জানি কেন মনটা খারাপ হইয়া গেল।

জমীদারমহাশয় মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সবে মাত্র বসিয়াছেন তখন ভৃত্য একটি টেলিগ্রাম আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। জমীদারমহাশয় টেলিগ্রামটি পড়িয়া ভয়ে শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন জানিলেন সাবিত্রীদেবীর আহার হইয়াছে তখন তিনি তাঁহাকে জানাইবা-মাত্র সাবিত্রীদেবী প্রায় উন্মাদিনী মূর্ত্তির মত হইয়া বলিলেন,—বাবা!

শীগ্‌গীর্ মোটর আনতে বল, আমরা এক্ষুণি সেখানে যাব, ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেছে ; তাই গলা দিয়ে ভাত পেরোচ্ছিল না।

মোটর আসিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহারা রওনা হইয়া গেলেন। সেখানে পৌঁছিয়া সাবিত্রীদেবী মোটর হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আলু থালু বেশে দৌড়াইলেন তাঁহার প্রিয়তমা-ভগিনী-শক্তিরাণীর কাছে। রোগিণীর সামনে গিয়া গুরুমায়ের কাছ হইতে সকাতরে চাহিয়া লইয়া শক্তিরাণীর জ্ঞানহারা দেহের মস্তকটি নিজের ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

এই রকম ভাবে দুই দিন কাটিল। শক্তিরাণীর মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরিয়া আসে আবার যন্ত্রনায় অজ্ঞানের মত আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। অসহ্য যন্ত্রনা তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ করেন না পাছে ইঁহারা সকলে তাহা দেখিয়া কষ্ট পান।

শক্তিরাণীর অসুখের সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহু স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মুহুর্মুহু টেলিগ্রাম্ ও টেলিফোন করিয়া রোগিণীর অবস্থা জানিবার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছেন। অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকেই যাইতেছে।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রি যখন গভীর হইয়াছে তখন সাধকজী অবসন্ন-দেহে শক্তিরাণীর কাছে বসিয়া থাকা কালীন এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, যেন সন্ন্যাসীমহারাজ, জমীদারমহাশয়, তিনি ও সাবিত্রীদেবী এই চারিজনে মিলিয়া কোন্ এক অদৃশ্য পথে যাত্রা করিয়া আকাশের মধ্যে দিয়া উড়িয়া চলিতেছেন। ক্রমে ক্রমে সাধক দেখিলেন যে, তিনি ও সাবিত্রীদেবী ব্যতিরেকে অন্য দুইজন নীচে নামিয়া পড়িলেন। তাঁহারা দুই জনে তখন ভাসিতে ভাসিতে একস্থানে গিয়া দেখিলেন পরমশোভাময় সুবর্ণ

রত্নাদি খচিত এক বিরাট মন্দিরের দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সেইখানে উপস্থিত হইবামাত্র অতি পরিচিত কণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দ্বাররক্ষীকে অনুনয় সহকারে বলিলেন মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবার জন্য এবং সত্যই কে গাহিতেছেন তাহা দেখিবারই বিশেষ করিয়া তাঁহাদের মন আকুল হইয়াছে। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া দ্বাররক্ষী উত্তরে জানাইল, মন্দির মধ্যে তাঁহাদের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই ; এ বৈকুণ্ঠপুরী। এই কথার পরই সাধকের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের সেই কণ্ঠস্বর এখন তাঁহার কাছে শক্তিরাণীর বলিয়া নিশ্চিত মনে হইল, এবং এই জন্য ভয়ে ও ভাবনায় তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শক্তিরাণীর চেতনাহীন ডান হাতটি মুঠার মধ্যে ধরিয়া ফেলিলেন যেন না পলাইয়া যায়, এই রকম মনের অবস্থা লইয়া। সাধকজী এতকাল শক্তিরাণীর মস্তক ভিন্ন হস্তাদি স্পর্শ করেন নাই। আজ তাঁহার যেন সংযমের কোন শক্তিই রহিল না। শক্তিরাণীর অচেতন দেহাভ্যন্তর হইতে অবচেতন মন সেই স্পর্শ পাইয়া সমস্ত শরীরকে থর্ থর্ করিয়া কাঁপাইয়া দিল। সাধকজী ভয়ে তৎক্ষণাৎ হাত ছাড়িয়া দিলেন। কম্পন বন্ধ হইয়া গেল।

সাবিত্রীদেবী, লক্ষ্মীদেবী ও সাধকজী, ইঁহারা অসুখের প্রথম দিন হইতেই এক রকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এই তিন দিন ধরিয়া সর্ব্বক্ষণ শক্তিরাণীর মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছেন। সাবিত্রীদেবী যেন পাষাণ মূর্ত্তির মত সেই থেকে এক ভাবেই আছেন। আশ্রমবাসী সকলের অবস্থাও প্রায় একইরূপ। গুরুদেব যেন কি রকম এক হইয়া গিয়াছেন। এক একবার কাছে আসিয়া তাঁহার প্রাণপুত্তলীকে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আপাদ মস্তক ছল ছল নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই তাহার যন্ত্রণা দেখা সহ্য করিতে না পারিয়া এখানে

সেখানে চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু বেশীক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিয়া অর্দ্ধোন্মাদের মত আবার আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। তাঁহার এই রকম আসা যাওয়া ও বেদনাকুল দৃশ্য দেখিয়া সকলের বুকে আরও বেশী করিয়া আঘাত দিতে লাগিল।

তৃতীয় দিনের সন্ধ্যার পর যখন আর একবার শক্তিরাণীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন তিনি চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া সাবিত্রীদেবীর গলা এক হাতে জড়াইয়া অন্য হাতে লক্ষ্মীদেবীর হাত ধরিলেন এবং সাধকজীর দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। তখন সকলের যে কি অবস্থা হইল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

শক্তিরাণী একটু পরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন,—গুরুদেবকে বলুন, সেই ইমন-কল্যাণ রাগের চৌতালের "তুঁহি ভজ ভজরে মন বাসুদেব নারায়ণ" গানটি গাইতে।

গুরুদেব বলিলেন,—মাগো! এই কি গান শোনাবার সময়! বুক যে ফেটে যাচ্ছে মা! তুই ভাল হয়ে উঠে আমাদের সকলকে বাঁচা, তার-পর তোকে আমি সর্ব্বদা গান শোনাব। তোর কাছে গান করবার সময় আমার যে মনে হত আমি যেন ৺মহামায়ার কাছে গান শোনাচ্ছি। তাই ত বলি এ পোড়া কপালে কি এত সুখ সয়!

শক্তিরাণী আস্তে আস্তে মিনতিভরাকণ্ঠে বলিলেন,—বাবা! আমি যে চলে যাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি যেন বহুদূর হতে একজন সাধুপুরুষের মত কে আমায় নিতে আসছেন। আপনি এখন না শোনালে ত আপনার ধ্রুপদের পরমভাববস্তু আমার শেষ সম্বল হয়ে থাকবে না বাবা!

গুরুদেব বুঝিলেন, মা আমার মুক্তিধামে চলিতেছে, তখন তিনি একটি কাম্যতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বহু কষ্টে নিজকে সাম্‌লাইয়া ঐ

গানটি গাহিলেন। শক্তিরাণী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিতে শুনিতে আবার অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

সেই দিনের সমস্ত রাত্রি সকলের ভীষণ অবস্থার মধ্য দিয়া কাটিল। সন্ধ্যার পর হইতে মঠের সমস্ত ব্যক্তি এবং শক্তিরাণীর ক্ষুদ্র পল্লীর প্রত্যেকটি মানুষ শুষ্ক মুখে হৃদয়ে ভীষণ কাতরতা লইয়া শক্তিরাণীর নিকটবর্ত্তি ইতস্ততঃ স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ভোরবেলায় শক্তিরাণীর আবার জ্ঞান ফিরি ' ল। তখন তিনি সাধকজীকে সজলনেত্রে বলিলেন,—প্রভুজি! আমার শেষ মনবাসনা পূর্ণ করুন!

সাধকজী অতিকষ্টে দন্তের দ্বারা ওষ্ঠকে চাপিয়া ক্রন্দনকে রুদ্ধ করিয়া তাহার পর সামলাইয়া বাণবিদ্ধপক্ষীর মত যন্ত্রণা লইয়া বলিলেন,—আমার সাধনার শক্তিরাণী কোথায় যাচ্ছ আমার প্রাণের তার ছিন্ন করে দিয়ে! বল-বল দেবী তোমার কি বাসনা?

শক্তিরাণী সাধকজীর পায়ে একটি হাত রাখিয়া বলিলেন,—আমার হয়ে আপনি বিশ্বকবির যোগীয়ারাগের "পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই সবারে আমি প্রণাম করে যাই···" ওই গানটি একবার শোনান প্রভূজী!

সাধকজী বুকফাটাকান্না রোধ করিয়া এমনভাবে ওই গানটি গাহিলেন যেন বিশ্বের সমস্ত প্রাণবস্তু উলটু পালটু হইয়া গেল। গানটি শেষ হইতেই লক্ষ্মীদেবীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া শক্তিরাণী বলিলেন,—দিদি ভাই! আপনি সেই "শ্যাম দরশনে মথুরা গমনে" গানটি একবার শোনান না! তখন লক্ষ্মীদেবীর গণ্ড বহিয়া অজস্র ধারায় অশ্রু প্লাবিত হইতে হইতে ঐ গানটি চলিতে লাগিল। সেই সময় সন্ন্যাসীমহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গুরুদেব তখন—ভগবান একি করলে! মা জগদম্বা একি করলে!! বলিতে বলিতে পাগলের মত ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন।

গুরুমায়েরও তখন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি শক্তিরাণীর বুকের উপর মুখ রাখিয়া বলিলেন,—মা তুই এখানে আমাদের আশার সব সার্থকতা নষ্ট করে দিলি ! মেয়ে যে কি দুর্লভ বস্তু তা জানতাম না, কত ভাগ্যে তোকে এই বয়েসে পেয়ে তার তৃপ্তির আস্বাদ উপভোগ কচ্ছিলাম। হা ভগবান ! এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। ও দিকে তখন বাউলঠাকুর স্বল্প দূরে গাছ তলায় বসিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে করুণ বিলাপযুক্ত বাউল সুরে গাইতেছেন,—

কে যেন কে টানে আমায় কে যেন কে টানেরে
আমার কোলে আয়রে চলে বলছে কাণে কাণেরে
বলছে কাণে কাণে।

বহুদূরের সুরের রেষ ভিতরে আজ করছে প্রবেশ
আমার আমি হারিয়ে গিয়ে মিশ্‌ল সে কোন্ প্রাণেরে
মিশ্‌ল সে কোন্ প্রাণে।

আজ চোখে দেখি সবই আলো, লাগছে আমার কতই ভাল
ও কে ! রিক্ত গৃহে ভরা ডালি আমার তরে আনে রে
পূর্ণ করে আনে।

দিলেন বুঝি এতদিনে কৃপা তাঁহার এ অধীনে
ডাক পড়েছে চলছি ও তাঁর চরণ রেখে ধ্যানে রে
চরণ রেখে ধ্যানে।

দুঃখ কেবল রইল পড়ে একতারাটি একধারে
ও যে, চিরসঙ্গী ছিল আমার সাধন ভজন গানে রে
তাঁহার ভজন গানে॥

কীর্ত্তনের পর ঐ গানটি কাণে পৌঁছাইতেই শক্তিরাণী যেন কোথায় কোন্ দূর হইতে মোহনবাঁশীর আহ্বান সুর শুনিতে পাইলেন। তিনি

বুঝিলেন আর তাঁহার সময় নাই, তখন তিনি জমীদারমহাশয়ের প্রতি মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বহু কষ্টে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, —দিদিরাণী যেদিন এখানে প্রথম আসেন সেই দিনই আমি আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির বোধশক্তিতে বুঝে নিতে পেরেছিলাম যে, তিনি প্রভুজীকে দর্শন করে মন প্রাণ সমস্তই উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এত বড় জিনিষটার প্রতি আপনার লক্ষ্য পড়েছে কি না তা জানবার ও জানাবার আমার সুযোগ হয় নাই। আপনাকে যেরূপভাবে বুঝেচি, তাতে আমার মনে হয় এঁদের শুভ মিলন সঙ্ঘটিত হলে আপনিও সত্যই সুখী হবেন। গুরুদেব ও গুরুমায়ের অন্তরেও যে ঐরূপ বাসনা আছে তাও আমি অনুভব করেছি। প্রভুজীর সম্বন্ধে বলতে পারি, তিনি আগেকার মুনি ঋষিদের নিয়মে গার্হস্থ ধর্ম্মের মধ্যে দিয়েই সাধন ভজন করে যাওয়ার পক্ষপাতি। এ অভিপ্রায় তিনি একদিন গুরুমা'র কাছে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন নিজে সংসারী না হলে সংসারে বড়বস্তুর প্রচার স্থায়িত্ব লাভ করেনা। তাই আমার মনে হয় তাঁর সহধর্ম্মিণী রূপে জীবনে প্রকৃত সুখ শান্তি আনয়ন কল্পে দিদিরাণী সর্ব্ব বিষয়ে যোগ্যা। আপনি পিতা, আপনার মুখ থেকে যদি জেনে যেতে পারতাম যে, এই শুভমিলন আপনার অনভিপ্রেত নয়, তাহলে প্রভুজী ও দিদিরাণীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে পরম তৃপ্তি ও শান্তি নিয়ে যেতাম।

জমীদারমহাশয় অশ্রুসিক্ত নয়নে ও গভীরভাবে বেদনাহত হইয়া শক্তিরাণীর মস্তকে কম্পিত হস্ত বুলাইতে বুলাইতে ক্রন্দন যুক্ত স্বরে বলিলেন,—মাগো, কল্যাণী আমার! এত বড় কল্পনা আমি ত মা কোন দিন করিনি, এবং তা ভাবতেও পারিনি। তুই যে সকলের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ করে রেখে ছিলি মা, সেখানে কি কোনরূপ স্বার্থ চিন্তার স্থান ছিল! তোর মত দেবীর ও আপন জনের কল্যাণকর কামনা ত কারোরই

অনভিপ্রেত হতে পারে না মা! কিন্তু সেই শুভ শঙ্খের ধ্বনিকে একেবারে বেসুরো করে কেন তুই দিয়ে যাচ্ছিস? তুই ফিরে আয়, ভগবান তোকে ফিরিয়ে দিন, এর বড় আর আমাদের কোন কামনা নাই। তোকে হারিয়ে আমরা কি করে থাকব বলতে পারিস! এ যে ভীষণ হরষে-বিষাদ হল!!

বাসনা সিদ্ধ হইবে বুঝিতে পারায় এই কয় দিনের পর শক্তিরাণীর চিরানন্দ মুখখানি শেষবারের মত আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। তিনি অতি কষ্টে নিঃশ্বাস টানিতে টানিতে বলিলেন,—পিতা! আমার জন্য আপনারা বেশী দুঃখ করবেন না। এ যে মঙ্গলময়েরই বিধান ও এইরূপই ছিল বিধিলিপি। নীচ জাতি বলে পরিচিত অতি সামান্য বংশে জন্মে প্রভুজীর কৃপায় ও চেষ্টায় এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমি কিই না পেয়েছি। যিনি ইচ্ছা নিয়ে এত দূরের স্থানে তুলে ছিলেন তিনিই প্রয়োজন বোধে আমাকে অন্যত্রে সরিয়ে দিচ্ছেন। এতে ত কারো হাত নাই পিতা! সাময়িক দুঃখ আপনারা পাবেন কিন্তু তাঁরই কৃপায় আবার সব শান্ত হয়ে আসবে। তবে আমার আত্মা যেন ঐ শুভমিলন শীঘ্র দেখতে পায় এই প্রার্থনা রইল।

তাহার পর শক্তিরাণী সাবিত্রীদেবীর মুখে ডান হাতটি রাখিয়া সাধকজীর মুখের দিকে তাকাইয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন,—আমি যে প্রার্থনা জানালাম তা পূর্ণ করতে দেরি করবেন না প্রভুজী! আর মিনতি রইল, আপনারা আমার জন্য দুঃখ পেয়ে কষ্টকে ডেকে এনে আমার আত্মাকে কাঁদাবেন না।

এই কথাগুলি শেষ শক্তি দিয়া বলিয়া ফেলিয়াই শক্তিরাণীর হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সকলের দিকে একবার তাকাইয়া হাত তুলিয়া বিদায় প্রণাম করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু

পারিলেন না। সেই সময় সকলের অবস্থা তখন নিশ্চল, নির্ব্বাক ও শ্বাসরুদ্ধ জড়মূর্ত্তির মত হইয়া গিয়াছে। সাধকজী এতক্ষণ নিজের সমস্ত সত্তাকে যেন হারাইয়া শক্তিরাণীর মুখের দিকে অপলক নয়নে তাকাইয়া প্রলয়-পূর্ব্ব পৃথিবীর অবস্থার মত দেহে বসিয়াছিলেন। যাই বুঝিলেন শক্তিরাণী চলিয়া যাইতেছেন তখন তাঁহার শরীর ভুকম্পনের ন্যায় আলোড়িত হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ সক্রন্দন চীৎকারে বলিয়া উঠিলেন— নিয়তি রাক্ষসী! তুই আমার সমস্ত শক্তি হরণ ক'রে এ কি সর্ব্বনাশ করলি!! আমার সাধনার অমূল্য বস্তুকে কেড়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিলি!!! এই বলিয়া শক্তিরাণীর দেহের উপর জ্ঞান হারা হইয়া ঝাপাইয়া পড়িবামাত্র শক্তিরাণীর মস্তক সাধকজীর চরণ তলে লুটাইয়া পড়িল। সজ্ঞানে মৃত্যুর সময় দেবীশক্তিরাণী তাঁহার প্রভুজীর দেহের নিবিড় স্নেহের স্পর্শসুখানুভবকে মহাসম্বল করিয়া সাধকজীর আদরিণী পরম স্থানে চলিয়া গেলেন।

ওদিকে সেই সময় তখন শরতের পূর্ণশশী এই দৃশ্য দেখিয়া যেন গভীর দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া পশ্চিমাকাশের তলদেশে মুখ লুক্কায়িত করিলেন। শক্তিরাণীর সেই অতিপ্রিয় কুকুরটি অসুখের দিন হইতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সদা সর্ব্বদা স্বল্প দূরে তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল, এখন সেও সকলের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

তাহার পর সাধকজীর পূর্ব্বের সেই কুটিরঅঙ্গনে শক্তিরাণীর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য যখন যাত্রারম্ভ হইল তখন সেই সারমেয়টি সকলের পশ্চাতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে বসিয়া চোখের জল ফেলিল। সেইখানে শেষ কৃত্য সমাধার পর সে যে কোথায় চলিয়া গেল সেই দিন হইতে তাহাকে আর আশ্রমে কেহই দেখিতে পাইল না। এক

এক দিন গভীর রাত্রে আশ্রমবাসীরা শুনিতে পাইতেন তাহার করুণ ক্রন্দণ রব যেন সেই কুটিরাভ্যন্তরের ভস্মস্থলের নিকট হইতে।

কয়েক দিন পরে প্রত্যহের মত একদিন প্রাতঃকালে সাধকজী ও সাবিত্রীদেবী শক্তিরাণীর অন্তিম শয্যার স্থলে পুষ্প প্রদান করিতে যাইয়া সন্নিকট হইতে দেখিতে পাইলেন চিতা ভস্মের পার্শ্বে সেই প্রিয় কুকুরটি অস্থি চর্ম্মসার দেহে শায়িত রহিয়াছে। তাহার নিকটে যাওয়া মাত্র বুঝিলেন, মানুষ সব সহ্য করিতে পারে কিন্তু এদের মত ভক্ত পশুরা প্রিয় জনের অভাব সহ্য করিতে পারে না, তাই তাহার প্রাণ সেখানে যাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই চিন্তার পরই তাঁহাদের চক্ষু হইতে আদরিণীর আদরের বস্তুটির উপর অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। এবং তাঁহাদের হস্তস্থিত পুষ্পাধার হইতে অশ্রুসিক্ত কতকগুলি পুষ্প তাহার গাত্রের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল॥

সমাপ্ত